শাংগ্রিলার খোঁজে

হিমালয়ে গুপ্তচারণার তিনশতক

পরিমল ভট্টাচার্য

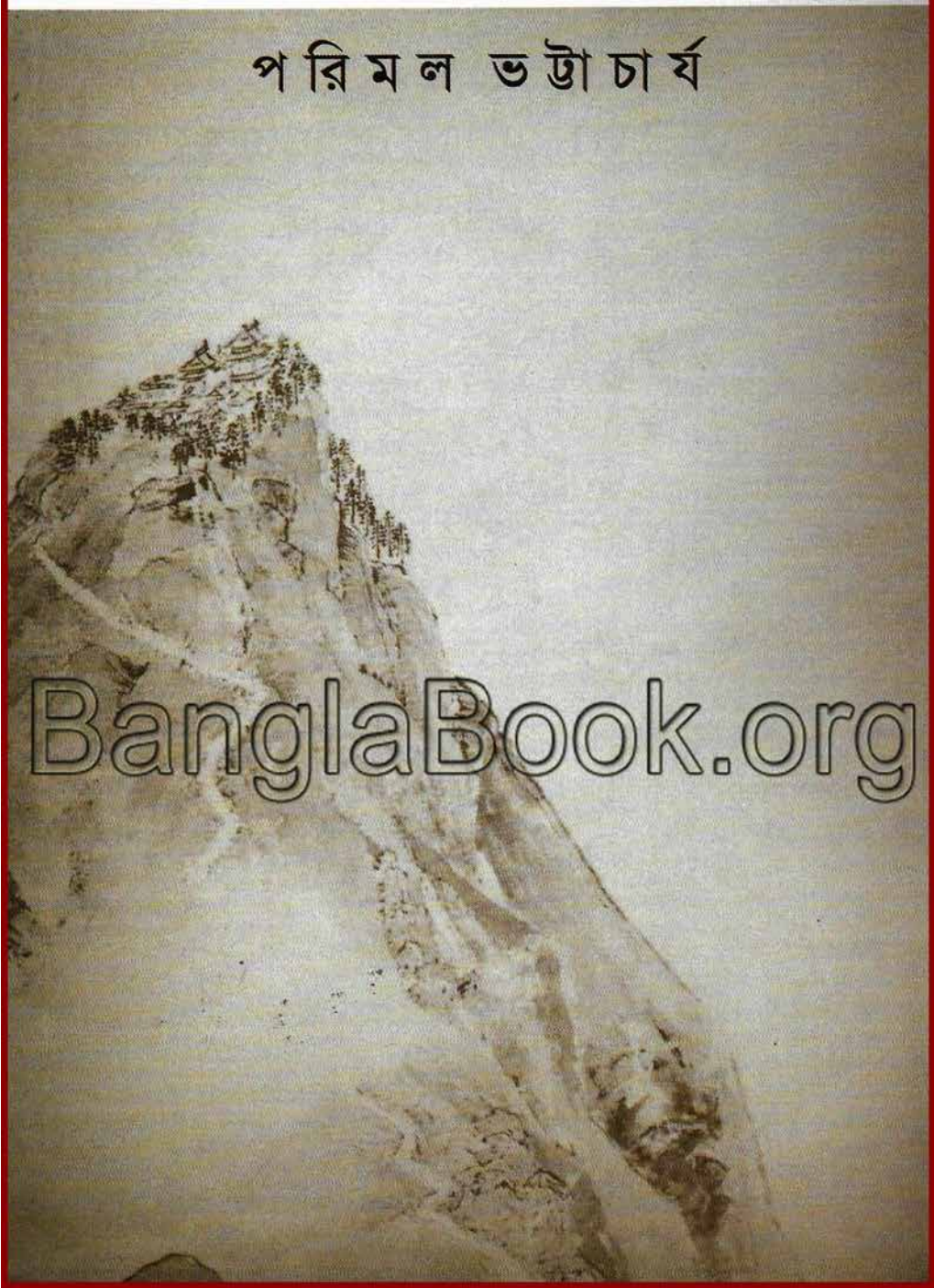

BanglaBook.org

গহীন হিমালয়ের মাঝে এক যে ছিল দেশ—নিষিদ্ধ, রহস্যে ঘেরা। কলকাতার এক বাঙালি যুবককে বৌদ্ধ পণ্ডিত সাজিয়ে পাঠাল ব্রিটিশ সরকার। সন ১৮৭৯। ঠিক সেইসময় দার্জিলিঙের এক নিরক্ষর দর্জি চলেছে সেখানে—বিশ্বের দুর্গমতম গিরিখাতের ভেতর বয়ে চলেছে যে নদী, তার অজানা পথের সন্ধানে। ইতিহাস এঁদের মনে রাখেনি। এক অবিশ্বাস্য যাত্রার কাহিনি চাপা পড়েছে সরকারি মহাফেজখানার ধুলোয়। যদিও সেই যাত্রাপথের রেখা ধরে গুপ্তচর, সেনানায়ক, প্রেমিক ও প্রকৃতিবিদেরা গিয়েছে তারপরে।

তার আগেও। রহস্যনদীর পথ, লুকোনো উপত্যকা থেকে শুরু করে স্বজাতির উৎস সন্ধানে বেরিয়ে তারা কখনও কিছুই পায়নি, মারা পড়েছে বেঘোরে, কিংবা খুঁজে পেয়েছে এক নতুন প্রজাতির নীল পপি, ঝর্ণার গায়ে একটি নিটোল রামধনু, অনির্বাণ প্রেম। পাহাড়ি পথের মতো, নদীর মতো বহুধা আখ্যানের জাল ছেয়ে এসেছে উত্তরপূর্ব হিমালয়ে।

সেই জালে আটকে পড়েছেন লেখক। সিমলায় পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে শিংলিলার জঙ্গল, পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থান থেকে অরুণাচলের প্রত্যন্ত জনপদে হাতড়ে বেড়িয়েছেন সেই জালের গিঁট, যা খুলতে পারলে মিলে যেতেও পারে শাংগ্রিলার ঠিকানা।

অ ব ভা স

Buy Online : www.ababhashbooks.com

www.BanglaBook.org

শাংগ্রিলার খোঁজে

হিমালয়ে গুপ্তচারণার তিনশতক

অবভাস প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অপুর দেশ
একটি আত্মকাহিনি

ডাঞ্চিনামা
একটি স্মৃতির প্রত্নসন্ধান

সত্যি রূপকথা
সভ্যতা, উন্নয়ন ও ওড়িশার এক উপজাতির জীবনসংগ্রাম

দার্জিলিং
স্মৃতি সমাজ ইতিহাস

A Face of Bengal
Looking through the Prism of Basic Education

অনুষঙ্গ/অনুবাদ

যন্ত্রণার উত্তরাধিকার

এসো পাশে দাঁড়াও
দান্তেওয়াড়ার এক গান্ধিবাদী সমাজকর্মীর আবেদন

তারকোভস্কির ঘরবাড়ি

বার্গম্যান, আপনি

শাংগ্রিলার খোঁজে

হিমালয়ে গুপ্তচারণার তিনশতক

পরিমল ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অবভাস

Shangri-Lar Khnojay: Himalaye Guptachaaranar Tinshatak
by Parimal Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০১৬
তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৮
© লেখক
প্রচ্ছদ হোয়াইট পেপার
ISBN 978-93-80732-32-9

মূল্য ২৪০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক পার্থ চক্রবর্তী, অবভাস, কে বি রায় গার্ডেন, গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা-৮৪, ফোন ৯৪৩৩২৩৪৩৪৬ ই-মেল ababhash@gmail.com
ওয়েব সাইট www.ababhashbooks.com
বর্ণস্থাপক সুদীপ দাস বরাহনগর, কলকাতা-৩৬
মুদ্রক ডি. অ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি. গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-১৩২

I'm looking for the face I had
Before the world was made.
W B Yeats, 'The Winding Stair'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সময়রেখা

১৭৭৪	—	তিব্বত যাত্রা করলেন জর্জ বোগ্‌ল।
১৭৯২	—	তিব্বতে গোর্খা আগ্রাসন, সীমান্তদ্বার রুদ্ধ।
১৮২২	—	কোরোশি চোমার ভারতে আগমন।
১৮৪৭-৫১	—	জোসেফ ডাল্টন হুকারের হিমালয় ভ্রমণ।
১৮৭৯	—	শরৎচন্দ্র দাস ও কিন্টুপের ভিন্ন পথে তিব্বতযাত্রা।
১৮৮১	—	দ্বিতীয়বার তিব্বতে গেলেন শরৎচন্দ্র।
১৮৮২	—	কিন্টুপের প্রত্যাবর্তন।
১৯০৩	—	ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের নেতৃত্বে সেনাঅভিযান।
১৯১১	—	সাংপো নদের রহস্য সন্ধানে ক্যাপ্টেন এরিক বেইলি।
১৯১১-১৬	—	আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীলের সিকিম আগমন ও তিব্বতযাত্রা।
১৯১৩—১৪	—	সিমলা বৈঠক ও ম্যাকমাহন লাইন।
১৯১৪-১৮	—	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
১৯২৪	—	জর্জ ম্যালরির মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান।
১৯২৪-২৫	—	ফ্র্যাঙ্ক কিংডন ওয়ার্ডের সাংপো গিরিখাত যাত্রা।
১৯৩৩	—	জেমস হিল্টনের উপন্যাস *দ্য লস্ট হরাইজন* প্রকাশিত।
১৯৫৯	—	তিব্বতে বিদ্রোহ, দলাই লামার ভারতে পলায়ন।
১৯৬২	—	চিন-ভারত যুদ্ধ।
১৯৯৯	—	জর্জ ম্যালরির মৃতদেহ উদ্ধার।
২০০২	—	সাংপো গিরিখাতে একদল ইউরোপীয় অভিযাত্রীর প্রথম সফল কায়াক অভিযান।

সূচি

এক	মারিয়া ব্রাদার্স	৯
দুই	এক যে ছিল নদী	১৭
তিন	শাংগ্রিলা বার	২৬
চার	লাসা ভিলা	৩৫
পাঁচ	ছোট্ট সবুজ কচি একটা মেয়ে	৪৩
ছয়	রিঞ্চেন তেনোয়া	৫২
সাত	তাশিলুম্ফো	৬০
আট	কেসাং লেপচার বাঁশি	৭৮
নয়	বিস্মৃতির শহরে	৮৮
দশ	হীরক শুকরী	৯৬
এগারো	ভাঙা নৌকোর যাত্রী	১১৬
বারো	শিকড়ের খোঁজে	১২৩
তেরো	স্মৃতির রাজপুত্র	১৩২
চোদ্দ	আরশিনগরের পানশালা	১৩৮
পনেরো	গিম্‌মি দ্য ওয়াটারফল!	১৪২
ষোলো	কিন্টুপের পথ	১৪৬
সতেরো	গুপ্তভূমির দরজা	১৫২
আঠেরো	বেইলি ট্রেল	১৬০
উনিশ	পৃথিবীর শেষ দশ মাইল	১৭২
কুড়ি	চমরিঘণ্টার ধ্বনি	১৮২
সূত্রনির্দেশ		১৯২

চিত্রসূচি

১. শরৎচন্দ্র দাস
২. কিন্টুপ
৩. জনৈকা লাচাম
৪. জোসেফ ডাল্টন হুকার
৫. কর্নেল এরিক বেইলি
৬. স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড
৭. আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীল
৮. তিব্বতের পথে শরৎচন্দ্র
৯. পাঞ্চেন লামার সকাশে জর্জ বোগল
১০. অতিবুদ্ধ- প্রজ্ঞা জড়িয়ে ধরেছে করুণাকে...
১১. কোরোসি চোমা
১২. চোমার কবরের সৌধ— 'অতীতের ডাকবাক্স...'
১৩. সেনা অভিযান ১৯০৩— 'তিব্বত খুলে ফেলা হল ঝিনুকের মতো...'
১৪. হিমজমাট ঝর্ণা, সামনে দাঁড়িয়ে সেনা জওয়ান
১৫. রাজা সিদকিয়ং টুলকু
১৬. ফ্র্যাঙ্ক কিংডন ওয়ার্ড
১৭. পেমাকোচুং থেকে সাংপোর পথ
১৮. থেমবাঙের পোড়ো দুর্গের ফটক

এক

মারিয়া ব্রাদার্স

স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট থেকে— সেই যেখানে নাকি পাতিয়ালার মহারাজা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কোন্ ভাইসরয়ের কন্যার সঙ্গে ইলোপ করেছিলেন*— রিজের রাস্তা ধরে ক্রাইস্ট চার্চের দিকে না উঠে ম্যল রোড বরাবর হেঁটে গেলে ডানদিকে পর পর টুং অ্যান্ড কোম্পানি, কুমার, রামা অ্যান্ড কোম্পানি, রামচাঁদ বিশানদাস, শ্যামলাল অ্যান্ড সন্স, গেইন্ডামল হেমরাজ... সেকালের বিখ্যাত দোকানগুলো হারানো সময় বুকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে আজও। ১৮৬৪ সাল থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বছরে ছ-মাস এই শহর হয়ে উঠত ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। স্বাভাবিকভাবেই এই রাস্তা ছিল উচ্চ কোটির রাজপুরুষ ও নারীদের বিচরণভূমি ; দোকানগুলোও সেজে উঠত তাদের বিলাসব্যসনের সম্ভারে। বিশ্বের সর্বোত্তম পোশাক থেকে মদিরা, সুগন্ধী থেকে বাদ্যযন্ত্র, কী না পাওয়া যেত এখানে। ছিল ঘড়ি ও বন্দুকের দোকান, ফোটোগ্রাফির স্টুডিয়ো, সেলুন, দন্ত্যচিকিৎসা, পিয়ানোর টিউনার, ঘোড়ার জিন নির্মাতা— বেশিরভাগই ইউরোপীয়দের। এছাড়া ছিল কয়েকটি স্থায়ী ছাউনি, যেখানে ফিবছর গ্রীষ্মের শুরুতে লাহোর থেকে কার্পেটের ব্যাপারীরা এসে পসরা সাজাতো। কাংড়া উপত্যকা থেকে রেশমনির্মাতারা খচ্চরের ক্যারাভান নিয়ে আসত হোলির পর, থাকত সেই দীপাবলির আগে পর্যন্ত, যতদিন না সাহেব-মেম বোঝাই শেষ টয়ট্রেন নেমে যায় সমতলে।

সেসবই হারিয়ে গিয়েছে। দেশভাগের পর লাহোরীদের আসা বন্ধ হয়েছে, উঠে

---

* ভিন্ন মতে, ভাইসরয়ের স্ত্রী। কোনো তথ্যপ্রমাণ কেউ খুঁজে পায়নি, অথচ সিমলায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুখফেরতা হয়ে চলে এই কেচ্ছা। জায়গাটির নামও সরকারিভাবেই স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট। কথিত যা, ১৮৯২ সালে এক বসন্তের প্রকাশ্য দিবালোকে পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিংহ ম্যল ও রিজের সংযোগস্থল থেকে তদানীন্তন ভাইসরয়ের কন্যাকে (অথবা স্ত্রীকে) তাঁর সম্মতিক্রমে অপহরণ করেন। এজন্য ব্রিটিশ সরকার সিমলায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এবং মহারাজ অল্প দূরে চেইলে একটি শৈলশহর গড়েন। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, ১৮৯২ সালে ভূপিন্দর সিংহের বয়স এক বছর মাত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি পরনারীতে আসক্তির জন্য কুখ্যাত হন। সেই কারণেই কি তাঁর নাম জড়িয়ে এই কাহিনি ? কারণ যাই হোক, ইতিহাস হোক অথবা কিংবদন্তী, এই কেচ্ছায় কান পাতলে হয়তো শোনা যাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুরণন, যার তার বাঁধা হচ্ছিল সেই সময় ; কিংবা তার পরে, ভারতের শেষ ভাইসরাইনের সঙ্গে ভাবী প্রধানমন্ত্রীর গোপন অন্তরঙ্গতা, যা প্রস্ফুটিত হয়েছিল এই সিমলাতেই, ভাইসরিগ্যাল লজের ছায়াচ্ছন্ন করিডোরে, বাগিচায়।

BanglaBook.org

গিয়েছে সুগন্ধী ও বন্দুকের দোকান, পিয়ানোর তারবাঁধা কিংবা ঘোড়ায় জিন পরাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চিনেদের জুতোর দোকানগুলো রয়ে গিয়েছে আজও, তবে একাধিক মুসলমানের দোকান হাতবদল হয়েছে সাতচল্লিশের পর। কয়েকটির চেহারা-চরিত্র বদলেছে: সাইনবোর্ড একই আছে কিন্তু বদলে গিয়েছে পণ্যসামগ্রী। কেউ কেউ বদলায়নি একটুও, চলতি হাওয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে টিঁকে রয়েছে কোনোমতে— রিজের বেঞ্চিতে বসা স্থানীয় বৃদ্ধদের মতো: দুই হাঁটুর ফাঁকে লাঠি, চোখে কুয়াশা, চারপাশে রঙিন কোলাহলমুখর শিশু আর যুবকযুবতীরা। বিগত দু-দশকে এই ধূসর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ওপর পড়েছে বাজার অর্থনীতির গিল্টি; বরিস্তা অ্যাডিডাস বেনেটন ডমিনোজ়রা আলোকোজ্জ্বল সাইনবোর্ড আর সুবেশ সুঠাম ম্যানিকুইনের ফাঁদ পেতেছে পর্যটনের স্রোতে। বছরভর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকেরা আসে। এই ম্যাল রোডে এসে দোকানের সরণি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদের পায়ের ছন্দে ফোটে এক বিচিত্র স্ফূর্তি।

নীচের গাড়ির স্ট্যান্ড থেকে বেশ খানিকটা চড়াই পথে উঠে সহসা পায়ের তলায় সমতল পাবার জন্যই কি? নাকি অবচেতনে কোথাও আজও ঝাপটা দিয়ে ওঠে পরাধীনতার থেকে মুক্তির উল্লাস? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রিজ থেকে ম্যাল রোড পর্যন্ত এলাকাটি ছিল নেটিভদের জন্য নিষিদ্ধ। স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে শ্বেতপাথরের ছাতার নীচে লাল চুড়ো টুপি আর খাকি উর্দিধারী ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে সেই ইতিহাসের প্রেতের মতো।

আর এইসব মনোহারী জানলা শোকেস, বহুজাতিক ব্র্যান্ডের পরিচিত প্রতীক, পিৎজা-বার্গারের আলোকোজ্জ্বল ছবি, নয়নলোভন প্লাস্টিকমূর্তির অরণ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সহজেই চোখ পিছলে যেতে পারে একটি ম্যাড়মেড়ে সাবেকি সাইনবোর্ড থেকে—

MARIA BROTHERS
Antique Book Sellers
78A, The Mall
Shimla

ধোঁয়ানীল কাঠের দরজা, কাচের ওধারে সাজানো তন্ত্র আর ভারততত্ত্বের পুরোনো বই; হঠাৎ দেখলে মনে হবে জলরঙে আঁকা ছবি, ফিকে মলিন হয়ে এসেছে। বন্ধ দরজায় ছালচামড়া উঠে গিয়ে পুরোনো রঙের পরত উঁকি দিচ্ছে। সেটি ঠেলে ঢুকলে একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে টুং করে। ভেতরে উষ্ণ আবহাওয়ায় চোখ সয়ে এলে দেখা যায় লম্বাটে ঘরে দেয়ালজোড়া তাকে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত ঠাসা বই, চারপাশে টেবিলে মেঝেয় প্রতি ইঞ্চি জমিতে স্তূপীকৃত নানা আকারের বইপত্র। ঘরের ভেতরদিকে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট এক সুদর্শন প্রৌঢ়; তাঁর মুখে পরিপাটি সাদা দাড়ি, চোখে রুপোলি চশমা, আতসকাচের ভেতর দিয়ে অপলক চেয়ে আছেন একটি সুপ্রাচীন

BanglaBook.org

মানচিত্রে। কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। পাশেই একটি মোটাসোটা ছাইরঙা বেড়াল ল্যাম্পের আলোয় পিঠ পেতে ওম নিচ্ছে চোখ বুঁজে। ঘন্টার শব্দে একটি চোখ খুলে আগন্তুককে দেখে নেয় একবার, পরক্ষণেই মশগুল হয়ে পড়ে আলোর বৃত্তে উড়ন্ত একটি হলুদ মথে। দোকানি একটিবারের জন্যেও দৃষ্টিপাত করেন না। ম্যালের ওপর দোকান, সারাদিন যত মানুষ দরজা ঠেলে ঢোকে তাদের প্রায় কেউই প্রকৃত ক্রেতা নয়। অনেকে ধূসর বইয়ের স্তূপে একবার চোখ বুলিয়ে বেরিয়ে যায়, কেউ হয়তো হাতে তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে, আবার কেউ, গাইডবুকে এই দোকানের মাহাত্ম্য জেনে যারা আসে, কৌতূহলবশে কোনো সুপ্রাচীন প্রথম সংস্করণের দাম জানতে চায়।

মারিয়া ব্রাদার্সের খ্যাতি ঠিক কতটা তার দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের জন্য আর কতটাই বা তাদের দামের জন্য সেটা বলা কঠিন, তবে প্রকৃত ক্রেতাদের চোদ্দ আনাই বিদেশি। তাকের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি ফেরালে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়: তন্ত্র আর ভারততত্ত্ব ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম, ধ্রুপদ সঙ্গীত, কামসূত্র, নেটিভ স্টেটের রাজাদের প্রাসাদ ও মৃগয়ার কফিটেবিল বই, মিনিয়েচার ও বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ব, ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের স্মৃতিকথা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্লাসিক্স...

বেশিরভাগ সিমলার কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহ কিংবা গ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার হয়েছে। দু-দুটো শতক ধরে এই বিশাল উপমহাদেশের বর্ণময় ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে এই শহর, অসংখ্য শিক্ষিত মেধাজীবী মানুষ এখানে এসেছে, দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়েছে। সেইসঙ্গে এসেছে রাশি রাশি বই, পত্রপত্রিকা আর নথি। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে মারিয়া ব্রাদার্সের সন্ধানী জাল।

মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বইপত্রের ধূসর গন্ধে ভারি হয়ে থাকে ঘরের বাতাস। সেই বাতাস কেটে ফরফর ফরফর শব্দে ওড়ে হলুদ মথ, টেবিলে বেড়ালটি চোখ বুঁজে ফেলে আবার, কেবল শেল্‌ফের কোনে টুলের ওপর একটি তিব্বতি মুখোশ বিকট মুখব্যাদান করে চেয়ে থাকে। রাশি রাশি বইয়ের মেরুদণ্ডে সোনার জলে ফিকে-হয়ে-আসা নামগুলো পড়তে পড়তে ক্রমশ ঢুকে পড়তে হয় ঘরের অভ্যন্তরে, এক অদ্ভুত পলকা অথচ সুস্থির সময়ের পেটের ভেতর। ১৮৮২-৯২ সালের বাঁধানো Spectator, The Bible, Collected Poems of Oliver Goldsmith, Bengal— Past & Present... বিবিধ বিচিত্র বিষয়বস্তুকে এক সারিতে ধরে রেখেছে হারিয়ে যাওয়া সময়কাল ; অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট বছরের কম পুরোনো নয় এই দোকানের বই আসবাব দোকানি, এমনকি হয়তো বেড়ালটিও... The Indian Police... Journal... Magic and Mystery in Tibet... The Nabobs... Records... Curry & Rice... Vignettes... Csoma de Koros... চোখ দ্রুত সরে যেতে যেতে থেমে যায় একটি শব্দে এসে: Kinthup।

কিন্টুপ! মাথার মধ্যে কোথাও একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে টুং শব্দে, কোথাও একটি দরজা সামান্য ফাঁক হয়।

BanglaBook.org

বই নয়, টাইপ করা রিপোর্ট— রয়্যাল সাইজের, নীল ফেল্ট কাপড়ে বাঁধানো, মলাটে এমবস করা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্নমেন্টের সিল, টাইটেল পাতায় লেখা:

Report of Pandit Kinthup's Exploration of Yarlung Tsangpo
As narrated before the Hon'ble Members of the Tibet Frontier Commission, 25-28 March, 1914
Office of the Foreign Secretary, Government of India
Viceregal Lodge, Summer Hill
Shimla
1914

জাবদা টাইপস্ক্রিপ্টটা হাতে ধরে টের পাই শিরার ভেতরে এক বিচিত্র দপদপানি। অবিকল এইরকম একটি নথি আমি দেখেছি অনেক বছর আগে, অন্য এক শৈলশহরে। তখন প্রথম গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের আগুন সদ্য নিভেছে দার্জিলিঙে, ছাই সরানোর কাজ চলছে। সেই ছাইয়ের ভেতর থেকে আধপোড়া, দমকলের জলে ভেজা বইপত্রের একটা বড়ো বান্ডিল এসেছিল মহাকাল মার্কেটের নীচে এক পুরোনো কাগজঅলার দোকানে। তার মধ্যে সেই নথিটা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, সেটি ছিল অনেক পুরোনো, সম্ভবত উনিশ শতকের শেষ দিকের, কিন্তু বিষয়বস্তু হুবহু এক: কিন্টুপ নামধারী এক ব্রিটিশ গুপ্তচরের সাংপো নদের রহস্য সন্ধানে যাত্রার রোমহর্ষক বিবরণ। এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে সারাটা দুপুর সেই ছোট্ট দোকানে পুরোনো খবরের কাগজ আর পত্রিকার স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় পুরোটাই পড়ে ফেলেছিলাম আমি।

দরকারি মনে হলে ওটা বাড়ি নিয়ে যান না, ফেরৎ দিতে হবে না। চেনা দোকানদার নিমা তাশি বলেছিল।

কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে মাঝেমধ্যেই নিমা তাশির গুমটিতে ঢুঁ মারতাম আমি। বিদেশি টুরিস্টদের ফেলে যাওয়া পেপারব্যাক আসত ম্যলের আশেপাশের হোটেলগুলো থেকে ; বেশিরভাগই সস্তা নভেল, তবু তার মধ্যে কখনো মণিমুক্তো মিলেও যেত। মাত্র কুড়ি টাকার বিনিময়ে আধপোড়া, স্যাঁতসেঁতে রিপোর্টটা বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। দিনকয়েকের মধ্যেই তার পাতায় পাতায় ফুটে উঠল কালচে-বেগনি ছাতা, পাতাগুলোও জুড়ে এল। কিন্টুপের সেই কাহিনি তারপরেও অনেকদিন মাথার ভেতরে ছিল, ছত্রাকের ভ্যাপসা ঝিমঝিমে গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, তারপরে হারিয়ে যায় আর পাঁচটা কাহিনির ভিড়ে। রিপোর্টটাও কীভাবে যেন হারিয়ে যায়। (সম্ভবত বাতিল কাগজের সঙ্গে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঠিকে কাজের দিদি ; রাজনীতির আগুন থেকে উদ্ধার হওয়া নথি ফিরে গিয়েছিল গার্হস্থ্য চুলার আগুনে) সিমলায় মারিয়া ব্রাদার্সে নীল ফেল্ট-বাঁধাই রিপোর্টটি হাতে নিয়ে সেই কাহিনি ফিরে এল আমার মনে, সেই নেশাধরানো ছত্রাকের গন্ধটাও, দরজার ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল স্মৃতির কুয়াশা।

টেবিলের সামনে গিয়ে দাম জানতে চাই আমি। চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন দোকানি

BanglaBook.org

ভদ্রলোক, বইটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে অদ্ভুত রিনরিনে গলায় বলেন— এইটিন থাউজেন্ড ফাইভ হানড্রেড।

—এইটিন থাউ... ! আমার চোয়াল ঝুলে আসে।

—আমি আপনাকে ভারতীয় টাকার দামে বললাম। ডলারের দামে ধরলে পঁচিশ হাজারের মতো হবে। এটিই একমাত্র কপি যা ভারতে রয়েছে, এছাড়া আর একটিমাত্র কপি রয়েছে লন্ডনে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে।

বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কেটে কেটে কথা বলেন, রুপোলি ফ্রেমের আড়ালে চোখদুটোয় স্নিগ্ধ কৌতুকের আভাস। আমি প্রতিবাদ করে উঠি।

—একমাত্র কপি! কিন্তু ঠিক এই বিষয়ে এইরকম একটা ছাপানো রিপোর্ট আমি দেখেছি দার্জিলিঙে।

—হ্যাঁ, জানি। কিন্তু সেটা সার্ভে অব ইন্ডিয়ার। পণ্ডিত কিন্টুপ সাংপো অভিযানে গিয়েছিল ১৮৭৯ সালে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছিল। চার বছর পরে ফিরে আসে। ওই রিপোর্টটা তৈরি হয় তার কিছুকাল পরে। তারও প্রায় তিরিশ বছর পরে ম্যাকমাহন লাইন আঁকার সময় কিন্টুপকে সিমলায় এনে আবার জবানবন্দি নেওয়া হয়। এটি সেই রিপোর্ট।

নীল মলাটের ওপর আলতো হাত বুলিয়ে শেলফে যথাস্থানে রেখে দেন তিনি।

ক্ষমাযুদ্ধ

১৮৭৯ সালে কিন্টুপকে সাংপো নদের রহস্য সন্ধানে পাঠানো হল যখন, তিব্বত তখনও বহিরাগতদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, হিমালয়ের আড়ালে চিররহস্যের দেশ। সেই রহস্য যেমন সেখানে বসবাসকারী মানুষ ও তাদের জীবনধারা ঘিরে, তেমনই তার বিচিত্র দুর্গম ভূপ্রকৃতি ঘিরেও। এদিকে ততদিনে এই উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রে উঠে এসেছে, অগম্য অনাবিষ্কৃত বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। সেই মানচিত্রে গোটা উনিশ শতক জুড়েই তিব্বত একটি দগদগে সাদা শূন্যস্থান। অজানার হাতছানি তো ছিলই, এছাড়াও ছিল এক তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা। তিব্বতের ওপারেই ছিল প্রবল শক্তিধর রাশিয়া ও তার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি। পৃথিবীর ছাতের ওপর এই দেশটিকে জানা তাই কূটনীতির তাগিদেই জরুরি হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের কাছে।

ছিল অর্থনীতিও। তিব্বতে ভিনদেশিদের জন্য দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু পণ্য যাতায়াতে নিষেধ ছিল না। হিমালয়ের সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণির মাঝে গিরিপথ দিয়ে সমতলের সঙ্গে বাণিজ্য চলত সেই প্রাচীনকাল থেকেই। গাঙ্গেয়ভূমি থেকে রেশম, ধাতু ও হাতির দাঁতের সামগ্রী, নুন আর খাদ্যশস্য যেত পাহাড় ডিঙিয়ে; ওদিক থেকে আসত পশম, ঘি, চামড়া, চমরি গাইয়ের লেজের চামর ইত্যাদি। এই পথ ধরে বিকিকিনি চলত এমনকি চীনের সঙ্গেও। ভারতে ব্রিটিশরাজ এঁটে বসার পরেও তাতে ভাঁটা পড়েনি, উপরন্তু যোগ

BanglaBook.org

হয় নতুন নতুন বিলিতি রপ্তানি পণ্য। এই পথের বাণিজ্য সম্ভাবনা উপলব্ধি করে দুঁদে শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস তিব্বতে দূত পাঠান সেই আঠেরো শতকে, কিন্টুপ সাংপো অভিযানে যাবার ঠিক একশো বছর আগে। সেই দৌত্য সফল হয়েছিল ; প্রতাপশালী পাঞ্চেন লামার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু হেস্টিংসের উত্তরসূরীরা সেই পথে হাঁটেনি। উপরন্তু তিব্বতের সঙ্গে তার তিন প্রতিবেশী দেশ নেপাল, সিকিম ও ভূটানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। যেকারণে তিব্বতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, গিরিপথগুলোয় বসে কঠোর পাহারা। সেই পাহারা গলে তিব্বতে প্রবেশ সমতলের ভারতীয়দের পক্ষেই ছিল প্রায় অসম্ভব, শ্বেতাঙ্গদের তো প্রশ্নই ছিল না।

বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা গিরিপথে চমরি আর খচ্চরের পিঠে পণ্য চাপিয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য করত ভোটে বা তিব্বতীরা আর কিছু পাহাড়ি জনজাতির মানুষ। এছাড়া ওই পথে যাওয়া-আসা ছিল স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের। উত্তর ভারত থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে এসে পৌঁছয় বুদ্ধের বাণী, দুর্গম উপত্যকার মাঝে গড়ে ওঠে মঠ মন্দির, পাহাড়ের ছোটো ছোটো জনপদগুলোয় রাজশক্তির শাসনকে আত্মস্থ করে ধর্মের শাসন, গোটা তিব্বত জুড়ে লামাতন্ত্র হয়ে ওঠে সর্বশক্তিমান। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকদের জন্য গিরিপথের প্রহরা ছিল শিথিল, পাহাড়ি গ্রামে আশ্রয়লাভ ছিল সহজ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে এই ছিদ্রটির সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল ব্রিটিশ সরকার। লামার ছদ্মবেশে গুপ্তচর পাঠাতে লাগল তিব্বতে। তাদের নাম দেওয়া হল পণ্ডিত।

পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে থেকেই সাধারণত বেছে নেওয়া হতো পণ্ডিতদের। তাদের প্রধান কাজ ছিল তিব্বতের ভূপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ ও জনজীবনের তথ্যসংগ্রহ। এজন্য সার্ভে বিভাগ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সন্ন্যাসীর ভেকের মধ্যে লুকোনো থাকত জরিপের সরঞ্জাম: লাঠির আগায় থাকত কম্পাস, প্রার্থনাদণ্ডের ভেতর কাগজ-পেনসিল, জপমালায় ১০৮টির বদলে ১০০টি পুঁতি। চলার পথে জপমালায় পদক্ষেপ গুনে দূরত্বের হিসেব রাখত তারা। এছাড়া ক্রোনোমিটার, সেক্সট্যান্ট, স্ফুটনাঙ্ক থার্মোমিটার ইত্যাদি থাকত। অনেক সময় ধরা পড়ে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে সঙ্গে কাগজ-পেনসিলও দেওয়া হতো না ; জরিপের খুঁটিনাটি তথ্য ছন্দে গেঁথে বৌদ্ধ মন্ত্রের মতো করে আউড়ে চলত। এইভাবে গুপ্তচর-পণ্ডিতদের নোট আর জবানবন্দি থেকে একটু একটু করে মানচিত্রের সেই সাদা শূন্যস্থান ভরে উঠতে লাগল।

ধন্দ ছিল কেবল একটি আবছা রেখা নিয়ে, একটি নদী। পশ্চিম তিব্বতের সাং প্রদেশে চব্বিশ হাজার ফুট উঁচুতে উৎসারিত হয়েছে সেই নদী বা নদ সাংপো— সাং প্রদেশের সাং আর পো, অর্থাৎ নদী। এরপর সে পূর্ববাহিনী হয়ে বয়ে চলেছে হিমালয়ের একটি ভাঁজ বরাবর। মানচিত্রে হিমালয়ের যে সমান্তরাল ভাঁজগুলোকে দেখে মনে হয় যেন গিলে করা কাপড়ের মতো, প্রকৃতপ্রস্তাবে সেগুলি বিশ্বের গভীরতম উপত্যকা, পনের-বিশ হাজার ফুট তাদের বেধ। তারই ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সাংপো, প্রায় এক হাজার মাইল চলার পর ঢুকে পড়ছে অগম্য গিরিখাতে, হারিয়ে যাচ্ছে গগনচুম্বী

BanglaBook.org

শৈলশিখরের জটে, এবং দুশো মাইলেরও কম দূরত্বে নেমে আসছে ন হাজার ফুট, আচমকা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে প্রবেশ করছে ভারতের সমতলে। তখন তার নাম ব্রহ্মপুত্র। সারা হিমালয়ে তো বটেই, বিশ্বে আর একটিও এমন নদী নেই যা এই বিক্রমে এইরকম খাড়া ঢাল বেয়ে এই পরিমাণ জলরাশি নিয়ে আছড়ে নেমেছে সমতলে।

সাংপোই ব্রহ্মপুত্র কি না এ ব্যাপারে জল্পনা ছিল অনেককাল। কোনো কোনো ভূগোলবিদের ধারণা ছিল পূর্ববাহিনী সাংপো বর্মায় প্রবেশ করে ইরায়ডি হয়েছে। কেউ আবার মনে করতেন সাংপো আর ব্রহ্মপুত্রকে যুক্ত করেছে সুবনসিড়ি। এছাড়াও দুটি প্রধান নদী রয়েছে এখানে, দিবাং আর লোহিত। গোটা বিষয়টি জটিল হয়ে উঠেছে একই নদীর বিভিন্ন নাম হবার কারণে ; তিব্বত থেকে দীর্ঘ যাত্রায় সাংপো কখনও ইয়ারলুং সাংপো, কখনও দিহাং, তারপরে ব্রহ্মপুত্র। ভারতে প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল সেই ১৭৬৫ সালে ব্রহ্মপুত্রের খাত জরিপ করার পর লিখেছিলেন— সাংপোই যে ব্রহ্মপুত্র, সেটি অনুমান করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কিন্তু রেনেলের অনুমান একশো বছর পরেও সরেজমিনে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি দুর্গম প্রকৃতি, রাজনৈতিক সীমানা আর স্থানীয় বৈরি জনজাতির জন্য। উজানপথে ব্রহ্মপুত্রের উৎস খোঁজার চেষ্টা হয় কয়েক বার, প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। ওই পথে অনুসন্ধান যে সম্ভব নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; এবং এটি যে কোনো শ্বেতাঙ্গের কর্ম নয়, সে ব্যাপারেও সংশয় ছিল না।

তাহলে উপায় ?

মূর্তিমান উপায় ছিল দার্জিলিঙেই: ছোটোখাটো অনুল্লেখনীয় চেহারার এক স্থানীয় মানুষ, বয়স বছর তিরিশেক। নাম তার কিন্টুপ। তখন দার্জিলিঙে সদ্য নগরপত্তন হচ্ছে, ভাগ্যের সন্ধানে নিত্যদিন সিকিম আর নেপালের গ্রাম থেকে আসছে নানা ধরনের বৃত্তিজীবী মানুষ। কিন্টুপ ছিল তেমনই একজন। গুন্ডরি বাজারে (পরবর্তীকালে যার নাম হবে চকবাজার) এক দর্জির দোকানে ছোটোখাটো সেলাইয়ের কাজ করত সে। নিমা শেরিং, ওরফে নেম সিং নামে এক পণ্ডিত গুপ্তচরের সহকারী হয়ে একবার গোপনে তিব্বত গিয়েছে এবং, এই ধরনের অভিযানে যে যোগ্যতা আবশ্যিক, অর্থাৎ বুদ্ধি, কষ্টসহিষ্ণুতা আর বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছে।

তখন দার্জিলিঙে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিস খোলা হয়েছে, তার প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট হেনরি হার্মান। সাংপো-ব্রহ্মপুত্রের রহস্য অনুসন্ধানের জন্য কিন্টুপকে বেছে নিলেন হার্মান সাহেব।

এক

চাকরিতে পদোন্নতির আবশ্যিক শর্ত মেনে সিমলায় অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে তিন সপ্তাহের একটি রিফ্রেশার কোর্স করতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা সামারহিল, শহরের ঘিঞ্জি

BanglaBook.org

ব্যস্ততা থেকে কিছুটা দূরে, দেবদারু পাইনের ছায়ায় ঘেরা শান্ত শহরতলিতে হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। কাছেই ভাইসরিগ্যাল লজ, পাহাড়ের মাথা ছেঁটে বসানো বিলিতি রূপকথার দুর্গপ্রাসাদ, কয়েক শো ফুট নীচে ছোট্ট রেলের স্টেশন সামারহিল। আমাদের অতিথিশালাটি ছিল স্টেশনের গায়ে। সারাদিনে দু-জোড়া খেলনা ট্রেন যাওয়া আসা করত ; কেউ নামত না, কেউ উঠতও না। সকালে শহরের শাটল বাস বোঝাই করে ছাত্রছাত্রীরা আসত, দুপুরের পর থেকেই ভাঁটা লাগত ক্যাম্পাসে। শূন্য পাখির বাসার মতো নির্জন হয়ে পড়ত সামারহিল, দেবদারুর পাতায় হাওয়ার শব্দ শোনা যেত।

স্টাফ কলেজে দিনভর চলত বেদম লেকচার সেশন। বিকেলের দিকে প্রায়ই আমরা ক-জন বোর্ডিংছুট ছাত্রের মতো হাঁটা দিতাম ম্যলে, আলো ভিড় কোলাহল আকণ্ঠ গিলে ফিরতাম সন্ধে পার করে। সেদিন মারিয়া ব্রাদার্সে নীল ফেল্ট-বাঁধাই নথিটা আবিষ্কার করার পর আমি একাই যেতে শুরু করলাম।

সামারহিল থেকে রিজ পর্যন্ত পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে পায়ে-চলা পাইনবীথি। তখন বর্ষা শেষ হয়ে আসছে। পীরপঞ্জলের ওপর ঢলে পড়া সূর্যের জাফরান আর পান্নাসবুজ আলোয় ধুয়ে উঠছে আকাশ, ঝিকমিক করছে ব্রিটিশ আমলের বাড়ির শার্সিগুলো। সেই অনির্বচনীয় আলো মুখে মেখে স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দী হবার হুড়োহুড়ি। আমার মাথায় ছেয়ে আছে আগের দিন ছেড়ে আসা একটি কাহিনির পাতা, যার টানে চলেছি নিশি-পাওয়ার মতো, বুকের মধ্যে দুরুদুরু শঙ্কা: আজ গিয়ে নীল নথিটা শেলফে যথাস্থানে দেখতে পাব তো?

ধোঁয়ানীল দরজাটা ঠেলতে সেই টুং শব্দ, সেই রেডালের এক চোখ, সেই কফির মগ থেকে ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে আলোর বৃত্তে।

অনেক সময়েই টেবিলে দেখা যায় না তাঁকে। চেয়ারে ঝোলে মেরুন সার্জের জ্যাকেট, পেছনে জানলায় কালচে সবুজ পাহাড়শ্রেণি। হয়তো বুকশেলফের আড়াল থেকে সহসা উদয় হন, কিংবা নেমে আসেন মই বেয়ে— আত্মমগ্ন, হাতে কলম আর নোটপ্যাড। একটা অসম্ভব ষড়যন্ত্র খেলা করে আমার মনে: কড়া ঘুমের বড়ি ওই কফির মগে ফেলে দিলে কেমন হয়— ভাবি আমি— তারপর একছুটে নীচে মিডলবাজার থেকে পুরো রিপোর্টটা ফোটোকপি করে নিয়ে ফের যথাস্থানে রেখে দেওয়া যায় যদি?

নিজের কল্পনার ধাক্কায় নিজেই অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি স্থাণুবৎ, হাতে খোলা কিন্টুপস রিপোর্ট, টুলের ওপর তিব্বতি মুখোশটা বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে থাকে আমার দিকে।

একদিন দেখি মুখোশটা উঠে গিয়েছে তাকে, টুলটা খালি। আমি গিয়ে বসতে চোখ তুলে তাকালেন একবার, মুখে সাদা দাড়ির আড়ালে ভাবান্তর হল কি না বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

দুই

এক যে ছিল নদী

সাংপো অভিযানের জন্য কিন্টুপকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে যখন, সেইসময় দার্জিলিঙে এসে ছিল এক চিনা লামা। তিব্বতে ঢোকার ছাড়পত্র ছিল তার কাছে, লিখতে পড়তেও জানত। কিন্টুপ ছিল নিরক্ষর। স্থির হয়, লামার ভৃত্য সাজিয়ে পাঠানো হবে কিন্টুপকে। ছাড়পত্রের সুবাদে তিব্বতের নিষিদ্ধভূমিতে তাদের বিচরণ হবে অবাধ, আর জরিপের তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে লামা সাহায্য করবে কিন্টুপকে।

নিরক্ষর হলে কি হয়, নেম সিং-এর সহকারী হয়ে প্রথমবার তিব্বতে গিয়ে সার্ভের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল কিন্টুপ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানত। এছাড়া তার ছিল এক আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। দুর্গম জটিল অরণ্যপাহাড়ে গিয়ে সেখানকার টপোগ্রাফি রিলিফ ম্যাপের মতো মাথার ভেতরে খোদাই করে নিতে পারত। মূলত সেই কারণে এই কঠিন অভিযানে তাকে বেছে নিয়েছিলেন হার্মান সাহেব।

সেপ্টেম্বরের এক কুয়াশাঢাকা দিনে দার্জিলিং থেকে তিব্বতের পথে যাত্রা করল পণ্ডিত কিন্টুপ, ওরফে KP*। কার্ট রোডের নীচে বুচারবস্তিতে তার ছোট্ট কাঠের বাসায় স্ত্রী, দুই পুত্র ও একটি সদ্যোজাত কন্যাসন্তান ; গুপ্তচরবৃত্তির বিধি মেনে স্ত্রীর কাছেও যাত্রার আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখেছিল। অভিযানের মেয়াদ মাস চারেক ধরে নিয়ে তার পরিবারের জন্য এককালীন কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। পথে রাহাখরচের জন্যে কিন্টুপদের দেওয়া হয়েছিল একশত টাকা আর বিনিময়যোগ্য রুপোর মুদ্রা। এছাড়া ছিল সার্ভের সরঞ্জাম। ঠিক হয়েছিল, তিব্বতে প্রবেশ করার পর চেতাং থেকে সেই গহীন দুর্গম গিরিখাত ধরে সাংপোর গতিপথ অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে যাবার চেষ্টা করবে তারা।

সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু সমস্যা হল চিনা লামাটিকে নিয়ে। এইরকম অভিযানের জন্য যে শারীরিক উদ্যম আর মানসিক সংকল্প লাগে, তা তার ছিল না ; ব্রিটিশ সরকারের দাক্ষিণ্যে বেমওকা প্রমোদভ্রমণ মনে করেই বেরিয়েছিল সে। তিব্বতে ঢোকার পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর খোলসের থেকে বেরিয়ে এল এক পানাসক্ত লম্পট। কিন্টুপের সঙ্গে প্রভুর মতোই আচরণ করতে লাগল, পথে বিভিন্ন পাহাড়ি গ্রামে

---

* Kinthup নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর জুড়ে দেওয়া ছদ্মনাম।

BanglaBook.org

ভোগলালসায় নেশার দ্রব্যে মূল্যবান সময় আর টাকাকড়ি অপচয় করতে লাগল। চেতাং উপত্যকা পার হয়ে লোপা উপজাতিদের এক গ্রামে মোড়লপত্নীর সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ল। এভাবে কেটে গেল কয়েক মাস। সেই গিরিখাত তখনও অনেক দূরে। সাংপোর পাড় ধরে এগিয়ে যেতে যেতে পথ ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়তে লাগল, দুপাশে পাহাড় উঁচু হয়ে খাতের দুদিকে ঠেসে এল, অসম্ভব ঘন দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে লাগল জঙ্গল। এই অভিযান যে তার জন্য নয়, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল লামা, আক্ষরিক অর্থেই। তাছাড়া পাথেয়ও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। সাংপোর খাড়া পাড়ে থঙ্কিয়ুক নামে এক বসতিতে গ্রামবুড়োর গৃহে আশ্রয় নেবার পর একদিন লামা কিন্টুপকে বলল:

—লোপা গ্রামের মোড়লবউয়ের জন্যে দেহমন বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে আমার, দিন কয়েকের অব্যাহতি চাই। দুটো রাত কাটিয়েই ফিরে আসব।

কিন্টুপ অপেক্ষা করে। দিনের পর দিন যায়। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু না থাকায় গ্রামপ্রধানের ঘরে দুবেলা দুমুঠো আহারের বদলে নদী থেকে জল টেনে আনতে হয়, জঙ্গলের কাঠ কেটে আনতে হয়। যব খেতের ধারে ঘাসপাতায় ছাওয়া ভেড়ার খোঁয়াড়ে ঠাঁই হয় তার। পাহাড়ের ঢালে থাকে-থাকে বসতি, ওপরের দিকে ঘন ফার আর রডোডেনড্রনের বন, তার ওপারে উঁকি দেয় শাদা বরফের চুড়ো। অনেক নীচে দিয়ে বয়ে চলে ইয়ারলুং সাংপো। নুড়িপাথরের গায়ে জলের ধ্বনি অবিরাম ডাক দেয় কিন্টুপকে, অস্থির করে তোলে। একদিন সে গ্রামবুড়োর কাছে গিয়ে বলে:

—আমার প্রভু কবে ফিরবে জানি না, কিন্তু আমাকে এবার যেতে হবে।

তামাকপাতায় কালো দাঁত বের করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে গ্রামবুড়ো।

—তোমার প্রভুও আর ফিরেছে, তুমিও আর ফিরেছ!

—তার মানে?

—তোমায় পঞ্চাশ টাকায় বেচে দিয়ে আপন দেশগাঁয়ে ফিরে গিয়েছে সে ব্যাটা লামা। এখন আমিই তোমার প্রভু।

ক্রীতদাস হয়ে থঙ্কিয়ুক গ্রামে দীর্ঘ বর্ষার পাঁচ মাস কাটে কিন্টুপের। সারাদিন মাথার ভেতরে বেজে চলে সাংপোর কলধ্বনি, রাতের বেলা সকলে ঘুমিয়ে পড়লে জরিপের যন্ত্রপাতিগুলো বের করে নাড়াচাড়া করে। একদিন দূরের জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার অছিলায় পালিয়ে যায় সে।

পালিয়েও কিন্তু সাংপোকে ছাড়ে না কিন্টুপ, গহীন অরণ্যপাহাড়ের গা আঁকড়ে পথ কেটে নদীর খাত ধরে চলে। জপমালায় পদক্ষেপ গুনে, কম্পাসে দিক নির্ণয় করে, মাথার ভেতরে প্রতিটি বাঁক ঝর্ণা খাদ পাথর বালুতট ভূপ্রকৃতির মানচিত্র গিঁথে নিতে নিতে এগিয়ে চলে দিনের পর দিন। কখনো গোপালকদের বসতিতে, কখনো বিজন প্রকৃতির মাঝে নদীর জল আর জংলি পাতা খেয়ে গাছের ডালে রাতের আশ্রয়। এক জায়গায় এসে সে আবিষ্কার করে একটি ঝর্ণা, যার গায়ে মেঘের ওড়নার মতো জলকনায়

BanglaBook.org

ফুটে আছে রামধনু* আরেক জায়গায় নদীপাড়ে ভিজে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখে। একদিন সে গিয়ে পৌঁছোয় উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এক মায়াবী সবুজ উপত্যকায়। নীচে বয়ে চলেছে সাংপো, খাড়া পাহাড়ের খাঁজে পদ্মপাপড়ির মতো একটি মঠ। সেই মঠে অপেক্ষা করছিল থঙ্কিয়ুক গ্রামের অনুসরণকারীরা, কিন্টুপ গিয়ে পৌঁছতেই ধরে ফেলে। মঠের প্রধান লামা দয়াপরবশ হয়ে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেন একটি শর্তে: টাকা উসুল না হওয়া পর্যন্ত মঠে শ্রমদান করতে হবে কিন্টুপকে।

উপত্যকাটির নাম পেমাকো। খরস্রোতা সাংপো এখানে বয়ে এসে মন্থরগতি হয়েছে। চারিদিকে গগনচুম্বী পাহাড়, হিমবাহে পুষ্ট অসংখ্য ধারায় বিধৌত চিরসবুজ বৌদ্ধ পবিত্রভূমি। নদীপাড়ে শান্ত জনপদ আর কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে ঈগলবাসার মতো ঝুলে আছে পেমাকোচুং মঠ। সেখানে দিন কাটে কিন্টুপের। থঙ্কিয়ুকের মতো হাড়ভাঙা শ্রম নয়— লামাদের ফাইফরমাশ খাটা, উপাসনাঘরের মেঝে সাফাই আর একদিন অন্তর নীচের বসতি থেকে আনাজপাতি বয়ে আনতে হয়।

পেমাকো থেকে কয়েকশো ফুট ধাপে ধাপে ভেঙে চুরচুর হয়ে সাংপো ঢুকে পড়েছে দুস্তর অরণ্যে ঢাকা খাতের ভেতর। কুয়াশামুক্ত দিনে মঠের অলিন্দ থেকে রুপোর পাতের মতো চিকচিক করছে দেখা যায়, হাওয়ায় ভেসে আসে ঈগলের ডাক। সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা উপাসনা মন্দিরের চৌকাঠে বসে জপমালা হাতে প্রার্থনা করে কিন্টুপ, মাখনের প্রদীপে দীপ্যমান অতিকায় বুদ্ধমূর্তির নিমীলিত চোখের দিকে চেয়ে থাকে। দিনের পর দিন হাতের জপমালা ঘুরিয়ে পথের দূরত্ব মাপতে মাপতে কবে যেন জপমালাটিই হয়ে ওঠে নদী। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, কিন্টুপ দেখে বেগনি নক্ষত্রঝলমল আকাশের গায়ে ফুটে আছে স্ফটিকের পিরামিড, অনেক নীচে যেন কোনো স্বপ্নের দেশ থেকে শোনা যাচ্ছে জলের কলধ্বনি।

একদিন প্রধান লামার কাছে তীর্থপরিক্রমার জন্য কিছুদিনের ছুটি প্রার্থনা করে কিন্টুপ। ততদিনে পেমাকোচুঙে তার কেটে গিয়েছে অনেক মাস, বর্ষা চলে গিয়ে এসেছে শীত। প্রার্থনা মঞ্জুর হতে সাংপোর খাত বরাবর কখনো বোল্ডারের পথে, কখনো খাড়া পাথরে বুনো হরিণের চলার চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে অভীষ্টের দিক। যত এগোয় ততই ক্রমশ গহীন হয়ে উঠতে থাকে পথ, দুষ্প্রবেশ্য, আকাশে উঠে যাওয়া গিরিখাতের গায়ে জমাট রডোডেনড্রনের ঝোপ, ওপর দিকে আদিম বার্চের ডাল থেকে সর্পিল লতার দড়িদড়া নেমে দিনের বেলাতেও আঁধার হয়ে আছে। বন্যপ্রাণীর ডাক নেই, স্নো-ফেজেন্টের কাকলি নেই, কেবল একের পর এক র‍্যাপিড ভেঙে লাফিয়ে বয়ে-চলা সাংপোর একটানা কানফাটানো গর্জন। এগারো দিন চলার পর খাতের একটি বাঁকে এসে থামে কিন্টুপ: নদীর পাড় ঘেঁষে একটুকরো ঘাসজমি, তার ওপরে শ-দুয়েক ফুট উঁচুতে পাথরের খাঁজে একটি গুহার মতো ফাটল। তিন দিন ধরে উদয়াস্ত রডোডেনড্রনের ডাল

---

* পরবর্তীকালে এই ঝর্ণার নাম হবে কিন্টুপ ফল।

BanglaBook.org

কেটে পাঁচশোটি এক ফুট লম্বা কাঠের দণ্ড তৈরি করে সে, তারপর সেগুলো গুহার মধ্যে রেখে মঠে ফিরে আসে।

কিছু মাস পরে বুদ্ধের জন্মতিথিতে লাসায় তীর্থদর্শনের জন্য ফের আর্জি জানায় কিন্টুপ। এবারেও আর্জি মঞ্জুর হয়। লাসায় গিয়ে দার্জিলিঙের এক কম্বলের ব্যাপারির মারফৎ নেম সিংকে একটি বার্তা পাঠায় সে। বুদ্ধপূর্ণিমার পর নটি চাঁদের মাস পার হলে অমাবস্যা থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন পঞ্চাশটি করে বিশেষ চিহ্নিত কাঠের টুকরো সাংপোর স্রোতে ভাসানো হবে— কিন্টুপ জানায়— নেম সিং যেন পত্রপাঠ এই বার্তা হার্মান সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়। এরপর সে ফিরে আসে মঠে।

ফের সেই শ্রমদান, প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত বুদ্ধের চোখ, ঈগলের দূরাগত ডাক আর মাঝরাতে নীচের উপত্যকা থেকে উদ্‌গত সাংপোর ধ্বনি। দিনের পরে দিন যায়, চাঁদ শুকোয় আর পেকে ওঠে, বর্ষা নামে পেমাকো উপত্যকায়। প্রধান লামার কাছে আবার তীর্থপরিক্রমার প্রার্থনা জানায় কিন্টুপ।

কিন্টুপের একনিষ্ঠ শ্রম আর ধর্মভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে প্রধান লামা এবারে মুক্তি দেন তাকে, পাথেয় হিসেবে দেন রোদে শুকোনো ভেড়ার মাংস, চিজ আর কয়েকটি তিব্বতী মুদ্রা। মঠে সন্ন্যাসীদের থেকে বিদায় নিয়ে কিন্টুপ ফিরে যায় সাংপোর খাতের বাঁকে সেই গুহায়, যেখানে কাঠের টুকরোগুলো রেখেছিল। বর্ষায় স্ফীত নদী, পাড় ঘেঁষে সুঁড়িপথের চিহ্নগুলো হারিয়ে গিয়েছে। এগারো দিনের রাস্তা পঁচিশ দিন লেগে যায়। পথে অনেকগুলো হিমবাহ গলে নামা ঝর্ণা পার হতে হয়। গন্তব্যে পৌঁছিয়ে কিন্টুপ দেখে সেই ঘাসজমিটা ডুবে গিয়েছে, জল উঠে এসেছে প্রায় গুহার মুখে। প্রত্যেকটি কাঠের দণ্ডে ব্রিটিশ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সিল আঁটে সে, তারপর নির্ধারিত দিন থেকে দশদিন ধরে প্রতিদিন পঞ্চাশটি করে দণ্ড ভাসিয়ে দেয় সাংপোর ফেনায়িত স্রোতে।

কিন্টুপ যেখানে দণ্ডগুলো ভাসিয়েছিল, তারপরেই তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সাংপো ঢুকে পড়ছে পঁচিশ হাজার ফুটের বেশি উঁচু নামচে বারোয়া আর গ্যালা পেরি শৃঙ্গের মাঝে জমাট গহীন খাতের ভেতর, প্রায় পঞ্চাশ মাইল। ওই পঞ্চাশ মাইল গিরিখাতে প্রথম মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়তে আরো প্রায় একশো বছর লাগবে। পৃথিবীর সব মরু, মেরু, মহাদেশ ও সমুদ্রতল আবিষ্কারের পরে, চন্দ্রাভিযানেরও ঢের পরে, ২০০২ সালে একদল ইউরোপীয় অভিযাত্রী কায়াক বেয়ে প্রথম পার হবে সেই প্রখর খাত। ততদিনে অবশ্য প্রযুক্তির সাহায্যে মানচিত্রে নিখুঁত আঁকা হয়েছে ইয়ারলুং সাংপোর পথ, সাংপোই যে ভারতের সমভূমিতে ঢুকে ব্রহ্মপুত্র হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই কোনো। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তার আগে কিন্টুপ বর্ণিত রামধনুর মেখলা-পরা এক আশ্চর্য ঝর্ণার খোঁজে একাধিক অভিযাত্রী আসবে।

কিন্টুপের ছিল না সেই অনুবর্তী ইতিহাসের ভার। এক রহস্যনদের অজানা পথের টানে চলেছিল সে।

পূর্বঘোষণা মোতাবেক কাঠের টুকরোগুলো ভাসিয়ে দেবার পর নামচে বারোয়া-গ্যালা

BanglaBook.org

পেরির মধ্যবর্তী সেই দুর্লঙ্ঘ্য পঞ্চাশ মাইল এড়িয়ে ফের সাংপোর গতিপথ ধরে এগিয়েছিল কিন্টুপ, যতদূর অব্দি এগোনো যায়। হিমালয়ের সুউচ্চ তল থেকে অগণন প্রপাতে ঝর্ণায় চূর্ণ হতে হতে সাংপো নেমে এসেছে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়। কিন্টুপের পরিকল্পনা ছিল ওই প্রবাহের পথেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রবেশ করার। দিনের পর দিন কঠিন অরণ্য পাহাড় ভেদ করে, কখনো পাহাড়ি উপজাতিদের গ্রামে আশ্রয় কখনো বিজন অরণ্যে, গাছের উঁচু ডালে কিংবা পাহাড়ি গুহায়, হিমবাহের চড়াই ভেঙে প্রাণান্তকর গিরিপথ ডিঙিয়ে সেই সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছিল সে। ওলোন নামে একটি গ্রাম থেকে দেখেছিল সেই স্বপ্নসম্ভব দৃশ্য, যেখানে পরস্পর ঢেউয়ের মতো পাহাড়শ্রেণি আচমকাই শেষ হয়েছে সমতলে, আর দূরের দিগন্তে আদিম কালচে-সবুজ অরণ্যভূমির বুক চিরে মন্থর কুয়াশার মতো বইছে দিবাং, যা আসাম উপত্যকায় ঢুকে হয়ে উঠবে ব্রহ্মপুত্র।

কিন্তু বাদ সাধল অবোর জনজাতির মানুষেরা। ওদের জঙ্গি পাহারা এড়িয়ে ওই অঞ্চল পার হওয়া ছিল অসম্ভব। অগত্যা ভিন্ন পথে ভুটানের ভেতর দিয়ে দার্জিলিঙে ফিরে আসে কিন্টুপ।

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে চার-চারটে বছর। দার্জিলিং শহরটা বদলে গিয়েছে, টয়ট্রেন এসেছে, ফুলে ফেঁপে উঠেছে বাজার, অনেক নতুন মানুষ আর নতুন বাড়িঘর উঠেছে। অচেনা নির্মম শহরে ফিরে কিন্টুপ জানতে পারে তার স্ত্রী ও শিশু কন্যাটি মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে নেম সিং-ও। লাসা থেকে কম্বল ব্যবসায়ীর হাতে যে চিঠিটি সে পাঠিয়েছিল, খোলাই হয়নি সেটি। ইতিমধ্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন হার্মান সাহেব। সাংপোয় ভাসানো সেই সিল-আঁটা কাঠের দণ্ডগুলো ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে উদ্ধারের জন্য, সাংপোই যে ব্রহ্মপুত্র এই সত্য অকাট্য প্রমাণের জন্য ছিল না কেউ। সেগুলো ভেসে গিয়েছে সমুদ্র, সবার অলক্ষ্যে। কিন্টুপের অভিযানের বৃত্তান্ত শুনে বিশ্বাস করার মতো একজনও মানুষ নেই গোটা দার্জিলিং শহরে।

BanglaBook.org

শিমলায়

মারিয়া ব্রাদার্স থেকে বেরিয়ে দেখি কখন দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। দূর পাহাড়ের গায়ে গনগন করছে ছোটা সিমলার আলো। ম্যাল রোড জমজমাট। রঙিন পশমে মোড়া শিশুরা ছুটোছুটি করছে রিজ চত্বরে, আইসক্রিম পার্লারের সামনে ভিড়, কুকুর হাতে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে স্থানীয় সচ্ছল বাসিন্দারা, শৌখিন বকলস-আঁটা পুডলের সঙ্গে রটওয়েলারের ছেনালি চলছে স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে। দোকানের বাইরে ফুটপাথে দীপ্ত যৌবনের ভঙ্গিতে খাড়া ফাইবারের মনুষ্যমূর্তি জীবন্ত ভেবে ভ্রম হয়।

ছিপছিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়, ভিজে অ্যাশফল্টে ঝিকমিক করে দোকানের শোকেসের আলো, আমি ঢুকে পড়ি কফিহাউসের চেনা ধূসর পরিসরে।

সিমলার এই কফিহাউসে নাকি জওহরলাল নেহরু আসতেন। সাবেকি কাঠের মেনুবোর্ড অনুযায়ী এখানে এখনও পরিবেশিত হয় ব্রিটিশ নুডলস, মার্কিন চাউমিন নয়। সাদা উর্দি-আঁটা বেজার মুখের ওয়েটার, মলিন দেয়াল আর চটাওঠা টেবিল ও কাপ-প্লেটে ইতিহাস না থাকুক সময়ের একটা ধারাবাহিকতা আছে, যা আমায় এই অচেনা শীতল শহরে ফিরিয়ে দেয় কলেজস্ট্রিট কফিহাউসের সন্ধ্যা। তাছাড়া এই মহার্ঘ ম্যলে আর কোথায়ই বা আট টাকায় এক কাপ ইনফিউশান নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকা যায়, কাচের বাইরে দৃষ্টি বকলসহীন ছেড়ে রাখা যায় সুবেশা সুন্দরীদের মিছিলে? এক কোণে টেবিল জুড়ে আড্ডা দেয় একদল উকিল, কালো কোটগুলো চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো। সার্জের জ্যাকেট আর ছাইরঙা হোমবার্গ টুপি-পরা বৃদ্ধ একা টেবিল আগলে বসে থাকে, কফির কাপে অতীব মন্থর চামচ নাড়াতে নাড়াতে বার বার দরজার দিকে তাকায়, অনাগত সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করে। আমার মাথার ভেতরে কুয়াশার মতো ছেয়ে আসে কিন্টুপের গল্প। নিজেকে কোলরিজের রাইম অব দ্য এনসিয়েন্ট মেরিনার কবিতার সেই ম্যারেজ গেস্ট মনে হয়।

কোলরিজের কবিতায় বুড়ো নাবিকের ছিল ধকধকে চোখ আর উস্কোখুস্কো পাকা দাড়ি, খপ করে কনেযাত্রীর কব্জি খামচে ধরে বলেছিল: এক যে ছিল জাহাজ! তারপর বলতে শুরু করেছিল তার কাহিনি।

তেমনই কোন বিস্মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে কিন্টুপ নামে দার্জিলিঙের এক নিরক্ষর দর্জি মুঠিতে ধরেছে আমার চেতনা, বলে উঠেছে: এক যে ছিল নদী! দার্জিলিঙের লাডেন লা রোডে রদ্দি পেপারওলা নিমা তাশির গুমটি থেকে সিমলার অ্যান্টিক বইয়ের দোকান মারিয়া ব্রাদার্স, তাড়া করে ফিরছে আমায়।

ঐ মা য় ঐ

কিন্টুপ দার্জিলিঙে ফিরে আসার পর সাংপো অভিযানের কাহিনি কেউই বিশ্বাস করেনি। দাখিল করার মতো কোনো তথ্যপ্রমাণ ছিল না ওর কাছে— না কোনো নোট, না কোনো মানচিত্রের স্কেচ। ছিল কেবল স্মৃতি। সেই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা যাত্রাপথের বিবরণ একটি রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করে সার্ভে অব ইন্ডিয়া, অনেক গড়িমসির পর। কিন্টুপের জবানবন্দী অনুলিখন করেছিল দার্জিলিঙে ভুটিয়া স্কুলের শিক্ষক লামা উগেন গ্যাৎসো, তারপর সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এভাবে মুখের কথা দুটি ভাষায় হাতবদল হয়ে বিবরণের খুঁটিনাটি অস্বচ্ছ হয়ে আসে, তথ্যে অসঙ্গতি ঢুকে পড়ে, বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। সরকারি মহাফেজখানার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে ছত্রাকে আকীর্ণ হয় সেই রিপোর্ট, অপেক্ষা করে এক শতাব্দী পরে অস্থির রাজনীতির আগুনের জন্য। কিন্টুপ ফিরে যায় চকবাজারে তার পুরোনো বৃত্তিতে, সেলাই গুমটিতে, চার বছরে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে যাওয়া পারিবারিক জীবনটা রিফু করে দিন গুজরান করে।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা উলটে যায়। ১৯০৩ সালে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের নেতৃত্বে তিব্বতে ব্রিটিশ সেনা অভিযান হয়, হিমালয়ের পারে নিষিদ্ধ দেশটা পেশি শক্তির চাপে বন্ধ ঝিনুকের মতো খুলে ফেলা হয়। পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর পাঠাবার কৌশলটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। পেশাদার ভূপর্যটকের হাতে পড়ে পৃথিবীর শেষ অনাবিষ্কৃত দেশ, তার নদী পাহাড় অরণ্য মালভূমি, আঁতিপাতি করে উঠে আসে মানচিত্রের সুস্পষ্ট রেখায়।

তবু এত কিছুর মধ্যেও আবছা থেকে যায় একটি রেখার ছাঁদ, একটি নদীর পথ— দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণেই।

দার্জিলিঙের এক সামান্য দর্জির সাংপো অভিযানের বিবরণ সরকারি সার্ভে মহলে সেভাবে কোনো স্বীকৃতি না পেলেও কিন্টুপের নামটা মাঝেসাঝে উঠে আসত ভূবিদ অভিযাত্রীদের লেখায়। তার প্রধান কারণ হল সাংপো গিরিখাতে একটি জলপ্রপাতের কথা বলেছিল সে। ন হাজার ফুট উঁচু তিব্বতের উপত্যকা থেকে মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে আসামের সমভূমিতে নেমে আসছে একটি নদী— এই দুরূহ অঙ্ক মিলতে গেলে আবশ্যিক একটি প্রপাত, যা হতেও পারে নায়াগ্রা কিংবা ভিক্টোরিয়া ফলসের থেকেও প্রকাণ্ড ও বিপুল, কিংবা পর পর একাধিক ঝর্ণা। কিন্টুপ বর্ণিত সেই জলপ্রপাত, যার গায়ে ধূমায়িত জলকণায় সারাদিন ফুটে থাকে আস্ত একটি রামধনু, বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে একাধিক পেশাদার অভিযানকারীর কল্পনা উস্কে তুলেছে।

ক্যাপ্টেন এরিক বেইলি ছিলেন তাদেরই একজন। ১৯০৩-এর সেই সেনা অভিযানে তিব্বতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়েই সাংপোর রহস্যময় গতিপথ সম্পর্কে আগ্রহী হন, এবং তার বছর দশেক পরে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এক অফিসার হেনরি মোর্সহেডকে সঙ্গী করে আসাম উপত্যকা থেকে উজানপথে সাংপো গিরিখাত অনুসন্ধানে যান। খাতের দুর্গমতম অংশে যেতে পারেননি তাঁরা, কিন্তু তেরিশ বছর আগে করা কিন্টুপের জরিপ যে প্রায় নিখুঁত ছিল, সেটি প্রত্যক্ষ করেন এবং ফিরে এসে ঘোষণা করেন।

ততদিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পট বদলে গিয়েছে। চিনে মিং সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, তিব্বতের শাসনব্যবস্থায় চিনের প্রভাব শিথিল হয়ে এসেছে। সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে একটি সুস্পষ্ট ভারত-তিব্বত সীমান্ত চুক্তি করার জন্য ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে সিমলায় একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল ব্রিটিশ সরকার।* আর তখনই দার্জিলিঙে খোঁজ পড়ল এক বৃদ্ধের, তাঁকে পাওয়াও গেল বাজারের এক কোণে ছোট্ট একটি দর্জির দোকানে, সরকারি খরচে নিয়ে আসা হল সিমলায়। তখন বসন্তকাল, সিমলার পথে পথে নানারঙের ফুলের মেলা, জাখু পাহাড়ের মাথায় শেষ বরফের ছোঁয়া।

সেই নিসর্গশোভা চাক্ষুষ করার অবস্থা বৃদ্ধের ছিল না। সারাদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন

---

* খাতায় কলমে বৈঠকটি ছিল ত্রিপাক্ষিক— তিব্বত চিন ও ভারত সরকারের মধ্যে। তবে চিনের প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি এবং পরবর্তীকালে সেটির বৈধতা অস্বীকার করে।

BanglaBook.org

সেলাইগুমটিতে সূচের কাজ করে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ন্যুব্জ অশক্ত দেহ। কিন্তু টিবেট ফ্রন্টিয়ার কমিশনের অফিসারদের সামনে চার দিন ধরে তিরিশ বছরের পুরানো স্মৃতি হাতড়ে তুলে আনলেন পৃথিবীর শেষ অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের এক আশ্চর্য অনুপুঙ্খ বিবরণ।

এবারে কিন্টুপের জবানবন্দী তর্জমা করলেন ক্যাপ্টেন বেইলি স্বয়ং। উত্তরপূর্ব হিমালয়ে দীর্ঘকাল কাটানোর সুবাদে অনেকগুলো পাহাড়ি ভাষা জানতেন তিনি। কিন্টুপের বয়ানের সঙ্গে বেইলি ও মোর্সহেডের জরিপ করা তথ্য মিলিয়ে মানচিত্রের ওপর ফেল্টের নিব দিয়ে লাল কালিতে একটি রেখা টানলেন তদানীন্তন বিদেশ সচিব হেনরি ম্যাকমাহন। ঘন পাহাড়শ্রেণি আর অরণ্যময় উপত্যকার ওপর দিয়ে এই কাল্পনিক রেখা, যার নাম ম্যাকমাহন লাইন, ভবিষ্যতে অনেক রক্তপাত আর অশান্তির জন্ম দেবে।

সাংপো অভিযানের স্বীকৃতি হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিন্টুপ পেলেন একটি মেডেল আর এক হাজার টাকা, মূলত বেইলির উদ্যোগে। কিন্টুপের জন্য মাসিক পেনশনেরও তদবির করেছিলেন তিনি, কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায়। সরকার বাহাদুরের যুক্তি ছিল, এই প্রখর স্মৃতিধর বৃদ্ধ অনেককাল বাঁচবে এবং রাজকোষের প্রভূত অর্থ ব্যয় হবে।

দার্জিলিঙে ফিরে এসে পরের বছরেই মারা যান কিন্টুপ।

এ মা এ ম

কফিহাউস থেকে বেরোলাম যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এসেছে। ম্যালে লোকজন প্রায় নেই, দোকানগুলোয় ঝাঁপ নেমে যাচ্ছে একে একে, আলোর রোশনাই মরে এসেছে। আলোআঁধারির ভেতর অতিকায় মালের পেটি পিঠে নিয়ে নিঃশব্দ ছায়ার মতো লক্কড়বাজারের দিকে চলেছে তিন কুলি। ওদিকে পাহাড়ের গায়ে ছোটা সিমলার আলোগুলো বেশিরভাগ নিভে গিয়েছে। সামারহিল যাবার পায়ে-চলা পথ একেবারে জনহীন, বাতিস্তম্ভের নীচে পাইনের ডালপালার ডোরাকাটা ছায়া আর ঝিঁঝির তান। ওই পথে প্রায় আড়াই কিলোমিটার একা একা হেঁটে ফিরতে পা সরে না আমার। লোয়ার বাজার থেকে শাটল বাস ধরব।

মিডল বাজারে দোকানপাট বন্ধ, পাকদণ্ডি গলিপথে ক্লান্ত মাতাল কুলি ও কুকুর। দর্জিমহল্লার কোথাও একটি নির্জন সেলাইমেশিনের ঝর্ঝর ঝর্ঝর শব্দ পাহাড়ি ঝিঁঝির মতো ওঠে আর নামে।

টিবেট ফ্রন্টিয়ার কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে এখানেই কোথাও উঠেছিলেন কি কিন্টুপ? একশো বছর আগে আরও ঘিঞ্জি আর ছড়ানো ছিল মিডল বাজারের এই দর্জিমহল্লা। তখনও রেডিমেড পোশাকের চল হয়নি। ম্যালে আপার বাজারে কাপড়ের

BanglaBook.org

দোকানে এসে পোশাকের অর্ডার দিত সাহেবমেমরা, মিডল বাজার থেকে দর্জিরা উঠে এসে মাপ নিয়ে যেত। পার্টি-পিকনিক-ঘোড়দৌড়-ফ্যান্সি ড্রেস বলের আবর্তে বছরে ছ মাস সিমলা হয়ে উঠত প্রাচ্যের ফ্যাশনের রাজধানী, মিডল বাজারের সেলাই মেশিনগুলো বছরে ছ মাস থামার ফুরসৎ পেত না। সেই কাল গিয়েছে। দর্জিগলিতে এখন সস্তা কিউরিও, মিঠাই আর স্কুলের বইখাতার দোকান। শহরের নীচের দিক থেকে চালেচালে ঠেসে এসেছে লোয়ার বাজার, যা দেখে কিপলিং সাহেব তাঁর কিম উপন্যাসে লিখেছিলেন— ঘিঞ্জি খরগোশের বাসা, যা উপত্যকা থেকে টাউনহল পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে উঠেছে। এর সুলুকসন্ধান যে জানে, তার পক্ষে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া কিছুই নয়, কারণ এখানে প্রতিটি বারান্দা চতুর ফিসফাস করে পাশের বারান্দার সঙ্গে, গলির সঙ্গে গলি, ঘুলঘুলির সঙ্গে ঘুলঘুলি।

একশো বছর পরেও সেই লোয়ার বাজার যেন খামিরযুক্ত পাঁউরুটি, ফুলে ফেঁপে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে, ভেতরে অসংখ্য জটিল নালিপথ। পথের দুধারে খিন্ন বস্তি, টিমটিমে আলো জ্বলছে, রাতের রান্না চেপেছে দোরগোড়ায়, খবরের কাগজ সাঁটা জানলার ওপারে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে একটি বালিকার ছায়া, এক চিলতে আলোকিত উঠোনে এক্কাদোক্কা খেলছে তার সঙ্গীরা, নালার জলে কাপড় কাচছে কয়েকজন। লাদাখি মহল্লার ভেতর দিয়ে এককালের টানা রিকশার ঝাম্পানিদের ঠেক, তার নীচে শর্টকাট সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি বাসস্ট্যান্ডে। এখান থেকে ছাড়ে চণ্ডীগড় যাবার রাতের বাস, আপেলের পেটি বোঝাই হচ্ছে ছাতে। সামারহিল ফেরার শেষ শাটল বাসের কন্ডাক্টর হাঁকছে:

—বালুগঞ্জ টুটু জাতোগ! লাস্ট ট্রিপ!

এই ডাকে আমার মনে আচমকাই ভেসে ওঠে ভিন্ন এক শৈলশহরে শোনা ব্যাকুল আহ্বানের স্মৃতি। দার্জিলিঙের চকবাজারে সন্ধ্যা নামার আগে এভাবেই ডাক দিত শেয়ার জিপের ড্রাইভার খালাসিরা:

—শিলগড়ি শিলগড়ি শিলগড়ি! লাস্ট টার্ন!

এই ডাক শুনলে প্রতিবার আমার বুকের মধ্যে হ্যাঁচকা দিয়ে যেত সমতলে ঘরে ফেরার টান। এতকাল পরে সেই অনুভূতির রেশ আমায় ফিরিয়ে দিল মন-কেমন-করা দার্জিলিং।

BanglaBook.org

তিন

শাংগ্রিলা বার

দার্জিলিঙের চকবাজারে গোলঘর রেস্টুরেন্টের পেছনদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একসারি দর্জির দোকান, নগরপত্তনের গোড়া থেকেই ছিল। সারাদিন অনেকগুলো সেলাইমেশিনের একটানা শব্দে মৌচাকের মতো সজীব হয়ে থাকত এলাকাটা, নীচের রাস্তায় গাড়িঘোড়া ফুটপাথ দোকানিদের কোলাহলের ভেতর শোনা যেত না। কিন্তু বর্ষার ভিজে দুপুরগুলোয় চকবাজার ঝিমিয়ে এলে, কিংবা ঈদ-দীপাবলির মতো পার্বণের আগে রাত্রিবেলা অন্যান্য দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবার পর ফাঁকা জিপস্ট্যান্ডে ভেসে আসত একটা ধ্বনি: কখনো পাহাড়ি নালার মতো, ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল চুঁইয়ে আসা, কখনো আবার বৃষ্টি থেমে যাবার পর ঝিঁঝির কলতানের মতো। দার্জিলিঙের বিখ্যাত পাহাড়ি ঝিঁঝি, দীর্ঘ বর্ষার শেষে রোদ ওঠার আগের রাতে ডানার করাত ঘসে তারা ডাকে। পরদিন আকাশ জুড়ে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই দর্জির দোকানগুলোর খদ্দের শহরের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষেরা। বছরভর সস্তা ছিটকাপড়ের কোট আর কুর্তা-সালোয়ার সেলাই হয়, পুরোনো পোষাক মেরামত হয়, উৎসবের আগে তৈরি হয় বর্ণময় দাওরা-সুরাল আর চৌবন্দি-ফারিয়া। তখন এই মলিন ছায়াচ্ছন্ন গুমটিগুলো ঝলমল করে— ঠিক যেন ঘিঞ্জি দার্জিলিঙের আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

নিমা তাশির দোকানে কিন্টুপের কাহিনি আবিষ্কার করার পর থেকেই দর্জিপাড়াটা আমায় টানত। কারণে-অকারণে মাঝেমধ্যে ওই গলি দিয়ে যাওয়া-আসা করতাম আমি। গোলঘরের নীচে ফুটপাথে জরি-বসানো জুতো আর খেলনার পসরা সাজিয়ে বসতো একদল বয়স্ক ভুটিয়া রমণী, তার পেছনে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই সেলাইয়ের গুমটিগুলো। আদ্যিকালের মরচে-ধরা সিঙ্গার মেশিনে বসে ওস্তাদ, কানে পেনসিল, গলায় ফিতে ; এককোণে আবছায়ায় রঙবেরঙের কাটা কাপড়ের স্তূপের মাঝে বসে বুড়ো শাগরেদ ঝুঁকে পড়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে ছুঁচে ফোঁড় তুলছে।

এখানে কিন্টুপ নামে বহুকাল আগের এক দর্জির কথা শুনেছে কি কেউ ?

সত্যজিৎ রায়ের *কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবিতে অভিনয় করেছিল এক পাহাড়ি বালক, ১৯৬২ সালে। তার নাম ছিল গুঁইয়ে। নয়ের দশকে দার্জিলিঙে গিয়ে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলাম আমি। দেখাও মিলেছিল টুংসুং বস্তিতে, হুবহু সেই ছবির বালক, নামও গুঁইয়ে, তিরিশ বছর পরেও অবিকল একইরকম দেখতে ছিল। দর্জিগলিতে কিন্টুপের

BanglaBook.org

খোঁজ করলে হয়তো গুমটির ভেতর শতাব্দীপ্রাচীন আবছায়া দুহাতে সরিয়ে বেরিয়ে আসত এক বৃদ্ধ, ন্যুব্জ দেহ, মুখে পাখির বাসার মতো জমাট বলিরেখা, পুরু চশমা নাকের ওপর ঠেলে ঘোলাটে বিস্ফারিত চোখে চাইত আমার দিকে।

সেই ঝুঁকি নিইনি আর, কিন্তু আমার সঙ্গও ছাড়েনি সে।

দর্জিগলি থেকে বাঁদিকে পাকদণ্ডী ধরে উঠে গেলে ম্যল, ডান দিকে কিছুটা এগিয়ে মহাকাল মার্কেট। দুপুরের পর নিমা তাশির দোকানে জটলা করে একদল কিশোর ; মুখে গোঁফদাড়ির আভাস, পরনে স্কুল ইউনিফর্ম। ডেবোনেয়ার আর প্লে গার্ল পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা হাতড়ে নিষিদ্ধ সুখের রসদ সংগ্রহ করে ওরা। আমি হোটেল ঝাঁটানো পোপারব্যাকের স্তূপ দেখি ; দোমড়ানো, প্রচ্ছদ ছেঁড়া, বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায়। তার ভেতর থেকেই একদিন পেয়ে গেলাম জেমস হিল্টনের উপন্যাস *দ্য লস্ট হরাইজ়ন*।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হিল্টনের *দ্য লস্ট হরাইজ়ন* এককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনেমাও হয় একাধিক বার। এই উপন্যাসে প্রথম শাংগ্রিলা নামে এক আশ্চর্য গুপ্ত উপত্যকার বর্ণনা পাওয়া যায়। আফগানিস্তান থেকে ছয় ইউরোপীয়কে নিয়ে একটি ছিনতাই-হওয়া বিমান ভেঙে পড়ছে তিব্বতের বরফাচ্ছাদিত প্রান্তরে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে এক মঠের সন্ন্যাসী নিয়ে আসছেন শাংগ্রিলায়: চারদিকে খাড়া পাহাড় আর হিমবাহের মাঝে দুর্গম গিরিখাতের আড়ালে এক চিরবসন্তের উপত্যকা, যেখানে জীবন বয়ে চলে এক অপরূপ মন্থর ছন্দে। উর্বর সবুজ উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলে নদী, আর পাহাড়ের খাঁজে পদ্মপাপড়ির মতো একটি মঠ। বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, গোপন, অথচ আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণ রয়েছে এখানে ; এমনকি মানুষের আয়ুও এখানে প্রলম্বিত।

দ্রুতগতি নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা আর বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার মাঝে এই ইউটোপিয়া গোটা একটা প্রজন্মকে আচ্ছন্ন করেছিল। ক্রমশ শাংগ্রিলা হয়ে ওঠে অপার প্রাচ্য রহস্যের প্রতীক ; উপন্যাসের কাল্পনিক উপত্যকার নামটি হয়ে ওঠে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্পা, পারফিউম, হুইস্কি থেকে শুরু করে যৌনতাবর্দ্ধক ওষুধ, শাংগ্রিলা নামটা এতই জনপ্রিয় হয় যে চিনে বিশ্বপর্যটনের বাজার খুলে যাবার পর একটি অঞ্চলের নাম বদলে সরকারিভাবে রাখা হয় শাংগ্রিলা।

নিমা তাশির গুমটি থেকে নেহরু রোড ধরে চৌরাস্তার দিকে উঠে গেলে ট্রাফিকচৌকি, তারপর বাঁদিকে কেভেন্টার্স, দাস স্টুডিয়ো, গ্লেনারিজ পর পর রেখে আরও কয়েক পা ওঠার পর ডানদিকে সবুজ টিনের চাল, সাদা রঙের ছিমছাম ব্রিটিশ আমলের একটি কটেজ। তার নাম শাংগ্রিলা, হোটেল অ্যান্ড বার-কাম-রেস্টুরেন্ট। নিরালা দুপুরবেলায় তার দরজায় নোটিশ ঝোলে: Happy Hour— upto 4 pm. পানীয়ের ওপর বিশেষ ছাড় চলে এইসময়। দরজা ঠেলে ঢুকলে পালিশ করা কাঠের মেঝে আর কাচের বে-উইন্ডোয় আলোকিত প্রশস্ত কক্ষে এদিক ওদিক টেবিলে ছড়িয়ে বসে আছে একটি-দুটি প্রাণী। উষ্ণ আখরোট আর উস্টারশায়ার সসের গন্ধ, মৃদু এরিক

BanglaBook.org

ক্ল্যাপটন বাজছে, বার কাউন্টারে কনুই ভাঁজ করে চিবুক রেখে ঝিমোচ্ছে ওয়েটার। রাস্তার দিকে ফাঁকা টেবিলে বসে হ্যাপি আওয়ার ফুরিয়ে যাবার আগেই দ্রুত দুটি পাটিয়ালা পেগ গলাধঃকরণ করলে, তারপর গালে হাত রেখে শার্সির বাইরে চুপচাপ চেয়ে থাকলে, দেখা যাবে হতশ্রী চালে-চালে ঠাসা শহরটার মাথায় নেশার মতো ছেয়ে আসছে বিষণ্ণ কুয়াশা। দু-হাত দূরের টেবিলে এক নর্ডিক ব্যাকপ্যাকার জুটি ডায়েট কোকে চুমক দিতে দিতে মোটা গাইডবই খুলে দ্রুত অন্তরঙ্গ স্বরে কীসব পরামর্শ করে। ভাষা বোঝা যায় না, কিন্তু মেয়েটির উন্মুক্ত ত্বক জানায় ওরা এ তল্লাটে এসেছে অনেক দিন হল। ওদিকে দেয়াল ঘেঁষে স্থাণুবৎ এগজিকিউটিভ, গলায় টাইয়ের ফাঁস আলগা, সামনে বিয়ারের মগে ফেনা মরে আসছে।

তখন দার্জিলিঙে আমার জীবন অস্বচ্ছ আকারহীন, দিনের পিঠে দিন গড়ায় বিস্মৃতির খাতে। ভেতরে কোথাও আঁচড় কাটে এক তীক্ষ্ণ অবসাদ, যা বিভিন্ন সময়ে এই শহরে, বিশেষত একটানা বর্ষার ঋতুতে, অনুভব করেছে অনেকেই। তার করুণ পরিণতিও হয়েছে। ততদিনে অচেনা শৈলশহরে নতুন চাকরি করতে আসার উত্তেজনা ফিকে হয়ে এসেছে। প্রথম গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের আগুন নেভার পর কলেজ খুলেছে বছর দুয়েক আগে, কিন্তু পঠনপাঠন থেকে তখনও মুখ ফিরিয়ে আছে শহরের ছাত্রসমাজ। দিনের যেকোনো সময়ে একবার কর্মস্থলে গিয়ে মুখটা দেখিয়ে এলেই হয়। না গেলেও ক্ষতি নেই, কাকেই বা দেখাব? অনেকেই সপ্তাহান্তে ছুটির সঙ্গে আরও দুটো দিন যোগ করে কলকাতায় চলে যান। কিন্তু আমার কোথাও যাবার নেই। এখানে আসার আগে মাথার ভেতরে যে দার্জিলিঙের ছবি নিয়ে এসেছিলাম, সেটি খুঁজে পাইনি। চাকরিটা পাবার আগে ফেলোশিপ নিয়ে একটা গবেষণা শুরু করেছিলাম, তার দিশা হারিয়ে ফেলেছি। সারাক্ষণ বিবর্ণ কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াই মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, গন্তব্যহীন, ব্যাকম্যল থেকে চকবাজারে, সর্তীর্থদের মেসে তাসের আড্ডা থেকে স্টার মুভিজে গভীর রাতের সিনেমায়, উনিশ শতকের এক গুপ্তচর দর্জির কাহিনি থেকে শাংগ্রিলার হ্যাপি আওয়ারে।

তিব্বতের এক প্রত্যন্ত গ্রামে দাসত্ব থেকে পালিয়ে কিন্টুপ যে পেমাকো উপত্যকায় এসেছিল, সেখান থেকেই কি শাংগ্রিলার কল্পনাটা এসেছে? সেখানেও গিরিবর্ত্মের আড়ালে চিরসবুজ উপত্যকায় বয়ে চলে এক নদী, নাম তার সাংপো, উঁচু পাহাড়ে ফুলের মতো ফুটে আছে পেমাকোচুং মঠ। এক বছরেরও বেশি সময় সেই মঠে কাটিয়েছিল কিন্টুপ। ওখান থেকেই সাংপো গিরিখাতের দুর্গমতম অংশে প্রবেশ করে সে।

শাংগ্রিলা বারের দেয়ালে একটি অদ্ভুত লাস্ট সাপারের প্রিন্ট ছিল। দা ভিঞ্চির সেই বিখ্যাত ছবির নকল, কিন্তু খুঁটিয়ে নজর করলে দেখা যায় যিশু ও তাঁর অনুগামীদের জায়গায় হুবহু একই ভঙ্গিতে বসে আছেন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যরা, টেবিলে সাজানো খাদ্য পানীয়।

যিশুর মতো বুদ্ধের জীবনেও কি কোনো অন্তিম ভোজনের ঘটনা ছিল? এই বিষয়ে

BanglaBook.org

জানতে গিয়েছিলাম লোবসাং নোরবুর কাছে। তিব্বতি ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক নোরবু গভর্মেন্ট কলেজের লাগোয়া কোয়ার্টারে থাকতেন। প্রতিদিন দুপুরের পর ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসতেন কলেজে, পরনে থ্রি-পিস স্যুট, মাথায় ফেল্টের হ্যাট, হাতে লম্বা ছাতা। কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলতেন না, টিচার্স কাউন্সিলের মিটিঙেও আসতেন না। সারাক্ষণ এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি ফুটে থাকত তাঁর মুখে, হাঁটাচলায় এক মন্থর ভঙ্গি, যা ঠিক বার্ধক্যজনিত নয়। শোনা যেত, উনি তিব্বতের কোনো এক অভিজাত বংশের সন্তান; ভারতে পালিয়ে আসার সময় প্রচুর সোনাদানা নিয়ে আসে ওঁর পরিবার। আবার কেউ কেউ বলত, নোরবু বড় হয়েছেন নয়াবস্তির রিফিউজি সেন্টারে। লোসার পরবের মিছিলে পুরোভাগে দেখা যেত তাঁকে, পরনে মেরুণ-কমলা গাউনের মতো ধর্মীয় পোশাক।

তিব্বতি ভাষাসাহিত্য বিভাগের খুপরিটি ছিল তিনতলায় আমাদের বিভাগে যাবার করিডোরের শেষ প্রান্তে। যাওয়া আসার পথে দেখা হলে স্মিত হেসে মাথা ঝোঁকাতেন, কখনো রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সুপ্রভাত জানালে বলতেন— ইয়েস, আ ভেরি গুড মর্নিং! ওঁর ওপরের পাটিতে সোনা-বাঁধানো একট দাঁত চিকচিক করে উঠত। সেদিন আমার প্রশ্ন শুনে ডেকে নিয়ে গেলেন ওঁর বিভাগের ঘরে।

—হ্যাঁ, যিশুর মতো বুদ্ধের জীবনেও অন্তিম ভোজনের একটা ব্যাপার ছিল। তবে সেটা ঠিক লাস্ট সাপারের মতো নয়। তখন প্রভুর বয়স আশি হয়েছে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল পরিব্রাজন করে দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে। নশ্বর দেহ ছেড়ে পরিনির্বাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অন্তিম দিনে কুশীনগরের কাছে চণ্ডু নামে এক কামারের হাতে জীবনের শেষ আহার করেছিলেন বুদ্ধ, শুকরমাদ্দব নামে একটি রান্না করা পদ। এই শুকরমাদ্দব ঠিক কী ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলে বুনো শুয়োরের মাংস, আবার কেউ বলে ছত্রাক। বুদ্ধ কিন্তু নিরমিষাশী ছিলেন না। সে যাইহোক, যিশুর মতো শিষ্যদের সঙ্গে ভাগ করেও খাননি তিনি, উলটে খাবার পর চণ্ডুকে নির্দেশ দেন উচ্ছিষ্ট শুকরমাদ্দব মাটিতে পুঁতে দিতে। এর পরে পথে নদীর ধারে একটি শালের বনে এসে তাঁর অন্ত্রাশয়ে প্রবল বেদনা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্বাণ ঘটে। তবে খাবারে বিষক্রিয়ায় প্রভুর মৃত্যু হয়েছিল এমন নয়।

এরপর একদিন নিমা তাশির দোকানে পাওয়া আধপোড়া কিন্টুপের সেই রিপোর্ট পলিপ্যাকে মুড়ে নিয়ে হাজির হলাম প্রফেসর নোরবুর ঘরে। মোড়ক খুলে বের করতে সেটির দশা দেখে আঁতকে উঠলেন প্রথমে, তারপর চশমা চোখে এঁটে সাবধানে পাতা উল্টে খুঁটিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্টুপের নাম শোনেননি নোরবু, এমন কোনো গোপন অভিযানের কথাও পড়েননি কোথাও। তবে প্রথম পাতায় লামা উগেন গ্যাৎসোর নাম ছিল। কিন্টুপের জবানবন্দী শুনে তিব্বতী ভাষায় অনুলিখন করেছিলেন সেই লামা। এরপর সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। এই উগেন গ্যাৎসো দার্জিলিঙে তিব্বতীচর্চার ক্ষেত্রে একটি পরিচিত নাম।

BanglaBook.org

—দার্জিলিঙে নগরপত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার চালু করে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল, নোরবু বললেন। এই স্কুলের শিক্ষক করে আনা হয়েছিল সিকিমের মঠের লামা উগেন গ্যাৎসোকে। হেডমাস্টার হয়ে আসেন কলকাতার শরৎচন্দ্র দাস। তুমি চন্দ্র দাসের কথা জান নিশ্চয়ই?*

আমি মাথা নাড়ি। জানি না।

বিষণ্ণ হেসে প্রফেসর নোরবু চেয়ারের পেছনে আলমারি খুলে একটি মোটা বই এনে আমার সামনে রাখেন। *টিবেটান-ইংলিশ ডিকশনারি, উইথ স্যান্সক্রিট সিননিমস*—প্রণেতা শরৎ চন্দ্র দাস।

—হি ওয়াজ আ পাইঅনীয়ার। বইটি প্রথম বের হয় ১৯০২ সালে। আজ পর্যন্ত এর তুলনীয় কাজ কেউ করে উঠতে পারেনি। তোমরা বাঙালিরা হয়তো ওঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি দাওনি, কিন্তু এ-দেশে বসে তিব্বতি ভাষাসংস্কৃতির চর্চা এই মানুষটিকে বাদ দিয়ে করা সম্ভবই নয়।

চেয়ারে বসে চশমাটা খুলে খাপে ভরতে ভরতে বলেন:

—কিন্টুপের কথা আমি শুনিনি, তবে উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ সরকার একাধিক গুপ্তচর পাঠিয়েছিল তিব্বতে। তাদের অনেকেই ছিল দার্জিলিঙের। এখানে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল গড়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ের ছেলেদের ইংরেজি আর ইউরোপীয় বিজ্ঞান শেখানো। সেজন্যই শরৎ দাসকে হেডমাস্টার করে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়। তবে এটাই কিন্তু শরৎবাবুর একমাত্র পরিচয় নয়।

সেদিন এর বেশি আর কিছু বলেননি লোবসাং নোরবু। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। কয়েকদিন পরে এক বিকেলে ম্যালে অক্সফোর্ড বুকশপে অলস চরে বেড়াতে বেড়াতে আমার চোখে পড়ল একটি বই: *জার্নি টু লাসা অ্যান্ড সেন্ট্রাল টিবেট*, লেখক শরৎ চন্দ্র দাস। ১৮৮১ সালে হিমালয়ের ওপারে নিষিদ্ধভূমিতে গোপন যাত্রার দিনলিপি। এখানেও লামা উগেন গ্যাৎসোর কথা রয়েছে। দোকানে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টে বইটি পড়তে শুরু করে আর ছাড়তে পারিনি। কিনে নিয়ে সটান চলে গিয়েছিলাম প্রফেসার নোরবুর কোয়ার্টারে।

কাঠের তৈরি পুরোনো বাংলো টাইপ কোয়ার্টার, পরে ওগুলি ভেঙে কংক্রিটের বহুতল হয়। তখন সন্ধ্যা নামছে। দরজা খুললেন নোরবু স্বয়ং, পরনে কর্ডের ড্রেসিং গাউন। আমায় দেখে চকিত বিস্ময় সামলে সাদরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। তখনই কোয়ার্টারগুলোর জীর্ণ দশা ; দেয়ালের কাঠ বেঁকে এসেছে, সিলিঙে বর্ষার জল চোঁয়ানো শ্যাওলার ছোপ। তবু তার মধ্যেই পরিপাটি সাজানো বসার ঘরে মেঝেয় সোফাসেটে তিব্বতি কার্পেট, দরজা-জানলায় উজ্জ্বল কাপড়ের পেলমেট, বুকশেলফ, দেয়ালে

---

* রায়বাহাদুর শরৎ চন্দ্র দাসকে অধ্যাপক নোরবু কখনও বলতেন চন্দ্র দাস, কখনও অন্তরঙ্গতার স্বরে শরৎবাবু। ইংরেজি বইগুলিতে সেকালের প্রথা অনুসারে আদ্য ও মধ্য নাম বিচ্ছিন্ন করে ছাপা হত। জাপানি পরিব্রাজক একাই কাওয়াগুচি, যিনি দার্জিলিঙে শরৎ দাসের গৃহে অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর বইতে গৃহকর্তাকে উল্লেখ করেছেন রায় শরৎ নামে।

অ্যালকোভে জেড পাথরের বুদ্ধমূর্তি, দলাই লামার ছবি আর ফ্রি টিবেট পোস্টারে রেশমি খাদা। ফায়ারপ্লেসে আঙিঠি জ্বলছিল। সোফায় বসে আমি সদ্য কেনা বইটি এগিয়ে দিতে সেটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে হেসে ওঠেন নোরবু, সোনার দাঁতটি চিকচিক করে ওঠে আঙিঠির আভায়।

—ইটস বিন আ লং টাইম সিন্স আই হ্যাভ ফাউন্ড আ বেঙ্গলি ফ্রম ক্যালকাটা শোয়িং ইন্টারেস্ট ইন শরৎবাবু।

জানা গেল, বইটি শরৎ দাসের দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। এর বছরখানেক আগেও একবার যান তিনি, সেবারেও সঙ্গী ছিলেন উগেন। ব্রিটিশ গুপ্তচর হয়ে লামার ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, তবে সে দেশে গিয়ে পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন।

বইয়ের তাক থেকে নোরবু পেড়ে আনেন একই বইয়ের বহু পুরোনো একটি সংস্করণ, বেশ মোটা আর সবুজ চামড়ায় বাঁধানো, বিলেতে রয়্যাল জিওগ্রাফিক প্রেসে ছাপা। ভেতরে অনেকগুলো হাফটোন স্কেচ আর ফোটোগ্রাফ ; আমার কেনা পেপারব্যাকটিতে কোনো ছবি ছিল না। মলাট খুলে প্রথমেই চোখ আটকে যায় একটি ছবিতে। অতিকায় চমরির পিঠে চেপে বরফে ঢাকা গিরিপথ দিয়ে এক যুবক চলেছে লামার বেশে।

—বইটা পড়ো, এক আশ্চর্য যাত্রার বিবরণ পাবে। গুপ্তচর হিসেবে গিয়েছিলেন, তার একটা দায়বদ্ধতা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে তিব্বত সম্পর্কে, সেখানকার প্রকৃতি মানুষ ধর্ম আচারঅনুষ্ঠান সম্পর্কে এক গভীর আগ্রহ আর শ্রদ্ধাবোধ।

আমি পাতা উলটে ছবিগুলো দেখি: লেপচা সৈনিক, তার মাথায় সরু লম্বা বেণী আর টুপিতে ময়ূরপুচ্ছ ; মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিতে চলেছে টোপরের মতো শিরস্ত্রাণ পরা একদল মানুষ, তাদের কারোর কারোর হাতে এক অদ্ভুত তারের বাদ্যযন্ত্র ; গয়নার ভারে জড়োসড়ো রাজকন্যা অপলক চেয়ে আছে ক্যামেরার দিকে ; গহীন গিরিখাত দিয়ে বয়ে চলা নদীর ওপর ঝুলন্ত বেতের সেতু ; বনের ধারে চিত্রিত শামিয়ানার নীচে অভিজাতদের সাড়ম্বর চা-পান উৎসব ; কিম্ভূত মুখোশ পরে লামাদের ধর্মীয় নৃত্য ; পোটালা প্রাসাদ ; জমে বরফ হয়ে যাওয়া জলপ্রপাত...

এক ছিপছিপে তরুণী, পরনে সনাতন তিব্বতি চুবা, নিঃশব্দ বিড়ালির পায়ে হেঁটে এসে ঢাকা কাপে চা আর কুকির প্লেট রাখে। ওর পেছন পেছন আসে একটি সাদাকালো পশমের গোলার মতো কুকুর। প্রফেসর নোরবুর কোলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে টুকটুকে লাল জিভ বের করে আগন্তুককে দেখে।

নোরবু আলাপ করিয়ে দেন। ওঁর মেয়ে, দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. পড়ছে, ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

—এই ফোটোগ্রাফগুলো কি সেই সময়ে তোলা? জিজ্ঞেস করি আমি।

মেয়েটি গ্রীবা উঁচিয়ে আলগা কৌতূহলে ছবি দেখে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু নোরবু উত্তর দেবার আগেই চলে যায় নিঃশব্দে।

—শরৎবাবুর নিজেরই তোলা। সেকালের প্লেটগ্লাস ক্যামেরা আর ডেভেলপিং-এর সব সরঞ্জাম খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও নিয়ে গিয়েছিলেন দূরবীন, টেলিগ্রাফ যন্ত্রের নকশা, বিজ্ঞানের বই, গুটি বসন্তের টিকা। তখনও তিব্বতে এই রোগের কোনো প্রতিষেধক ছিল না, অনেক লোক মারা যেত প্রতি বছর। আর হ্যাঁ, আস্ত একটা লিথোগ্রাফিক প্রেস।

—তখনকার এইসব আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি পাঠানোর মধ্যে দিয়ে কি ব্রিটিশ সরকারের কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

আমার প্রশ্ন শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে মাথা নাড়েন নোরবু। কুকুরটি চমকে উঠে লেজ ঘোরাতে থাকে।

—প্রযুক্তির নিরিখে দেখতে গেলে তিব্বত তখনও মধ্যযুগে পড়েছিল ঠিকই, তবে ব্রিটিশ সরকারের তেমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কোনোকালেই ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশটার ভূপ্রকৃতি আর ব্যবসার অন্ধিসন্ধি জানা। ক্যামেরা দূরবীন প্রেস ইত্যাদি চন্দ্র দাসের মারফৎ কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিলেন লামা সেংচেন দোরজেচেন, পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রী। খুবই প্রতিপত্তিশালী আর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি। শরৎবাবু প্রথমবার তিব্বতে যাবার সময় দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ওঁর কাছে ধর্মশাস্ত্রের পাঠ নিতেন শরৎ, বিনিময়ে শেখাতেন ইংরেজি, পাটিগণিত, এছাড়া ক্যামেরা টেলিগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহারবিধি। ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চায় এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন লামা সেংচেন যে ক্যামেরার প্রযুক্তি নিয়ে তিব্বতি ভাষায় বই লিখতে শুরু করেন। আশ্চর্য ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন তিনি, ভারতবর্ষ থেকে আসা এক তরুণ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে তাঁর এই বন্ধুত্বটাও ভারি অদ্ভুত। তবে এর একটা মর্মান্তিক পরিণতি আছে। সেটা এখন বলব না, বললে এই বই পড়ার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এই বলে চুপ করে যান প্রফেসার নোরবু, কুকুরটার মাথায় আনমনে হাত বুলোতে থাকেন। ওঁর মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে। বাংলোর টিনের চালে ছিপছিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়।

—ভাগ্যচক্রের গায়ে সবকিছু লেখা হয়ে থাকে। সেই লেখাটি যদি অন্যরকম হতো, সেংচেনের মারফৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চা যদি তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ত সেইসময়, তাহলে আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাসটাই হয়তো অন্যরকম হতো।

মনে হয় যেন অনেক দূরে শব্দগুলো উচ্চারণ করেন তিনি। পরক্ষণেই ফিরে আসেন, স্মিত হেসে বলেন:

—সে যাক! তাহলে হয়তো আজ আমরা এইভাবে এখানে মুখোমুখি বসেও থাকতাম না। তবে যাই ঘটুক না কেন, দার্জিলিঙে পুরোনো প্রজন্মের তিব্বতিরা শরৎচন্দ্র দাসকে আপনজন বলেই মনে করে। তার একটা কারণও আছে। শরৎবাবু তাঁর জীবনের

BanglaBook.org

মূল্যবান কাজগুলো করেছিলেন এই দার্জিলিঙের লাগোয়া একটি গ্রামে, লাসা ভিলায় থেকে।

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস, কলকাতা থেকে দার্জিলিং চলেছে পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবক। তখন দার্জিলিং বলতে ঘন অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের মাথার ওপর কয়েকটি কাঠের কটেজ আর নীচের দিকে কাঁচা সরু পথের শেষে ছোট্ট একটি বাজার। গ্রীষ্মের শুরুতে লটবহর লোকলস্কর নিয়ে কলকাতা থেকে সেখানে পালিয়ে যাবার সাহেবি হিড়িক তখনও শুরু হয়নি সেভাবে। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে চলা ছোট্ট খেলনা রেলপথও হয়নি। যুবকটি শিলিগুড়ি থেকে পাল্কিযোগে সকালবেলায় যাত্রা শুরু করে পাঙ্খাবাড়ি এসে পৌঁছল বিকেল নাগাদ। তরাইয়ের ঘন মহীরুহে ছাওয়া ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম পাঙ্খাবাড়ি, এখান থেকেই শুরু হচ্ছে হিমালয়। ডাকবাংলোটা শ-দুয়েক ফুট উঁচুতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে চৌকিদারকে গ্রামে পাঠিয়ে দরদাম করে একটি ঘোড়া ও দুজন মেচ কুলি ভাড়া করল সেই যুবক। পরদিন সকালে চড়াই বেয়ে শুরু হল ৩২ মাইল দূরে দার্জিলিঙের পথে যাত্রা। দু দিনের পথ, মাঝে কার্শিয়াং আর সোনাদা নামে দুটি স্থানে ডাকবাংলোয় রাতের বিশ্রাম।

এর আগে কখনো পাহাড় দেখেনি সে। চট্টগ্রামের ছেলে, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে।* কলেজে থাকাকালীনই মেধাবী অধ্যবসায়ী ছাত্রটি সাহেব শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি খোদ ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন অ্যালফ্রেড ক্রফটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে। তখন বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। কলকাতায় পড়তে এসে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় ছেলেটি, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়ে। এই রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার হয়নি তখনও, সমতলের ভ্যাপসা জোলো বাতাসকেই দায়ী করা হতো। একদিন ওকে ডেকে পাঠিয়ে সদুপদেশ দিলেন ক্রফট সাহেব:

—দার্জিলিঙে যাও। হিমালয়ের পাহাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর নতুন স্বাস্থ্যনিবাস গড়েছে ক্যাম্পবেল। ভারি মনোরম আবহাওয়া, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। ওখানে গিয়ে থাকলে তোমার স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে। মনে রেখো, স্বাস্থ্যই সম্পদ। ইয়াংম্যান, তোমার সামনে পড়ে আছে সম্ভাবনাময় আস্ত একটা জীবন, আর সেটা অপেক্ষা করছে দার্জিলিঙেই।

দার্জিলিঙে তখন সদ্য খোলা হয়েছে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল, মূলত অ্যালফ্রেড ক্রফটের উদ্যোগে। সেই স্কুলের হেডমাস্টার করে পাঠানো হল তাকে।

চাকরির নিয়োগপত্র পকেটে নিয়ে সেই যুবক যখন দার্জিলিঙে চলেছে, ঠিক সেইসময়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সিল আঁটা একটি গোপন চিঠি চলেছে সিমলায় ভাইসরয়ের কাছে। কিছুকাল ধরে তিব্বতে গুপ্তচর পাঠানো শুরু হয়েছে

* তখনো বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আলাদা হয়ে শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়নি।

BanglaBook.org

তখন। তারা সকলেই উত্তর ভারতের পাহাড়ি জনজাতির মানুষ। এদের পরিব্রাজক কিংবা বণিক সাজিয়ে পাঠালে ধরা পড়ার ঝুঁকি কম, দুর্গম পার্বত্য পথে যাত্রার ধকল সইতেও ওরা সক্ষম। কিন্তু সমস্যা হল এরা কেউই তেমন শিক্ষিত নয় ; দুর্গম অচেনা দেশের ভূপ্রাকৃতিক তথ্য আর বিভিন্ন ধরনের সংবাদ আহরণের জন্য যে বিদ্যাবুদ্ধি থাকা দরকার তার অভাব রয়েছে। বিশেষত জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনের কাজে দক্ষ, ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয় প্রজন্মের খুবই প্রয়োজন। তেমনই একজনকে পাঠানো হচ্ছে দার্জিলিঙে, ক্রফট লিখছেন মহামান্য ভাইসরয়কে।

যুবকটি অবশ্য এসবের বিন্দুবিসর্গ জানত না। কলকাতা থেকে এত দূরে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় কর্মজীবন শুরু করতে চলেছে সে, মনে ছেয়ে আছে এক অস্পষ্ট উত্তেজনা। সনাতন বৈদ্য পরিবারের ছেলে, কলকাতার কলেজে পড়তে আসার সময় সমাজের রীতি মেনে একটি বিবাহ করেছে। স্ত্রী দেশের বাড়িতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ি, সুদীর্ঘ যাত্রাপথে মনের কোণে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল বটে ঘোমটায় ঢাকা একটি সলজ্জ মুখ, নাকে নথ আর চোখে অশ্রুবিন্দু চকচক করছে। কিন্তু পাঙ্খাবাড়িতে ঘোড়ার পিঠে ওঠার পর থেকে পথের অদৃশ্যপূর্ব নাটকীয়তায় সেই স্মৃতিছবি ফিকে হয়ে গেল। লাটিমে পাকানো লেত্তির মতো পথ যত চড়াই বেয়ে ওঠে, ততই দৃশ্যপটে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণি পরপর ঢেউয়ের মতো খুলে যেতে থাকে। চারিদিক থেকে ঘিরে আসে গভীর আদিম বন। সুবিশাল বনস্পতি শত শত বছর ধরে আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের শাখা থেকে ঝোলে বন্যলতার দড়িদড়া, খিদিরপুরে জাহাজঘাটায় পালতোলা মাস্তুলের গায়ে যেমন দেখা যায়। একসময় পিছনের ধূমায়িত সমতলভূমি, বালাসোন নদীর বালুখাত হারিয়ে যায় মোটা বাঁশের ঝাড় আর অতিকায় ফার্নের আড়ালে। অসংখ্য পাখির কুজনে মুখরিত ক্রান্তীয় অরণ্য ছেড়ে সে ঢুকে পড়তে থাকে ওক বার্চ আর কুয়াশার দেশে, যেখানে এক আদিম নৈঃশব্দ্য ক্বচিৎ বিচলিত হয় ঝিঁঝি আর ঝর্ণার তানে। কখনো হঠাৎ অজানা জন্তুর ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে যায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। পথে দেখা মেলে কুলির দলের: পিঠে ভারি মোট নিয়ে ধীর গতিতে চলেছে দার্জিলিঙের পথে— পায়ে জড়ানো চামড়ার ফালি, জংলি পোকার কামড়ে ঘা থেকে রক্ত ঝরছে। কার্শিয়াং পার হয়ে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল সে, উত্তর আকাশের গায়ে স্থির ভেসে আছে স্ফটিকের ঢেউ, সোনাদার কাছে হোপ টাউনে শুনতে পেল গীর্জার ঘণ্টা, ঘুম নামে কয়েকঘর লেপচা গ্রাম ছাড়িয়ে বাতাসিয়ায় এসে পৌঁছতে দূর পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো সাদা কাঠের কটেজ, যেন কালচে সবুজ অরণ্যে এক ঝাঁক পায়রা বসেছে। দার্জিলিং !

দার্জিলিঙে তখন ডেপুটি কমিশনার মিস্টার জন এডগার, আইসিএস। শহরে পৌঁছে সোজা কমিশনারের বাংলোয় গিয়ে এডগার সাহেবের কাছে রিপোর্ট করল বাবু শরৎচন্দ্র দাস। থাকার ব্যবস্থা হল মাউন্ট প্লেজেন্ট রোডে অ্যালিস ভিলা নামে একটি বোর্ডিং হাউসে। পরদিন কাজে যোগ দিল সে।

BanglaBook.org

চার

লাসা ভিলা

বেড়াতে আসার কথা আলাদা, কিন্তু দার্জিলিঙে কর্মসূত্রে একা থাকতে এসে কখনো অবসাদের শিকার হয়নি এমন সমতলের মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ভগ্নস্বাস্থ্য গোরা সৈন্যদের জন্য স্যানাটোরিয়াম হয়েছিল সেঞ্চলে, কিন্তু অবসাদজনিত অসুখ আর আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সেটি পরিত্যক্ত হয়। দার্জিলিঙে শহর গড়ে ওঠার পরেও সেই ট্র্যাডিশন চলেছে, হ্যাপি ভ্যালির ওপর পুরোনো গোরস্থানে নামগোত্রহীন কবরগুলো তার সাক্ষী। এমনকি বিশ-একুশ শতকেও দুপুরের নির্জন পানশালায় বিয়ারের মাগ হাতে একাকী এক্সিকিউটিভ, গলায় টাইয়ের ফাঁস আলগা, কিংবা জানলা-ঘেঁষে বসা এক কলেজ শিক্ষকের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এক বিচিত্র নিঃসঙ্গতা, যা এই পাহাড়ে অসংখ্য ঝোরার মতোই প্রাচীন, অন্তঃসলিলা।

ভারতবর্ষে এতগুলো হিলস্টেশন থাকতে বিশেষত দার্জিলিঙেই কেন এমন হয়? নাছোড় মেঘকুয়াশা, ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, দিনের পর দিন সূর্যের মুখ দেখতে না পাবার জন্যেই কি? নাকি অবচেতনে কাজ করে একটা আবছা বিচ্ছিন্নতার বোধ, যার পিছনে রয়েছে দার্জিলিঙের ভূ-সংস্থান? সমতল থেকে পর পর অনেকগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে এসে একটি লম্বাটে শৈলশিরার প্রান্তে ঝুলে আছে শহরটা — তিনদিকে গভীর উপত্যকা, তারপর অনেকটা দূরে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে পাহাড়শ্রেণি। পরিযায়ী টুরিস্টের চোখে যা দৃষ্টিনন্দন গ্যালারির মতো, সমতলের প্রবাসীর কাছে হয়তো তা হয়ে ওঠে খাদের কিনারা। এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে, এই অবসাদের সঙ্গে যুঝে উঠতে অন্তত দু-তিনটি বর্ষা লাগে। অনেকে তার আগেই সমতলে বদলি নিয়ে ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় নির্বাসনের স্মৃতি, কুয়াশা চুঁইয়ে আসা আলো, যে আলোয় কোনো ছায়া পড়ে না, আর শ্যাওলার টোকো গন্ধ।

লুই মন্ডেলি* থেকে শুরু করে অনেকের চিঠিপত্রে দিনলিপিতে এই দমচাপা মানসিক অবস্থার বর্ণনা আছে, যা আমি অনুভব করেছিলাম দার্জিলিঙে এসে, শরৎচন্দ্র দাস আসার একশো বছরেরও বেশি পরে। কনভেন্ট রোডে একা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি, শোবার ঘরের জানলা দিয়ে হ্যাপি ভ্যালির চা বাগান আর নীচে জেলখানা দেখা যায়। বয়স্ক

---

* ইটালিয় টি প্লান্টার ও পক্ষীবিদ, দার্জিলিঙে আত্মহত্যা করেন ১৮৮০ সালে।

BanglaBook.org

সহকর্মীরা অনেকেই পরিবার নিয়ে কোয়ার্টার থাকেন। আমার মতো যারা নির্দায়, তারা প্রায় সকলেই মেস করে থাকে কার্ট রোডের আশেপাশে। বাড়ি থেকে জীবনে প্রথম এত দূরে বিখ্যাত শহরে চাকরি করতে আসার মধ্যে যে মুক্তি ছিল, সেটা ক্রমশ ভারি বোঝার মতো বুকে চেপে বসছে তখন। দার্জিলিঙে আমার দ্বিতীয় বর্ষাকাল। সারাক্ষণ শহর ঢেকে আছে ঘন কুয়াশায়, তার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোয় দিনরাত একাকার হয়ে যায়। স্নায়ুতে বাজে বিরতিহীন ছিপ ছিপ ছিপ ছিপ বৃষ্টির শব্দ। রাতে ঘুম আসে না, বিছানায় জমে ওঠে নিমা তাশির দোকানের হাতবদল পেপারব্যাক, বিদেশি পত্রিকা। কাম্যুর *আউটসাইডার*-এর প্রচ্ছদে এক নিঃসঙ্গ কিউবিস্ট মুখ (জাক ভিল্যোঁর আঁকা), ঘাড় বাঁকানো, শূন্য ছায়াচ্ছন্ন কোটরে চেয়ে থাকে দড়ির দোলনায় রোদে সেঁকা প্লেবয় নগ্নিকার দিকে। বালিশের পাশে পাবলো নেরুদার *রেসিডেন্স অন আর্থ*— কবির প্রথম যৌবনে কলম্বোয় নিঃসঙ্গতার সমুদ্র থেকে তুলে আনা রঙিন মাছের ঝাঁক:

আই অ্যাম টায়ার্ড অব বিয়িং আ ম্যান
আই এন্টার টেলারশপস অ্যান্ড মুভিহাউসেস
উইদার্ড, ইমপেনিট্রেবল, লাইক আ ফেল্ট সোয়ান...
দ্য স্মেল অব বার্বারশপস মেকস মি উইপ...
আই অ্যাম টায়ার্ড অব মাই ফিট অ্যান্ড মাই নেইলস
অ্যান্ড মাই হেয়ার অ্যান্ড মাই শ্যাডো
আই অ্যাম টায়ার্ড অব বিয়িং আ ম্যান...

মাথার ভেতরে লাইনগুলো সাঁতার দেয়, বুড়বুড়ি কাটে, মস্তিষ্কের ভাঁজ থেকে বিষণ্ণ কামনার শ্যাওলা খুঁটে খায়।

আমার শোবার ঘরের একটি দেয়াল আদতে পাহাড়ের গা, বর্ষায় তার ওপর ঘামের মতো নোনতা জলবিন্দু ফুটে থাকে। মাঝরাতে বাথরুমে শুকনো জলের পাইপে শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ শোনা যায়। একদিন রাত করে বাসায় ফিরে দেখি অসাবধানে খুলে রাখা কলে কখন জল এসে চলে গিয়েছে, সারা ঘরে থৈ থৈ করছে জল, তার ওপর ভাসছে পোড়া সিগারেটের টুকরো, বিকেলের ডাকে আসা খবরের কাগজ। জল ভেঙে খাটে উঠে একসঙ্গে চারটে ভ্যালিয়াম খেয়ে শুয়ে পড়ি আমি, টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে ভিজে খবরের কাগজ শুকোয়। আঠালো ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে দেখি, ভিজে নিউজপ্রিন্ট থেকে বাষ্প উঠছে, পতঙ্গের রেখার মতো উঠে আসছে অক্ষরের সারি। ঘরের বদ্ধ বাতাসে ভাসছে কালো অক্ষরগুলো। ভিজে পাহাড়ের দেয়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ পাতার কুঁড়ি, ভাঁজ খুলে মেলে উঠছে, ঘরের ভেতর ছড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালা, মেঝে দিয়ে লতিয়ে চলেছে সাপের মতো, এঁটে ধরছে দরজার পাল্লা। মুখে হাত দিতে কোনো অনুভূতি নেই, *আউটসাইডার*-এর প্রচ্ছদে সেই পোর্ট্রেট মুখোশের মতো সেঁটে বসেছে আমার মুখের ওপর।

BanglaBook.org

ঘুম ভাঙতে সকাল না বিকেল ঠাহর করতে পারি না। মাথার ভেতরটা ফাঁপা, সাড়হীন। আমি কি মরে গিয়েছি? দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। বাজারের নীচের দিকে আলো জ্বলে উঠছে একটি দুটি করে, ওপরে রাজভবনের মাথায় দিনের আলোর রেশ রয়েছে তখনও। হরিদাস হাট্টা থেকে সুবেশ রোমিওরা শিস দিতে দিতে উঠে আসছে সান্ধ্য শহর জয় করতে। জামা জুতো গলিয়ে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন নীচের দিকে নেমে যেতে থাকি। মনে হয় যেন পালকের মতো ভেসে চলেছি, প্রেতের মতো। পাকদণ্ডি বেয়ে অনেকটা নেমে যাবার পর পীচ বাঁধানো রাস্তা ফুরিয়ে গিয়ে পায়ে-চলা মাটির পথ বেঁকে গিয়েছে হ্যাপি ভ্যালি চা বাগানের ভেতর। এদিকে চা গাছগুলোয় হাত পড়েনি বহুকাল, অযত্নে ঝোপ হয়ে গিয়েছে। তার ভেতর দিয়ে সরু চোরাবাটো বাগানের ঢালে নাকের মতো ঠেলে থাকা স্পারের ওপর খাদের মুখে এসে শেষ হয়েছে। সামনেই একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত চোর্তেন, তার গায়ে জড়িয়ে আছে অশ্বত্থের মোটা শিকড়বাকড়। হয়তো কোনোকালে এই জায়গাটা পবিত্রভূমি ছিল, চা বাগান হবার পর হারিয়ে গিয়েছে। কুকুর ডাকছে। নীচে কুলিবস্তিতে সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে, ওপরে অবজারভেটারি হিলের মাথায় মেঘ সরে গিয়ে সূর্যের শেষ আলো এসে পড়েছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। নীচে খাদ থেকে হাওয়া বইতে শুরু হয়, কুয়াশা পাক খেয়ে গুলিয়ে ওঠে। কুকুরের ডাক থেমে যায়, একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ নামে। হঠাৎ কুয়াশার ভেতর একটি আলোর সুড়ঙ্গ তৈরি হয়, একটি গোলাকৃতি রামধনু, তার ঠিক মাঝখানে খাদের ওপর শূন্যে ঠিক যেন হলোগ্রামের ছবির মতো একটি অতিকায় মনুষ্যছায়া, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ওই ছায়াটির নাম ব্রকেন স্পেক্টার, আমার নিজেরই ছায়া। খাড়া পাহাড়ের ধারে কুয়াশার গায়ে কোনো কোনো দুর্লভ মুহূর্তে সূর্যালোকে সৃষ্টি হওয়া বর্ণালির ভেতর দিয়ে এমন ছায়ার বিভ্রম সৃষ্টি হয়। পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে কুয়াশায় জলকণার ঘনত্ব, দর্শকের অবস্থান এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সূর্যের রশ্মির ওপর। জার্মানির ব্রকেন নামে চিরকুয়াশায় ঢাকা একটি পাহাড়ের চুড়ো থেকে এই ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় বলেই এমন নাম।

জীবনে কখনো কোনোরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করিনি আমি, কিন্তু সেদিন সেই প্রেতচ্ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটা অতীন্দ্রিয় শিহরণ বয়ে গিয়েছিল আমার ভেতর দিয়ে। বৈজ্ঞানিক কারণ জানার পরেও সেই অভিঘাত মন থেকে হারিয়ে যায়নি।

ঐ মায়াবী

৭ নভেম্বর ১৮৮১। রাত্রিবেলা দার্জিলিং থেকে যাত্রা শুরু করলাম যখন আকাশে চাঁদ ছিল— শরৎচন্দ্র দাস লিখছেন— কিন্তু কালো মেঘে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কাও ছিল।

BanglaBook.org

বারেবারেই দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পূর্ব নেপালের পাহাড়শ্রেণির দিকে, ওদিকে তুষারপাত হচ্ছে কী না দেখার জন্য।

একদিকে বরফের দেশে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে সব ধরনের প্রাকৃতিক বাধা জয় করার অদম্য আশা, এই দোলাচলের মধ্যেই বাসভূমিকে বিদায় জানিয়েছিল যুবক শরৎচন্দ্র। আর কখনো ফিরে আসতে পারবে কী না জানে না সে। এই অভিযানের জন্য ব্রিটিশ সরকার তার মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিনশো টাকা করেছিল; দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে স্ত্রীর জন্য ভাতা ধার্য হয়েছিল একশো টাকা। স্বাভাবিকভাবেই কাউকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানানোর নিয়ম ছিল না। যাবার আগে স্ত্রীকে সে কেবল লিখেছিল— তিব্বতের শিগাৎসে শহরে অত্যন্ত গোপন একটা সরকারি কাজে যাচ্ছি, দার্জিলিং থেকে দিন দুয়েকের পথ।

ঘোড়ার পিঠে চেপে নিঃশব্দে শহর ছেড়ে চলেছিল তারা। ভাগ্যক্রমে দার্জিলিংমুখী দুয়েকজন ভুটিয়া ছাড়া পথে আর কেউ দেখতে পায়নি। মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্যের ভেতর তাকভরের দিক থেকে ভেসে আসছিল কামিনদের গান, বাঁশি আর ঢোলকের শব্দ। রঙ্গিতের পাড়ে এসে দেখা মিলল উগেন গ্যাৎসোর। বড়ো বড়ো পাথরের খাত ধরে কুলকুল করে বয়ে চলেছে রঙ্গিত, আড়াআড়ি ফেলে রাখা চার-পাঁচটি বাঁশের ওপর দিয়ে কোনোক্রমে পার হয়ে রাত দেড়টার সময় দলটি এসে পৌঁছল গোক নামে একটি স্থানে। দল বলতে শরৎ, উগেন ও চাকর, পাচক আর কুলি মিলিয়ে মোট সাতজন।

একসময় কয়েকঘর দোকানপাট ছিল গোক-এ, পাহাড়ের ব্যাপারিরা এসে ভুট্টা আর এলাচ কিনে নিয়ে যেত দার্জিলিঙের বাজারে বিক্রির জন্য। এখন জনহীন হয়ে পড়েছে। একটিমাত্র ছোট্ট গোয়ালের ছাউনি টিকে আছে কেবল। আর ভেতরে প্রবল নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল এক নেপালি, অগত্যা বাইরে ঘাসের ওপর জাজিম বিছিয়ে দু-দণ্ড বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। কিন্তু এবড়োখেবড়ো জমি, জাজিম ফুঁড়ে ওঠা অগাছার কাঁটা আর পোকামাকড়ের জন্য সেটা আর হয়ে উঠল না। এরই মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। আপাদমস্তক ভিজে ভোর চারটে নাগাদ শুরু হল ফের হাঁটা। ফুটখানেক চওড়া পিচ্ছিল পথ, লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা, চারদিক আঁধার হয়ে আছে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে ভৃত্য ফুরচুঙের পেছন পেছন চলতে লাগল শরৎ। শটগানটা বাঁধা রইল ফুরচুঙের পিঠের বোঝায়। পিছল পথে বার কয়েক আছাড় খাবার পর রাম্মাম উপত্যকায় এসে পৌঁছল যখন, নীলাভ আলো ফুটছে আকাশে।

৮ নভেম্বর। রাম্মামের ওপর ন্যাড়া বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে ব্রিটিশ ভারতের সীমানা, তিব্বতি ছদ্মবেশ পরে নিল শরৎচন্দ্র। শীতের শীর্ণ নদী, বড়ো বড়ো পাথরের ফাঁকে জমা জলে বেতের শঙ্কু আকৃতির জাল দিয়ে মাছ ধরছে লিম্বু রমণীরা। নদীর পাড় ধরে টানা শালের জঙ্গল, মাঝে মাঝে তুলো আর এলাচের চাষ হয়েছে। ভালুক হনুমানের উপদ্রব ঠেকাতে রাতপাহারার উঁচু মাচা। পাহাড়ের ওপরের দিকে জঙ্গল সবজে বাদামি হয়ে আছে।

BanglaBook.org

সরু পাকদণ্ডি ধরে বড়ো বড়ো কমলালেবুর ঝাঁকা নিয়ে হেঁটে আসছে জনা কুড়ি লোক। দিনরাত হেঁটে দার্জিলিঙের বাজারে পৌঁছবে ভোরবেলায়। শরৎ ও উগেনের তিব্বতি পোশাক দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে নেমে দাঁড়ায় ওরা।

ফুরচুঙের নির্দেশ মতো পোশাক বদলে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে, লিখছেন শরৎ।

খেতের ভেতর দিয়ে পথ উঠে গিয়েছে চড়াই বেয়ে। সেই পথে পাহাড়ের দাঁড়ায় উঠে আসতে বিকেল হয়ে গেল। ঠিক ওপরে একটি চোর্তেন, পাথরে খোদাই ওম-মণি-পদ্মে-হুম মন্ত্রের ওপর বহুকালের শ্যাওলা জমে ঢেকে এসেছে। এর নামেই জায়গাটার নাম চোর্তেন গং। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে তাকালে বহুদূরে নদীর উজানে ধরমদিন উপত্যকা দেখা যায় ; দিনশেষের মেঘভাঙা আলোয় ফুটে রয়েছে ধাপ-কাটা খেতখামার ঘরবাড়ি। চোর্তেনের পিছনদিকে একটি ঝোরা তিরতির শব্দে নেমেছে কয়েকশো ফুট নীচে রাম্মামে।

—এখানেই তাঁবু খাটানো হোক, ফুরচুং বলে। কাল সকালে আমরা শিংলি পাহাড় ডিঙাবো।

নদীর পাড়ে লিম্বুদের গ্রাম থেকে টাটকা সবজি কিনে আনল ফুরচুং, আর পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে দু-বোতল মুরোভার মদ।

পরদিন সকাল থেকে চারদিক মেঘকুয়াশায় ঢাকা, দু-ফুট দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। শিংলি পাহাড়শ্রেণি পেরোতে জঙ্গল ক্রমশ নিবিড় হয়ে আসে। শুরু হয় বেতের বন, উঁচু উঁচু পাইনের গায়ে জড়ানো ফেস্টুনের আকারে অতিকায় সরু ফার্ন, সবুজ মরকতমণির মতো পাহাড়ের গা বেয়ে কলোচ্ছ্বাসে নামছে ঝর্ণা। পথ খাড়া উঠে গিয়েছে তারই পাশ দিয়ে ; ওক পাইন আর ম্যাগনোলিয়ার গগনবিসর্পী ডালপালায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে, আকাশ দেখা যায় না। ঘণ্টাখানেকের ওপর চড়াই ভেঙে রিশি চোর্তেন নামে একটি জায়গায় এসে পৌঁছয় দলটা। এখানেও জঙ্গলের মাঝে জনমানবহীন স্থানে একটি প্রাচীন সৌধ, পাথরে নির্মিত নীচু আর লম্বাটে, ভুটিয়ারা বলে মেন্ডং। এখন থেকে শুরু হচ্ছে হি-লা পাসের পথ। কিছুদূর এগোলে দক্ষিণ-পশ্চিম সিকিম সুন্দর দৃশ্যমান: টংলু, সিংলি, এমনকি দার্জিলিঙের পাহাড়ও। ঝোপঝাড়ের ভেতর বুনো শুয়োরের চলার পথ, হনুমানের কোলাহলে মুখরিত বন।

দুপুর একটা নাগাদ ছ-হাজার ফুট উঁচু পাহাড়শ্রেণির মাথায় পৌঁছোন গেল। অনেকগুলো জলধারা পার হয়ে এসে একটি শূন্য বাথানঘর, পাথরে তৈরি, গোপালকদের শীতকালীন আশ্রয়।

এখানে দু-দণ্ড বিশ্রাম নেবার বাসনা ছিল আমার— শরৎ লিখছেন— কিন্তু সেটা সম্ভব হল না কারণ চারিদিকে থিকথিক করছে জোঁক। নিজেদের দৈর্ঘ্য মাপতে মাপতে আমার দিকে ধেয়ে আসছিল তারা।

বিকেল চারটে নাগাদ শুরু হল নীচের দিকে নামা। চারদিকে বেঁটে বাঁশের ঝোপ,

BanglaBook.org

তাদের মাথায় লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা। এমনই এক ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে ফুরচুং বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করল পাহাড়ের দেবতাদের উদ্দেশ্যে। বনের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গায় এক বিশাল ওক গাছের নীচে রাতের বিশ্রামের জন্য থামা হল। এখানে এক ধরনের কাঁটাঝোপ যার পাতা থেকে নাকি খুব ভালো স্যুপ হয়, কুলিরা একরাশ তুলে আনল।

দার্জিলিং

দার্জিলিং শহরে ঢোকার মুখে আভা আর্ট গ্যালারির একটু আগে হিলকার্ট রোড যেখানে বাঁক নিয়েছে, যেখানে শিলিগুড়ি থেকে টুরিস্টবোঝাই জিপগুলো শ্লথগতি হয় আর পেছনে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হোটেলের টাউটরা, গাড়ির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলে— হোটেল চাহিয়ে? হোটেল? পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখায় আর নাছোড় টানাটানি করতে থাকে— হ্যালো স্যার! ভেরি চীপ! বেস্ট কাঞ্চিনজেঙ্গা ভিউ! টোয়েন্টিফোর আওয়ার হট ওয়াটার! রাস্তার বাঁকে সেই এলাকাটির নাম লাসা ভিলা। অনুল্লেখনীয়, কার্ট রোডের নীচে পাহাড়ের ঢালে ঘিঞ্জি বসতি, মূলত গাড়ির মেকানিক খালাসি ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের বাস।

আমার বাসায় ঠিকে কাজের দিদি আসতেন লাসা ভিলা থেকে। প্রতিবছর গভর্নমেন্ট কলেজে পড়তেও আসত দু-চারটি ছাত্র; তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে লেগে যেত গাড়ি চালানো বা সারাইয়ের কাজে। লাসা ভিলা শব্দ দুটি একসঙ্গে উচ্চারণ করত তারা, অনেক দোকানের সাইনবোর্ডেও এভাবেই লেখা থাকত— লাসাভিলা, হিলকার্ট রোড, দার্জিলিং। লোবসাং নোরবুর মুখে শোনার পর প্রথম জায়গাটির নাম আলাদা দুটি শব্দে ধরা দিল আমার চেতনায়।

নোরবু বলেছিলেন গ্রাম, কিন্তু বাস্তবে শহরের উপান্তে একটি বস্তি, দার্জিলিঙের চারপাশে যেমন গজিয়ে উঠেছে। সারা পাহাড়ের গায়ে কুশ্রী দাদের মতো শহরটা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। একশো বছর আগে হয়তো সত্যিই গ্রাম ছিল। তখনও বর্শার ফলার মতো জাপানি পাইনগুলো দার্জিলিঙের আকাশরেখা শাসন করে না, চাবাগানও ছেয়ে আসেনি এভাবে, চারিদিকে প্রাচীন বার্চ মেপল আর তাদের গায়ে জড়িয়ে থাকা ঘন ফার্নের ফেস্টুন। বিকেলের পর চিতাবাঘের আনাগোনা, রেলস্টেশন ছাড়িয়ে এদিকটায় পায়ে হেঁটে আসতে ভয় পায় লোকে। এরই মাঝে একটি সুদৃশ্য ভিলা ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছে কয়েকঘর বসতি, সবুজ পাহাড়ের কোলে তন্ময় হয়ে থাকে ঝিঁঝির তানে। দিনে দুবার টয়-ট্রেনের বাঁশিতে দুলে ওঠে জলে স্থির প্রতিবিম্বের মতো।

বিংশ শতাব্দীর শেষে এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে এই কষ্টকল্পনার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় না। উদোম ইঁট আর ঢেউ-খেলানো টিনের বস্তির চেনা ছবি, বারান্দায়

BanglaBook.org

রেলিঙে কালো পলিপ্যাকে ফুলগাছের সারি, জামাকাপড় মেলা রয়েছে, মাথার ওপর জলপাইপের গোছায় ইসকুশলতা, নীচে নেমে গিয়েছে নুড়িবিছানো পথ। আগন্তুক দেখে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে চেনবাঁধা কুকুর, লেসের পর্দা সরিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় এক মহিলা, তার মাথায় জড়ানো গোলাপি তোয়ালে। বাইরে খোলা উঠোনে একটি মোটরসাইকেলকে সাবান মাখিয়ে স্নান করাচ্ছে এক তরুণ। তার পরনে শর্টস, খালি গা, বাজুতে বিছের উল্কি। লাসা ভিলার সন্ধান করতে কালো তামাক-রঞ্জিত দাঁত বের করে বলে:

—এই তো লাসাভিলা, এই পুরো জায়গাটিই লাসাভিলা!

আরো কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পাওয়া যায়, ঘরবাড়ির আড়ালে প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছে, শতাব্দীপ্রাচীন ভিলা প্যাটার্নের বাড়িটি। একচিলতে সমতল ঘাসজমির ওপর বিস্মৃতির মতো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চারিপাশে বুনো লতাঝোপ। একটি বিশীর্ণ ক্যামেলিয়া গাছ থেকে টুপটাপ করে জলকণা ঝরছে।

১৯৫০ সালে আসামে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঢেউ এসেছিল দার্জিলিঙে, তখন বাড়িটার ক্ষতি হয়। ধ্বংসচিহ্ন দেখে অবশ্য অতীতের সেই বিপর্যয় আলাদা করে চেনার উপায় নেই আর। দেয়ালে প্লাস্টার খসে পাথরের বুনোট আর কাঠের ফ্রেম বেরিয়ে পড়েছে। চালের ঢেউখেলানো টিন মরচেয় জীর্ণ, কারুকার্যময় ছাঁচা খসে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে চিমনির মিনার। কিন্তু কী আশ্চর্য, ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে! কুয়াশার ভেতর আলাদা করা যায় না প্রথমে। জানলার ভাঙা শার্সিতে সাঁটা খবরের কাগজ, বারান্দার থামে বিচিত্র ছত্রাকের মতো একটি ডিশ অ্যান্টেনা। কড়া নাড়তে দরজা খোলেন এক মাঝবয়সী গোর্খা পুরুষ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মুখভর্তি বসন্তের দাগ।

ইনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন, এখানে ভাড়া আছেন বছর তিনেক। বাড়ির মালিক থাকেন কাঠমাণ্ডুতে। বহুকাল আগে কোনো এক সময়ে এই বাড়িটি এক বাঙালির ছিল, এইটুকুই শুধু জানেন। কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে এক সাংবাদিক এসে ছবি তুলে নিয়ে গেছে। তবে ইনি থাকেন বাড়িটার একধারে ছোটো একটু মেরামত-করা অংশে, বাদবাকি বেশিরভাগটাই পোড়ো পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। দোরগোড়ায় দর্শনার্থী দেখে বেরিয়ে এসে সাদরে ডেকে নেন সেই ধ্বংসের ভেতর। প্রাচীন আবছায়া, ভিজে শ্যাওলার গন্ধ, ভাঙা চাল থেকে ঘোলাটে আলো এসে পড়েছে দেয়ালে কমলা লাইকেনের ওপর, মেঝেয় কাঠের পাটাতন পচে নরম হয়ে এসেছে চোরাবালির মতো। ঘরের ভেতর তারের খাঁচায় ঝুলছে ভিজে জামাকাপড়, মধ্যিখানে জ্বলন্ত আঙিঠি। তারই ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভাঙা চিমনি দিয়ে।

বাইরে খোলা জমিতে এসে দাঁড়াই। কুয়াশা গলছে হাওয়ায়। আচমকাই মনে হয় যেন বুঝতে পারি কেন শরৎ দাস একশো বছর আগে শহরের প্রান্তে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন। বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের একটি স্পারের ওপর। নির্মল মেঘমুক্ত

BanglaBook.org

দিনে এখান থেকে উত্তর আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। সেই দৃশ্য, যা তিনি প্রথম চাক্ষুষ করেছিলেন কার্শিয়াং ছেড়ে দার্জিলিঙের পথে, আকাশে ভাসমান উজ্জ্বল স্ফটিকের তরঙ্গমালা। ওই বিস্ময়ের ওপারে রয়েছে তাঁর স্বপ্নের দেশ, অনেক দুর্গম উপত্যকা নদী গিরিখাত হিমবাহ পার হয়ে এক নিষিদ্ধ নগরী, যার নামে বাড়ির নাম রেখেছিলেন শরৎ। এই লাসা ভিলায় বসে তিনি লিখেছেন তাঁর বইগুলো, তিব্বত থেকে আনা দু-দুটি চমরির পিঠে বোঝাই অমূল্য পুঁথি আর গ্রন্থের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন অর্দ্ধেক জীবন।

দিনের পর দিন লেখার টেবিল থেকে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ চলে যেত কি শার্সির ওপারে এই তুষারমৌলির দিকে? সেই অজানা দুর্গম পথে যাত্রার দিনগুলো, সেই লামার ছদ্মবেশ, ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভেজা, জোঁক আর পোকার কামড় খেয়ে পথচলার স্মৃতি, তাঁবুতে আর গোপালকের ছাউনিতে রাতের আশ্রয়, ফার্নের পাতায় বৃষ্টির শব্দ সারারাত, বিশিষ্ট বনজ গন্ধের স্মৃতি ভেসে উঠত কি আচমকা, ভিলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শয়ান, বার্ধক্যের পলকা দিবাস্বপ্নের মতো?

নীচের খাদ থেকে কুয়াশার কুণ্ডলী উঠে ফের ঝাপসা হয়ে আসে লাসা ভিলা। ওইদিকে তাকিয়ে যতই কল্পনায় আনতে চেষ্টা করি এক বৃদ্ধকে, আমার মনে ভেসে ওঠে উনত্রিশ বছরের এক যুবক, চাঁদনি রাতে ঘোড়ায় চেপে চুপিচুপি দার্জিলিং ছেড়ে চলেছে এক গোপন অভিযানে। তার আশ্চর্য যাত্রার বিবরণ আমাকে পড়ার টেবিলে বেঁধে রাখে রাতের পর রাত, আমার ধূসর পিণ্ডাকার জীবনের ভেতর খুলে আসে একটা পথের মতো। পড়তে পড়তে আমি অনুভব করতে পারি পিচ্ছিল দেমফাটা পথের চড়াই, চমরি লোমের তাঁবুর ভেতর সন্ধ্যায় মোমের আলোর তাপ, সুরোভা মদের স্বাদ, জুনিপার কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ, রাতপোকাদের অর্কেস্ট্রা, কুলিদের তাঁবু থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর গিলে নিচ্ছে রাতের অরণ্য। একশো বছর আগের এক যুবকের আশানিরাশার ভেতর প্রতিফলিত হতে থাকি ব্রকেন স্পেক্টারের মতো। রাত গভীর হলে আমার ঘরে পাহাড়ের দেয়াল থেকে চুঁইয়ে আসে বনজ আর্দ্রতা, অন্তঃসলিলা ঝোরার শব্দ।

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে জানলায় তাকাই। কুয়াশায় মিটমিট করছে শহরের গুটিকয় বিনিদ্র আলো। ঘরের আলোর টানে শার্সির বাইরে এসে বসেছে একরাশ মথ, কাচের ওপর সাঁটা বর্ণময় ফ্লুরোসেন্ট ডানা, তার ওপরে প্রতিফলিত এক যুবকের মুখ: ঘরের দিকে ফেরানো, বাতিদানের আলোয় উদ্ভাসিত, চেয়ে রয়েছে আমারই দিকে। তারও সামনে খোলা বই।

—কী পড়ছ? জিজ্ঞেস করি আমি।

যুবক স্মিত হেসে হাত তুলে দেখায়: চেরি-লাল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি বই, ওপরে সোনার জলে নাম লেখা রয়েছে।

BanglaBook.org

পাঁচ

ছোট্ট সবুজ কচি একটা মেয়ে

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ফুটপাতে পুঁটলি-প্যাঁটরা নিয়ে ঠাঁই পেতেছে যে এলোমেলো পরিবারটি, তাদের চেহারা কিংবা পোশাক দেখে কোন মুলুক থেকে এসেছে বোঝার উপায় নেই। তবে চোখেমুখে দিশেহারা ভাব দেখে আন্দাজ হয় সদ্য এই শহরে এসেছে। তবু এর মধ্যেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে কেউ, মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসে পরস্পরের মাথার উকুন বাছছে দুই নারী, থার্মোকলের টুকরো নিয়ে খেলা করছে দুই কঙ্কালসার শিশু। সামনেই ক্রিশ্চান গোরস্থানের ফটক, ভেতরে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন পথ। দারোয়ানটি ঝিমোচ্ছে। টানা কদিন গরমের পর দুপুরের আগে এক পশলা ঝড়বৃষ্টি হয়ে স্নিগ্ধ হয়েছে। মাসটা এপ্রিল। এমনই একটি দিনে হঠাৎ জ্বরে মারা গিয়েছিল এক যুবক, প্রায় সোয়া দুশো বছর আগে। গোরস্থানের ভেতরে কোথাও শায়িত আছে সে। আঠেরো-উনিশ শতকের গথিক বারোক আর নিওক্ল্যাসিকাল শৈলীর সৌধগুলো গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এপিটাফের সনতারিখ বলে দেয় বেশিরভাগই যুবক, তরুণ, অধিকাংশই পুরুষ। বেশ কয়েকটি শিশুর কবরও রয়েছে। প্রধানত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গ। দু-চারজন বড়ো সেনা অফিসারের সৌধগুলো বেলেপাথরে তৈরি মিনারের আকারে, মাথায় গ্রিসীয় ভস্মাধার। আরেকটি সৌধের গায়ে নোঙরের রিলিফ জানায় ব্যক্তিটি কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন, কত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পেরিয়ে এসে এখানে শায়িত আছেন। বেশ কয়েকটি সৌধের নকশা বেদির ওপর ঝুলন্ত কফিনের আকারে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পালকি, অদৃশ্য বাহকের কাঁধে স্থির হয়ে ঝুলে আছে এক অনন্তযাত্রায়। এই গোরস্থানে সবচেয়ে বিখ্যাত কবরটি হেনরি ডিরোজিওর, পশ্চিমের গেটের পাশে, জ্যামিতিক পথে তীরচিহ্নে আঁকা সাইনবোর্ড— ডিরোজিও পথ। তার ডানদিকে মাথা তুলে আছে কয়েকটি অতিকায় পিরামিডের আকারে সৌধ। এগুলো সবচেয়ে প্রাচীন, আঠেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের, যখন গোরস্থানে জায়গার অভাব ছিল না। আর এই পিরামিডগুলোর পিছনের সরণিতে, মূল গেট থেকে প্রধান সড়কের ডান ধারে কয়েকটি বড়ো মেমোরিয়ালের মাঝে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে নীচু লম্বাটে নেহাতই

BanglaBook.org

নিরালঙ্কার একটি কবর, প্লট নম্বর ১৪৪৫-এ। মার্বেলের ফলকটি ফেটে চটে গিয়েছে, তবুও পড়া যায়:

IN SINCERE ATTACHMENT
To the Memory of
Mr. George Bogle
Late Ambassador to Tibet
Who died the 3rd April 1781
This MONUMENT is erected
by his most Affectionate Friends
David Anderson & Claud Alexander

চারপাশে কাব্যমণ্ডিত এপিটাফগুলোর তুলনায় নিতান্তই রিক্ত, কবরটির মতোই বেমানান। জন্মের সালতারিখ উল্লেখ নেই, বোঝাই যাচ্ছে জানা ছিল না। সিনসিয়ার অ্যাটাচমেন্ট আর মনুমেন্ট শব্দদুটোয় বোল্ড অক্ষর দেখে অনুমান হয় আত্মীয়পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নির্বান্ধব এই শহরে দুই সতীর্থের উদ্যোগে অন্ত্যেষ্টি হয়েছিল। তখন আশেপাশে এই এত সৌধ ছিল না, গোরস্থানের অধিকাংশ জমিই ছিল বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়ে ভরা। সেদিনও ছিল গ্রীষ্ম শুরুর এমন একটি দিন। দুপুরের আগে এইরকম ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল কি?

কবরের ওপর বিছিয়ে আছে ঝরা পাতা, আমের মুকুল, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। দুটি ছাতারে পাখি ঘাসের ওপর পোকা খোঁজে। হাত ধরাধরি করে তরুণ-তরুণী হারিয়ে যায় সেনোটাফের আড়ালে। পাঁচিলের গায়ে কেয়ারটেকারের ঝুপড়ির সামনে একমনে এক্কাদোক্কা খেলছে একটি মেয়ে। বাইরে ট্রাফিকের শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে, আকাশের গায়ে বহুতলগুলো মরিচীকা বলে ভ্রম হয়।

হঠাৎ মনে হয় এই অলঙ্কারবিহীন সৌধের শৈলী ঠিক যেন বৌদ্ধ মেন্ডং-এর মতো, যার গায়ে মনি-পদ্মে-হুম মন্ত্র খোদাই করা থাকে। এখানে দেয়ালগুলা বোবা, কালচে শ্যাওলার ছোপ ধরে আছে কেবল। আনমনে পরিক্রমা করতে গিয়ে কবরের পিছনদিকে এসে থমকে দাঁড়াই। পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে পড়েছে দুটি প্রাণী, সেই ফুটপাথের দুই শিশু, সাদা বিস্ফারিত চোখগুলো মুখের তুলনায় বেমানান রকমের বড়ো— ঝড়বৃষ্টিতে খসে পড়া আমের মুকুল তুলে খাচ্ছে।

ক্ষুধা মারী

১৭৭০ সাল। বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তর চলেছে। একমুঠো অন্নের জন্য গ্রামদেশে বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার। তার কিছুকাল আগে মুর্শিদাবাদের নবাবী শাসন শেষ হয়েছে, রাজ্যপাট এসেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। কোম্পানির নতুন করের বোঝায় গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বিলিব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে অজন্মা। দীর্ঘ

BanglaBook.org

জাহাজযাত্রার শেষে কলকাতায় এসে পৌঁছে এক ভয়াবহ মন্বন্তর চাক্ষুষ করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরুণ রাইটার জর্জ বোগল।

গ্রামবাংলার মন্বন্তরের ভয়াবহতা অবশ্য কলকাতা শহরে ছিল না। তখনও রেলপথ হয়নি, সড়ক যোগাযোগও তেমন উন্নত নয়। পরবর্তীকালের মন্বন্তরগুলোর মতো কঙ্কালসার মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়েনি কলকাতায়। তবু খবর আসছিল চারদিক থেকে— কোম্পানির শাসনভুক্ত বাংলার গ্রামাঞ্চল শ্মশানভূমি হয়ে পড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে বাবাকে চিঠি লিখছে জর্জ— প্রতিদিন প্রায় দেড়শো মৃতদেহ পড়ছে কলকাতার রাজপথে, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো। গ্রামবাংলার অবস্থা আরও ভয়াবহ। মানুষ খাদ্যের অভাবে ঘাসপাতা খাচ্ছে, এমনকি ধর্মের অনুশাসন উপেক্ষা করে পশুর মাংসও খাচ্ছে। কোথাও কোথাও মনুষ্যদেহ ভক্ষণের কথাও শোনা যাচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতা দাগ কেটে যায় জর্জ বোগলের মনে। তখনও কোম্পানির বেতনভুক রাজকর্মচারীদের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। বাগানঘেরা গুটিকয় বাংলো নিয়ে সাহেবপাড়া ছেড়ে বেরোলেই নেটিভদের ব্ল্যাক টাউন: ধুলোকাদাময় পথঘাট, টালিখাপরার বাড়ি, দুর্গন্ধ, মশামাছি, ম্যালেরিয়া আর আন্ত্রিকের প্রকোপ। কলকাতা তখনও চোখ ধাঁধানো মহানগর হয়ে ওঠেনি। সদ্য কোম্পানির আমল শুরু হয়েছে, চারদিকে অব্যবস্থা আর নৈরাজ্যের ছবি।

ছবিটা পাল্টাতে শুরু হল বছর দুয়েকের মধ্যেই, যখন গভর্নর জেনারেল হয়ে বাংলায় এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, শক্ত হাতে ধরলেন শাসনব্যবস্থার রাশ। রাজ্যপরিচালনায় ব্যাপক রদবদল আনলেন তিনি। এইসময়ে জর্জ বোগলকে বোর্ড অব রেভেনিউ-এ অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির পদে আনা হল। গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে রাজ্য পরিদর্শনের কাজে যাবার সুবাদে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠল তরুণ এই অফিসার।

তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়ো মাপের ব্যবসা ছিল চিনের সঙ্গে। সেটি প্রধানত হতো জলপথে, ক্যান্টনের জাহাজঘাটা দিয়ে। কিন্তু সেই লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করত চিনের সম্রাট, শুল্ক দিতে হতো কোম্পানিকে। তাছাড়া বাংলা থেকে আফিম রপ্তানির ব্যাপারেও বন্দর শহরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সম্রাট। বিকল্প পথটি ছিল তিব্বত ঘুরে।

তিব্বত থেকে ভুটান ও নেপালের গিরিপথ হয়ে ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিভিন্ন জনপদের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রচলন ছিল দীর্ঘকাল ধরেই। তিব্বতের ব্যাপারিরা আনতো চিনা সিল্ক, ঘোড়া, মৃগনাভি, চমরির লেজের চামর, ভেড়া, সোনা রুপো আর কাগজ। ভারত থেকে রপ্তানি হতো সুতির কাপড়, কাচের সামগ্রী, প্রবাল, মুক্তো, মশলা, কর্পূর, পান ইত্যাদি। বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে চিন পারস্য তাতারভূমি, এমনকি সাইবেরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল বাণিজ্যের মানচিত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল তিব্বতের। মনে রাখতে হবে, তখনও ভিনদেশিদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধভাবে হয়ে ওঠেনি হিমালয়ের ওপারে চিরতুষারের এই দেশ, ভারতে যার নাম ছিল ভোট বা ভোটিয়া দেশ। তিব্বত শব্দটি ইউরোপীয়রা নিয়েছিল তুর্কী ও পারস্য থেকে।

BanglaBook.org

এই তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জর্জ বোগলকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত করে পাঞ্চেন লামার কাছে পাঠালেন ওয়ারেন হেস্টিংস। সালটা ছিল ১৭৭৪।

তিব্বতে দলাই লামার মতোই অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা ও শাসক ছিলেন পাঞ্চেন লামা। দলাই লামা থাকতেন লাসায়, আর পাঞ্চেন লামা পশ্চিম তিব্বতের শিগাৎসে শহরে তাশিলুম্ফো নামে বিশাল মঠনগরীতে। এজন্য তাঁকে তাশি বা তেমু লামাও বলা হতো।

জর্জ বোগলকে যে দায়িত্বভার দিয়ে তিব্বতে পাঠালেন হেস্টিংস, তার মধ্যে একটি ছিল সাংপো-ব্রহ্মপুত্রের ভৌগোলিক রহস্য অনুসন্ধান। এই ব্যাপারে তখন দুটি প্রচলিত মত ছিল: ফরাসি মানচিত্রবিদ জাঁ ব্যাপটিস্ট ডিঅ্যানভিলের মতো মানচিত্রবিদেরা মনে করতেন, তিব্বতের সাংপো পূর্বমুখী বয়ে গিয়ে বর্মায় প্রবেশ করে ইরায়ডি হয়েছে; অন্যদিকে জেমস রেনেলের মত ছিল সাংপোই ব্রহ্মপুত্রের উৎস।

এছাড়াও বোগলের হাতে একটি দীর্ঘ তালিকা ধরিয়েছিলেন হেস্টিংস। তার মধ্যে ছিল—

(১) টিস নামক প্রাণী একজোড়া, যাদের পশম থেকে শাল হয়। (জীবিত ও সুস্থ নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনে ডুলি ভাড়াও করা যেতে পারে।)

(২) চামর হয় যে গবাদি পশুর লেজ থেকে, তেমন পশু একজোড়া।

(৩) আখরোটের বীজ, সম্ভব হলে আস্ত একটি গাছ; এছাড়া জিনসেং ও অন্যান্য বিশেষ গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া।

(৪) যে-কোনো ধরনের কার্যকর অথবা বিচিত্র প্রাণী।

সেই তালিকায় ছিল অজানা দেশের মানুষ, তাদের রীতিনীতি আচারব্যবহার ব্যবসাবাণিজ্য, শাসন ও রাজস্বব্যবস্থার হালহদিশ জানা, সেখানকার আবহাওয়া, পথঘাট, ঘরবাড়ি, রন্ধনশৈলী খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। এসবের জন্য সর্বদা একটি ছোটো ডায়েরি ও পেনসিল সঙ্গে রাখার এবং পর্যবেক্ষণের স্মৃতি তাজা থাকতেই সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ ছিল হেস্টিংস সাহেবের।

এছাড়া সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল আলুর বীজ, বোগলের কাজের মধ্যে ছিল তিব্বতের পথে পাহাড়ি জনপদগুলোয় এই নতুন কন্দ প্রচলন করা।

মে মাসের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করল আঠাশ বছরের ইংরেজ যুবক জর্জ বোগল। তখন প্রখর গ্রীষ্ম, দাবদাহ থেকে বাঁচতে রাত্রিবেলা পথ চলতে হতো ঘোড়ায় চেপে। এইভাবে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর হয়ে কোচবিহার রাজ্যে এসে পৌঁছতে এক পক্ষকাল লেগে গেল।

যে অঞ্চলে প্রবেশ করতে চলেছি সেখানে কোম্পানির কর্মচারী তো বটেই, আমার ধারণা কোনো ইউরোপীয় এর আগে প্রবেশ করেনি— ডায়েরিতে লিখছেন বোগল। পথ, আবহাওয়া, মানুষজন সবই অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা।

BanglaBook.org

কুচবিহার ছাড়াতেই শুরু হল বিস্তীর্ণ নাবাল জলাজমি। দু-ক্রোশ চলার পর পথ ঢুকেছে উঁচু ঘাস আর ঘন শরের বনে। ব্যাঙ, জলের পোকামাকড় আর ভ্যাপসা বাতাসে শ্বাস নেওয়াই দুষ্কর। এইভাবে পাঁচ ক্রোশ গিয়ে শুরু হচ্ছে শালজাতীয় মহীরুহের অরণ্য। মাইল দুয়েক এগিয়ে নদী। শালের গুঁড়ি বেঁধে তৈরি ভেলায় চেপে কুচবিহার রাজ্য ছেড়ে ভুটানের দেবরাজার এলাকায় প্রবেশ করা গেল। বাংলার সীমানার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে যে পাহাড়ের শৃঙ্খল, তার পাদদেশ। ওপারে তিব্বত।

একটি পোড়ো দুর্গ, দেখে মনে হয় সম্প্রতি ধ্বংস হয়েছে, পার হয়ে একটা ছোটো গ্রাম্য বসতিতে এসে সেদিনের যাত্রার ইতি টানল জর্জ। রাতের আশ্রয় মিলল মোড়লের যে কুঁড়েয়, সেটি বাঁশের তৈরি পাতায় ছাওয়া, ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। একটি খাঁজকাটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। দেয়াল মেঝে সবই শরে বোনা, লোহা কিংবা দড়িদড়ার ব্যবহার নেই কোথাও। দেখতে ঠিক যেন একটি পাখির খাঁচার মতো। নীচে শুয়োরের খোঁয়াড় রয়েছে।

মোড়ল ছাড়াও দু-চারজন গ্রামের লোক এসেছিল, এক বোতল রাম পান করে তারা বেসামাল হয়ে পড়ল, বোগল ডায়েরিতে লিখছেন। মোড়লের সঙ্গে থাকছিল এক ফেরিওয়ালা নারী ; স্বাস্থ্যবতী, সুগঠিত দাঁত, চোখদুটো রুবেন্সের স্ত্রীর মতো। তার পরনে পোশাক বলতে একটিমাত্র পশমি চাদর, কাঁধের ওপর রুপোর পিন দিয়ে আঁটা। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে মদ্যপান করেছিল সেও। সন্ধ্যার পর অপরিসর কুঁড়ের মেঝেয় নারী পুরুষ শিশু সবাই একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতে যাত্রা শুরু হল। দূর থেকে যে পাহাড়শ্রেণি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাথার ওপর প্রাচীরের মতো, কাছে যেতে তার গায়ে ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল শাল চীর আর পাইনের বন। সেই পাহাড়ি অরণ্যের বুক থেকে নেমে আসছে অসংখ্য ছোটো ছোটো জলধারা, স্বচ্ছ তোয়া, বয়ে চলেছে নুড়িপাথরের বিছানা দিয়ে। পথ ক্রমশ বন্ধুর। বেলা দুটো নাগাদ পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছনো গেল।

পাহাড়ে ওঠা কিছুক্ষণ পর্যন্ত সহজ, উঁচু উঁচু গাছের বনের ভেতর দিয়ে। ক্রমশ চড়াই বাড়তে লাগল। পথ সরু হতে হতে এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রায় চার মাইল উঠতে হল এভাবে। জঙ্গলে ছায়া ঘনিয়ে এল, ঝর্ণার শব্দ শোনা যেতে লাগল। সন্ধ্যার আগে জর্জ গিয়ে পৌঁছল বক্সাদুয়ারে।

একটি পাহাড়ের মাথায় বক্সাদুয়ার, তিনদিকে ঢেউয়ের মতো উঁচু উঁচু পাহাড় উঠে গিয়েছে। নীচে একটি সরু গিরিখাত, তিনফুট উঁচু আলগা পাথরের দেয়াল, আর একটি প্রাচীন ঝাঁকড়া বটগাছ। আর কিছু নেই।*

এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেব অফিসারকে প্রথামাফিক অভ্যর্থনা জানাতে

---

* ২০ মার্চ ১৮৬৫, সকালবেলায় কর্নেল হাটন কয়েকজন সেনা জওয়ানকে এই গাছটি কেটে ফেলতে উদ্যত দেখে বাধা দেন। গাছটি আজও আছে, লিখছেন বোগলের ডায়েরির সম্পাদক। কিন্তু পাইনগাছ এই অঞ্চলে যদিও বা ছিল, এখন আর নেই।

এল বক্সা সুবার দেওয়ান। সঙ্গে উপহার এনেছিল একটি সাদা রুমাল (খাদা), মাখন, চাল, দুধ আর নিকৃষ্ট মানের চা। সামনে দীর্ঘ পথ, মাল বওয়ার জন্য কুলি জোগাড় করত একটি পুরো দিন কেটে গেল।

৯ জুন, ১৭৭৪। কোম্পানি শাসিত বাংলা ছেড়ে ভুটানের অরণ্যাবৃত পাহাড়ে পা রাখল জর্জ। একটি রোগাটে কিন্তু অতীব নির্ভরযোগ্য ঘোড়ায় উঠেছিল সে। কিছুক্ষণ চলার পর পথ ক্রমশ দুর্গম হয়ে উঠতে লাগল, রীতিমতো সরু আর খাড়াই, এবড়ো খেবড়ো পাথরের ধাপ কেটে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে। এভাবেই পার হওয়া গেল বক্সদুয়ারের ওপরে ঝুলে থাকা পিচাকোনাম পাহাড়। গ্রীষ্মের মধ্যদিন, কিন্তু বাতাস আশ্চর্য স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। নীচে গভীর খাদের গা জঙ্গলে ঢেকে থাকায় তেমন ভীতিপ্রদ দেখাচ্ছে না। পথ উঠে গিয়েছে সটান পাহাড়ের মাথায়। সেখানে পৌঁছে ফের উলটোদিকে নামার আগে বাংলার দিকে একবার ফিরে তাকাল জর্জ।

ভূপৃষ্ঠের এমন আকস্মিক বদল, এমন বৈপরীত্য, কল্পনা করা অসম্ভব— লিখছেন বোগল। দক্ষিণে আবহাওয়া নির্মল, বিস্তীর্ণ সমভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় বৃত্তাকার দিগন্তরেখা পর্যন্ত। কোথাও উঁচুনীচু পাহাড় কিংবা টিলা নেই, শৃঙ্গ বা মিনার নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় পরিব্যাপ্ত ছেদহীন সমভূমি, বনাচ্ছাদিত, কিংবা ফসলের খেত আর গোচারণভূমি, নদীখাতের রেখা, গ্রাম, ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে। কিন্তু আমাকে টানছিল, আমার ভেতরে ঢের বেশি আনন্দের সঞ্চার করছিল, বিপরীত দিকের দৃশ্য। কঠিন উতরাই ঢাল, গহীন উপত্যকা, গগনচুম্বী বৃক্ষরাজি, পাহাড় আর পাহাড়। তাদের শৃঙ্গগুলো মেঘের আড়ালে ঢাকা।

মেঘমেদুর

ঋত্বিক ঘটকের *কোমল গান্ধার* ছবিতে কার্শিয়াঙের পাহাড়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ঋষি চিৎকার করে বলছে— এই ভৃগু, বাংলাদেশের প্লেইনসটা দেখেছিস? একটুও মেঘ না থাকলে মনে হয় মিষ্টি করে হাসছে যেন ছোট্ট সবুজ কচি একটা মেয়ে, চুপ্পা করে পড়ে আছে!

হিল কার্ট রোড দিয়ে দার্জিলিং ওঠার পথে কার্শিয়াঙের আগে ছোট্ট বসতি রংটং থেকে দক্ষিণ দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে বাংলার এই সমতল। সেই কতকাল আগে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে জীবনে প্রথমবার দার্জিলিং যাবার পথে দেখেছিলাম আমি। তখন বর্ষাকাল। সুকনার জঙ্গলের মাথায় সেগুনের হরিদ্রাভ মঞ্জরি এসেছে, দূরে মিহি ধোঁয়াশায় ঢাকা শিলিগুড়ি শহরের ফেনায়িত বিস্তার। সামনে পথ উঠেছে কালচে সবুজ পাহাড়ে, তাদের মাথাগুলো হারিয়ে গিয়েছে মেঘের দেশে।

জীবনের এই মুহূর্তগুলো একেকটি গ্রন্থির মতো, আশা আর বিষাদে মেশা এক জটিল মানসিক অবস্থা, যা একেকটি ছবির আকারে স্মৃতিতে জমা হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

আমি গিয়েছিলাম উনিশশো নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। তার একশো বছরেরও বেশি আগে দার্জিলিঙের পথে শেষবার দিগন্তে ব্যাপ্ত সমভূমির দিকে ফিরে তাকিয়ে শরৎ দাসের ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল ? জর্জ বোগলের মতো তাঁরও কি দৃষ্টি ছুটেছিল সামনের দিকে, মেঘকুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের চুম্বকে ? নাকি, আজন্ম গাঙ্গেয়ভূমিতে লালিত মানুষের যেমন হয়, বারেবারেই চোখ চলে যাচ্ছিল যেখানে কালচে সবুজ অরণ্য আর চিকচিকে নদীর খাতে গা ঢেকে বাংলার সমতল পড়ে আছে এক ছোট্ট সবুজ মিষ্টি কচি মেয়ের মতো ?

ঐ মেয়ে

মে মাসের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে ডিসেম্বর মাসে তাশিলুম্ফোয় এসে পৌছন বোগল। শীতের শেষ পর্যন্ত ছিলেন। পাঞ্চেন লামার সঙ্গে তাঁর হার্দিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়া ভুটানের ভেতর দিয়ে বাণিজ্যপথ সুগম করার ব্যাপারেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। এগুলিই ছিল জর্জ বোগলের অবদান। এর কয়েক বছর পরে আরেকবার তাঁকে কোম্পানির দূত হিসেবে তিব্বতে পাঠাবার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। পাঞ্চেন লামা তখন চিনে। স্থির হয়েছিল, বোগল চিনে গিয়ে পাঞ্চেন লামার সঙ্গে তিব্বতে ফিরবেন। কিন্তু বেজিঙে থাকাকালীন গুটিবসন্তে মৃত্যু হয় পাঞ্চেন লামার। এর কিছুকাল পরে, ৩ এপ্রিল ১৭৮১, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বোগল মারা যান কলকাতায়। ওয়ারেন হেস্টিংসও অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যান। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্ভাবনার পথ হারিয়ে যায় ইতিহাসের চোরাবালিতে।

তার বছর দশেকের মধ্যে তিব্বতে গোর্খা আক্রমণ হয়, তাশিলুম্ফোর মঠে প্রভূত ধনসম্পত্তি লুঠ হয়, ধ্বংস হয়ে যায় মূল্যবান পুঁথিপত্র। চিনের সাহায্য নিয়ে শেষপর্যন্ত সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিল তিব্বত, নেপালের রাজাকে পর্যুদস্ত করেছিল। এই সময় লর্ড কনওয়ালিশের নেতৃত্বে কোম্পানির সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ব্রিটিশ-তিব্বত সম্পর্কে যতিচিহ্ন টানল। তিব্বতে যাবার গিরিপথগুলো বন্ধ হয়ে গেল বহিরাগতের জন্য।

ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশ মেনে যাত্রার অনুপুঙ্খ দিনলিপি রাখতেন জর্জ বোগল। সেখানে ভূপ্রকৃতির বিবরণ ছাড়াও ওখানকার মানুষের সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ছিল। বোগলের মৃত্যুর পর সেই দিনলিপি অন্যান্য ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সঙ্গে ফিরে যায় ইংল্যান্ডে তাঁর পারিবারিক বাড়িতে। সেখানে একটি কাঠের সিন্দুকের ভেতর একরাশ চিঠিপত্রের মাঝে হারিয়েছিল একশো বছর। ১৮৭৫ সালে ইন্ডিয়া অফিসের জিওগ্রাফিকাল ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে সেটি প্রকাশিত হয় টমাস ম্যানিং নামে এক পর্যটকের লাসা ভ্রমণের বিবরণের সঙ্গে।

BanglaBook.org

দার্জিলিঙে এসে যুবক শরৎচন্দ্র ভুটিয়া স্কুলের হেডমাস্টারের পদে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই ডেপুটি কমিশনার এডগার সাহেব তার হাতে তুলে দিলেন একটি বই, চেরি-লাল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো, ওপরে সোনার জলে লেখা:

Narratives of the
Mission of George Bogle to Tibet
And of the
Journey of Thomas Manning to Lhasa
Edited by
Clements R Markham, C.B., F.R.S.

শরৎ দাসকে দার্জিলিঙে পাঠাবার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের একটি বিশেষ স্তরে যে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, সেই বিষয়ে এডগার অবহিত ছিলেন কী না জানা যায় না। কিন্তু লন্ডন থেকে সদ্য প্রকাশিত বইটি যে সেই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকটাই সাহায্য করেছিল, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। একশো বছর আগে জর্জ বোগলের তিব্বত যাত্রার বিবরণ এক বঙ্গজ তরুণের মনে জাগিয়ে তোলে বরফাবৃত পাহাড়শ্রেণির ওপারে নিষিদ্ধ দেশটি সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ।

দার্জিলিং তখন নিতান্তই নবীন, টিমটিমে একটি শহর— কাঠ আর পাথরে তৈরি গুটিকয় বাংলো আর পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডি পথ। সব পথ এসে মিলেছে একটি রাস্তায়, তার নাম কার্ট রোড। সাহেবমেমরা ঘোড়ায় কিংবা ডুলিতে চেপে আসে সেই পথ দিয়ে, তখনও পাহাড়ের গা বেয়ে রেললাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। দু-তিনদিন অন্তর সমতল থেকে মহিষে টানা গাড়িতে মাল আসে, চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে টিনের ছাউনির ছোট্ট বাজার। সেখানে নীচের গ্রাম থেকে লেপচা মেয়েপুরুষেরা আসে নানাধরনের শাকপাতা ফলকন্দ নিয়ে। তাদের বিচিত্র চেহারা আর সাজপোশাক শরতের নজর টানে। পাহাড়ের যে কোনো দিকে পা বাড়ালেই ঘন আদিম জঙ্গল। সেখান থেকে বিচিত্র বর্ণময় পাখি ও বন্যজন্তু, বেশিরভাগই স্টাফ-করা, নিয়ে শহরে বেচতে আসে স্থানীয় শিকারিরা।

এভাবেই পাহাড়ের প্রকৃতি এক উদগ্রীব তরুণের সামনে নিজেকে মেলে ধরে একটু একটু করে। দূর আকাশের গায়ে কখনো মেঘের পর্দার আড়ালে, কখনো বা সূর্যের আলো ঝলমল এক অসম্ভব স্বপ্নের মতো ঝুলে থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বোগলের বিবরণ পড়ার পর সেই স্বপ্নের ওপারে চিররহস্যের দেশে যাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে সে। সেই সুযোগও এসে যায়। নতুন ভুটিয়া স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দিয়েছিল সিকিমে রিঞ্চেনপং মঠের থেকে সদ্য দীক্ষিত লামা উগেন গ্যাৎসো। রিঞ্চেনপঙের মঠ ছিল তাশিলুম্ফোর অধীনে। শরৎচন্দ্রের জন্য পাঞ্চেন লামার ছাড়পত্র নিয়ে এল উগেন। বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি পেতে দেরি হয়নি।

BanglaBook.org

শেষময়ন

কথিত আছে, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহানির্বাণ লাভ প্রত্যাখ্যান করেন এবং পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে বার বার জন্মাতে চেয়েছিলেন। পাঞ্চেন লামা সেই বোধিসত্ত্বের অবতার। চতুর্দশ শতকে আবির্ভাব হয় প্রথম পাঞ্চেন লামার। জর্জ বোগলের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ হয় তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। একজন পাঞ্চেন লামার মৃত্যু হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য কিছু বিশেষ দেহলক্ষণযুক্ত একটি শিশুকে খুঁজে বের করার এক গোপন রহস্যময় ধর্মীয় আচার পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন তাশিলুম্পো গুম্ফার শীর্ষস্থানীয় সন্ন্যাসীরা। এতে অবশ্যই দলাই লামার স্বীকৃতি থাকে। দলাই লামার নির্বাচনও একই পদ্ধতিতে হয় এবং সেখানেও পাঞ্চেন লামার স্বীকৃতি লাগে। এইভাবে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন শিশুর মধ্যে ফুটে ওঠে কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ, বিভিন্ন মনুষ্যদেহে প্রতিফলিত হয় এক অবিনশ্বর আত্মা। এমনটাই বিশ্বাস করে তিব্বতের ধর্মভীরু মানুষ।*

এভাবেই কাহিনির ভাঁজে একটি চিত্রকল্পে, একটি অস্পষ্ট কামনা বা উৎকণ্ঠার ভেতরে নিজের মুখচ্ছবির মতো প্রতিফলিত হয় আমাদের জীবন। কোনো এক দুর্লভ পলকা মুহূর্তে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়, পাহাড়ে একটানা বর্ষার মাঝে মেঘভাঙা অনির্বচনীয় আলোর মতো। সেই আলোর ভেতর এক অনন্ত মুহূর্তে আমরা বেঁচে উঠি, সোনালি আলোয় চারিদিক ধুয়ে ওঠে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির মতো, অকস্মাৎ দীপ্যমান হয়ে ওঠে আমাদের অকিঞ্চিৎকর জীবন।

জর্জ বোগলের দিনলিপি পড়ে সম্ভবত তেমনই এক অনুভূতি হয়েছিল শরৎ দাসের। তারপর সেই পথে যাত্রা ছিল নেহাতই নিষ্পদ্যমাত্র।

BanglaBook.org

---

* ১৯৮৯ সালে দশম পাঞ্চেন লামার মৃত্যুর পর একটি বিতর্কের সূচনা হয়। ভারতে নির্বাসিত চতুর্দশ দলাই লামা এক বালককে পাঞ্চেন লামা হিসেবে স্বীকৃতি দেন, অন্যদিকে চিন অধিকৃত তিব্বতে সরকারি মদতে নির্বাচন করা হয় অন্য একজনকে। বর্তমানে প্রথমজনকে গৃহবন্দী করে রেখেছে চিনের সরকার।

ছয়

রিঞ্চেন তেনোয়া

১১ নভেম্বর, ১৮৮১। আকাশে মেঘ জমে ছিল, তারপরে শুরু হল রোদবৃষ্টির খেলা। ভুটিয়ারা একে বলে মেতগ-চার্পা, অর্থাৎ পুষ্পবৃষ্টি— শরৎচন্দ্র লিখছেন।

প্রতিটি জলকণা সূর্যরশ্মিতে জ্বলন্ত ফুলের মতো আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে খাদের অতলে। হি গ্রামে ভুটিয়া, লেপচা আর লিম্বুদের বসতি। লিম্বুদের দেখে মনে হয় বেশ সচ্ছল, ধাপে ধাপে সেচসেবিত জমিতে ধান রুয়েছে। কালাই নদীর কয়েকশো গজ ওপরে বেড়া দেওয়া এলাচের খেত। বছরের এই সময়েও রীতিমতো খরস্রোতা এই কালাই, যাকে কালহাইতও বলে, শিংলি পাস থেকে উৎসারিত হয়ে এঁকেবেঁকে কুড়ি মাইল গিয়ে রঙ্গিতে মিশেছে তাশিদিং পাহাড়ের নীচে। নদীর পথ ধরে পাহাড়ের শিরায় শিরায় গ্রাম, দুপাশের খাড়া পাড়ে উঁচু উঁচু গাছ। স্বাদু মাছ পাওয়া যায় নদীতে। জলের গভীরতা যেখানে কম, সেখানে বাঁশের জাল পেতে এক ধরনের বিষাক্ত গাছের পাতা ফেলে মাছ ধরে লিম্বুরা।

নদীর পাড় ছেড়ে দিয়ে চড়াই পথে লম্বা ঘাস আর শরের বনের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতে থাকে দলটা। বুনো শুয়োর আর সজারু রয়েছে এই বনে। ফসলের খুব ক্ষতি করে এরা, বিশেষ করে ডাল আর মুলোর খেত তছনছ করে।

তিন হাজার ফুট ওঠার পর কালাই উপত্যকার ওধারে পেমিয়াংচি, ইয়ান্তাং, হি ও অন্যান্য গ্রামগুলো দেখা যেতে লাগল ক্রমশ। ওদিকে রাতোং নদীর খাত আর ডানদিকে বসতিটির নাম লিংচাম ; মুরোভার খেত আর কমলালেবুর বাগান। এখানেই এক লিম্বু গৃহে আশ্রয় মিলল।

পরদিন সকাল থেকে চড়াই সুঁড়িপথের রেখা ধরে ওঠা। বনের মাঝে মাঝে ভুট্টার খেত আর জীর্ণ লিম্বু বসতি। পথে দেখা মিলল এক বুড়ির, এক ঝুড়ি বুনো খুবানি তুলে নিয়ে চলেছে। বেলা দুটো নাগাদ একটি স্পারের ওপর গিয়ে উঠল দলটা। দূরে সাঙ্গাচোলিং মঠ, সামনে একটি শ্যাওলাঢাকা চোর্তেন। ঘন ওক-পাইনের বনের ভেতর দিয়ে ঝোপঝাড় কেটে টালে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

বিশ ঘরের গ্রাম টালে। বসতির আশেপাশে ঘোড়া আর মহিষ চরছে। অভিযাত্রীর দল দেখে বসতির লোকেরা বেরিয়ে এসে ছাং-এর বিনিময়ে লবণ চাইল। জানা গেল, এবার অক্টোবরেই তুষারপাত হওয়ায় ইয়াম্পুং থেকে লবণের ব্যাপারীরা আসেনি। কিন্তু শরৎদের কাছে উদ্বৃত্ত লবণ ছিল না।

BanglaBook.org

পরদিন বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে খরস্রোতা রিংবি পার হয়ে নদীর পাড় ধরে মাইল পাঁচেক চলা। খাড়া পাহাড়ের গা কামড়ে চলেছে পথ, সরু আর পিচ্ছিল, বুনো লতা খামচে ধরে সন্তর্পণে পাথরের খাঁজে পা ফেলে চলতে হয়। অনেক নীচে জলের ফেনিল গর্জন, পায়ের ধাক্কায় পাথর খসে পালকের মতো হারিয়ে যায় তার হাঁ-মুখে। এক জায়গায় একটি অতিকায় পাথর কেটে গভীর খাত করে নিয়েছে জলধারা, ওপরে বাঁশের মই ফেলা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে সেটি পার হতে হতে ওপর দিকে তাকিয়ে শরৎ দেখল পাথরের ফাটলে গোঁজা কয়েকটি স্টাফ-করা ফেজেন্ট জাতীয় পাখি আর একটি লাল তিব্বতি জামা। এই ধরনের পাখি কিনতে পাওয়া যায় দার্জিলিঙের বাজারে।

আরও মাইলখানেক গিয়ে একফালি রোয়াকের মতো জমির ওপর রিংবি গ্রামে পৌঁছন গেল। অপরূপ দৃশ্য: পিছনে খাঁজকাটা ন্যাড়া পাহাড়ের প্রেক্ষাপট, অনেকটা নীচে সগর্জনে বইছে রিংবি। খাতের ওপারে পাহাড়ের গা ঢেকে রয়েছে বুনো কলার বন, ওক পাইন আর রাতান লতার দড়িদড়ায়। আধ ডজন লিম্বু কুঁড়ে নিয়ে ছোট্ট গ্রাম, সেখানে পৌঁছেই ফুরচুং পিঠ থেকে মালের বোঝা খসিয়ে তার প্রভুর জন্য মুরোভার বিয়ার কিনতে ছুটল এক চেনা ব্যক্তির ঘরে। ফিরে এল তিনটি বোতল নিয়ে, যার মধ্যে একটি অবশ্যই তার প্রাপ্য।

নদীখাতের ধারে ঘাসজমিতে তাঁবু পড়ল, ভেতরে জাজিম বিছানো হল। তার ওপরে শরীর এলিয়ে বিয়ারে চুমুক দিতে পথশ্রমের ক্লান্তি লাঘব হল শরতের। কুলি চাকরেরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; কেউ গিয়েছে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে, কেউ বা বনের শাকপাতা তুলতে, রাতের খাবার জোগাড় করতে গিয়েছে কেউ। অনেকটা নীচে জলের কলধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ছেড়ে আসা অতীতের থেকেও অনাগত ভবিষ্যৎ ছেয়ে এল আমার মন জুড়ে— ডায়েরিতে লিখছেন শরৎ, ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

১৪ নভেম্বর। নির্মল সকাল, চারিদিকে অপূর্ব পাহাড়ের দৃশ্য, যার আদিম জৌলুস চোখকে ক্লান্ত করে না কখনো। কিন্তু ফুরচুঙের দেখা নেই। আগের রাতে ওকে পাহাড়ের ওপারে নাম্বুরা গ্রামে পাঠানো হয়েছিল সামনে কঠিন যাত্রার জন্য রসদ সংগ্রহ করতে। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ফিরে না আসায় সেদিনের যাত্রা বাতিল করতে হল অগত্যা।

অবশেষে বিকেলের পর উদয় হল ফুরচুং; ধুম মাতাল হয়ে আছে, কিন্তু রসদ আনতে ভোলেনি। চাল, ভুট্টা, মুরোভা, ডিম, শাকসবজি আর আস্ত একটা ভেড়া কিনেছে চার টাকায়। প্রভূত ক্ষমা চেয়ে, সেলাম ঠুকে, তিব্বতি কায়দায় জিভ ঘুরিয়ে চোখের সামনে থেকে বিদায় হল সে।

রিংবিতেও গ্রামের লোকেরা লবণ চেয়েছিল, বদলে দিতে চাইছিল এক বিশেষ ধরনের লতা। রং তৈরি হয় এই লতা থেকে, আশেপাশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মায়।

টাটকা তুষারপাতে ঢেকে রয়েছে ওপরের গিরিপথ, গ্রামবাসীরা তাই এগিয়ে যেতে

BanglaBook.org

নিষেধ করেছিল। রিংবিতে থাকলে বরং খাবারদাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে বেশিদিন থেকে গেলে এই খবর তিব্বতী সীমান্তরক্ষীদের কানে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া কবে নরম তুষার জমে গিয়ে চলার মতো হবে, সেটাও জানার কোনো উপায় নেই। তিন-চার দিনের দূরত্বে গিরিপথ। শেষপর্যন্ত স্থির হল, যাত্রপথ বদলে ইয়াম্পুং লা পাস দিয়ে যাওয়া হবে। ওদিকটায় বরফ পড়েনি। গ্রামের মানুষদের অবশ্য বলা হয়েছিল শিকারীর দল, গিরিপথ পেরোনোর আবশ্যিকতা নেই। ফুরচুঙের কাঁধে পাখি-মারা বন্দুক আর গুলির বেল্ট দেখে সেটা বিশ্বাস করাও কিছু কঠিন ছিল না।

রিংবি ছাড়াতে উঁচু উঁচু সাইপ্রাস আর একটি প্রাচীন জুনিপার গাছ। খানিক দূর এগিয়ে পথের পাশে দেচান ফুগ, অর্থাৎ আনন্দ গুহা: একটি অতিকায় পাথরের গহ্বরে অগণন প্রেতাত্মাদের বাস। নদীর পাড় ধরে পথ তেমন কঠিন নয়, ঝর্ণার ওপরে সাঁকো, কোথাও বা পাথরে ধাপ কাটা রয়েছে। ঘর ছাইবার জন্য বনের বাঁশ সংগ্রহ করছে লিম্বুরা।

বেলা একটা নাগাদ দলটি এসে পৌঁছল পাওংতাং। সেখানে একটি জীর্ণ যাত্রীছাউনিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলে দংখাং। এই দংখাংটি এতই নীচু যে ভেতরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, মেঝেয় থিকথিক করছে পিঁপড়ে, আগুনের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। সঙ্গে তাঁবু রয়েছে, কিন্তু গোঁয়াড় কুলিরা কিছুতেই সেটি খাটাবে না। ওদের যুক্তি হল, দংখাং যখন আছেই তখন তার সদ্ব্যবহার হবে না কেন? এর মধ্যে আবার শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এসবের মাঝেই কোনোক্রমে রান্নার ব্যবস্থাও হল।

কাছেই গোপালকদের বসতিতে ফুরচুঙের এক ভাই থাকে। সেখান থেকে দুধ, চীজ, মুরোভা আর খুব সুস্বাদু মাছ কিনে আনল। মুরোভার বিয়ার পান করে পথের শ্রান্তি দূর হবার পর গান শুনতে বসে পড়া গেল। গায়ক দুই কুলি, জোর্দান আর তোনজাং। মোটবাহকের কাজ করলেও আসলে এরা নিজের নিজের গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এদের বহাল করা হয়েছিল একটি বিশেষ কারণে, যাতে যাত্রার আসল উদ্দেশ্য স্থানীয় লোকেদের কাছে গোপন রাখা যায়।

বিজন পাহাড়ের মাঝে জোর্দান আর তোনজাঙের গান শুনে, কয়েক ফোঁটা সুরা কীভাবে পর্বতবাসী মানুষের ভেতর জাগিয়ে তুলতে পারে এক গভীর সংস্কৃতি, সেটি চাক্ষুষ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। রিঞ্চেন তেনোয়া নামে একটি জনপ্রিয় পাহাড়ি গাথা সুর করে গেয়েছিল ওরা।

ঐ মা মা য় ঐ

নানান কাহিনিতে বোনা একটি জালের কেন্দ্রে মাকড়শার মতো ঝুলে থাকে একলা মানুষ। কাহিনির সুতোগুলো একে অপরের সঙ্গে গিঁট বেঁধে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে।

BanglaBook.org

জালগুলো হাওয়ায় দোলে, কখনো তেরছা রোদে বর্ণালি চিকচিক করে। মানুষ কেঁপে ওঠে, ছুটে যায় শিকারের আশায়। এইভাবে ক্রমশ কাহিনির জালের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে মাকড়শার মতো।

বিশ্বের সবচেয়ে নির্জন মানুষটিকেও ঘিরে থাকে এই কাহিনির জাল। এমন একজনের কথা শুনেছিলাম এক বন্ধুর মুখে।

ছোটো দাঁড়টানা ডিঙি নৌকোয় তিনজনে এলাহাবাদে সঙ্গম থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত একটি অভিযানে শামিল হয়েছিল সেই বন্ধু। মাসখানেকের পথ, শীতকাল। পথে নদীপাড়ের বসতি থেকে রসদ সংগ্রহ হচ্ছিল, কিন্তু রাত্রিযাপন ছিল নৌকোতেই। এভাবে বিহারে ঢোকার পর শীতে বিশীর্ণ গঙ্গার এলোমেলো খাত আর কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলে একদিন বেলা ফুরোনোর আগে মাঝনদীর ওপর একটি চরে নৌকো বেঁধেছিল ওরা। বিস্তীর্ণ দিয়াড়ার চর, পলি জমে জমে জল থেকে প্রায় দুই মানুষ উঁচু, অড়হরের চাষ হয়েছে। পেকে ওঠা অড়হরের গাছগুলো হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বাজছিল ঝুমঝুমির মতো, স্থির নদীর ওপর নৌকোয় বসে শোনা যাচ্ছিল। গলুইয়ে কেরোসিনের স্টোভ জ্বেলে রাতের রান্নার ব্যবস্থা করতে করতে শীতের সন্ধ্যা জমাট হয়ে এল। অন্ধকারের ভেতর চরের মাঝে মিটমিট করে জ্বলছিল একটা আলো, যা দেখে পাড়ের থেকে প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি সন্ধ্যাতারা। ভুল ভাঙার পর কৌতূহলের বশে ওরা খেতের ভেতর দিয়ে সেই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে আবিষ্কার করল এক বিচিত্র দৃশ্য। অনেকটা দূরে মাটি দিয়ে উঁচু করা একটি জায়গায় শরে বোনা তাঁবুর আকারে ছাউনি। সেখানে কুপি জ্বেলে এক শীর্ণকায় প্রৌঢ় দুলে দুলে একটি জীর্ণ বই থেকে পাঠ করছে। নদীর চরে কনকনে ঠাণ্ডাতেও তার পরনে একটি মোটা খদ্দরের জামা, চোখে তারের চশমা।

লোকটি ব্রাহ্মণ, গঙ্গার পাড়ে গ্রামে তার ঘর ছিল। বছর দশেক আগে বিধ্বংসী বন্যায় নদীর পেটে চলে গিয়েছে গ্রাম, গ্রামের প্রাচীন মন্দির। সেই মন্দিরের উঠোনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পুরাণকথা পাঠ ছিল তার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি। গ্রামটা ফের গজিয়ে উঠেছে কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু মন্দির আর হয়নি। তারপর থেকে ক্ষত্রিয় ঠাকুরদের ইজারা নেওয়া চরে খেতপাহারার কাজ করে। কিন্তু পুরোনো অভ্যাস ছাড়েনি। এখনও প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে পুরাণ পাঠ করে সে।

চরে দ্বিতীয় মনুষ্যপ্রাণী নেই। চারিপাশে ছায়াচ্ছন্ন অড়হরের গাছগুলো হাওয়ায় মাথা দোলায় ঘোমটা-ঢাকা গ্রাম্য বিধবার মতো। ওর একঘেয়ে সুর করে পড়া কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে যায় পাকা অড়হর বীজের ঝুমঝুম শব্দ।

এরপর বন্ধুরা ফিরে এসেছিল নৌকোয়, রাতের রান্না-খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল গলুইয়ে পলিথিনের ছাউনি টাঙিয়ে। স্থির নদী, চারদিক নিশ্চুপ। উঁচু দেয়ালের মতো চরের আড়াল থাকায় হাওয়া ছিল না একফোঁটা। মাঝরাতে জলে একটা অদ্ভুত ছপছপ শব্দ শুনতে পেল ওরা, নৌকোর কাছেই। ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দেখা যায় না, শব্দও থেমে যায়। আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছিল, জলে চিকচিক করছে তার

BanglaBook.org

আলোর রেখা। ছাউনির ভেতর গিয়ে ঢুকতে আবার সেই ছপছপ ছপছপ শব্দ, ঠিক যেন ভিজে কাপড়ে জল থেকে উঠে আসছে এক নারী।

বাইরে এসে টর্চের জোরালো আলো ফেলতেই রহস্য পরিষ্কার হল। খাবার পর পাড়ের কাছে বাসন ধোয়া হয়েছিল, উচ্ছিষ্ট খাবার পড়েছিল জলে। সেই খাবারের কণা খেতে নদীগর্ভ থেকে উঠে আসছে মাছের ঝাঁক।

অনেক বছর আগে শোনা এই কাহিনি। তখন অযোধ্যায় রামজন্মভূমি নিয়ে বিতর্কে বিভেদে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা উত্তরভারত। এক পুরাণকথার নায়ককে ঘিরে এই উন্মাদনা পশ্চিমবঙ্গে বসে আঁচ করার কোনো উপায় ছিল না। সময়ের প্রেক্ষাপট বন্ধুর অভিজ্ঞতাকে এক বিচিত্র তীক্ষ্ণতা দিয়েছিল, সেই ছবিটা দাগ কেটে গিয়েছিল আমার মনে। অনেককাল পরেও যেন শুনতে পেতাম পাকা অড়হরের ঝুমঝুমিতে মিশে যাওয়া সেই নির্জন কথকের কণ্ঠস্বর, নিশুতি রাতে স্থির নদীতে ক্ষীণ জ্যোৎস্নাচুরচুর জলে ঝাঁক ঝাঁক মাছের পাখনার শব্দ।

শত শত বছর ধরে বয়ে-চলা পাহাড়ি গাথা রিঞ্চেন তেনোয়া, যার মানে হল অমূল্য জপমালা। আটশো বছর আগে ভারত থেকে তাশিলুম্ফোয় গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু সাক্য পণ্ডিত, তিনি মূল তিব্বতি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। উনিশ শতকে হাঙ্গেরিয় পর্যটক কেরোশি চোমা তার কিছু শ্লোক ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। তবে লেপচা লিম্বু ও অন্যান্য ভাষায় মুখফেরতা হয়ে রিঞ্চেন তেনোয়ার গান আজও শোনা যায় সিকিমের পাহাড়ে।

রিংবি উপত্যকায় গোপালকদের ছাউনিতে বসে যে রিঞ্চেন তেনোয়ার গান শুনেছিলেন শরৎ দাস, সেই গান এক শতাব্দী পরে আমি শুনলাম শিংলিলার অভয়ারণ্যে ট্রেকপথে, এক অন্ধ গায়কের মুখে। কুলিদের দলের সঙ্গে চলেছিল মাঝবয়সি লোকটা, নাম তার পুরবা। পুরবার মাথায় গোর্খা টুপি, হাতে একটি সারেঙ্গির মতো তারযন্ত্র ছিল।

হিলে থেকে ভার্সে হয়ে কালিজার যাবার পথে পড়ে একটি শুকনো লেক, নাম দেওনিঙ্গালে ধাপ। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা পিরিচের মতো অঞ্চল, একদিকে একটি পাহাড়ি ঝোরা নেমে এসেছে। বর্ষার পর কয়েকমাস সরোবরের মতো হয়ে থাকে জায়গাটা। আমরা যখন গেলাম তখন মার্চ মাস, জল সরে গিয়ে একধরনের ঘাসের শুকনো হলুদ গালিচা বিছিয়ে রয়েছে, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। সেই শুষ্ক লেকের বিছানায় আমাদের তাঁবুগুলো পড়েছিল সারি দিয়ে। একদিকে সরু বাঁশের বন, যার নাম দেওনিঙ্গালে, স্থানীয় মানুষদের কাছে পবিত্র। ওপরদিকে রডোডেনড্রনের বন। তখন ফুলের মরশুম, থোকা থোকা রক্তলাল পাপড়িগুলো ভেসেছিল কুয়াশার স্যুপে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই হাওয়া বইতে শুরু হল, কুয়াশা মুছে গিয়ে আকাশ পালিশ হয়ে এল। সেইসঙ্গে এঁটে বসল ঠাণ্ডার কামড়। তাঁবুর ধারে আগুন জ্বালা হয়েছিল, যদিও সেটা

BanglaBook.org

বিপজ্জনক কারণ হাওয়ায় আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে যাচ্ছিল শুকনো ঘাসে। যতটা সম্ভব ঘন হয়ে হাওয়ার পথে দেয়াল তুলে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, ঠাণ্ডায় অসাড় হাতগুলো বাড়িয়ে উত্তাপ ভাগ করে নিচ্ছিলাম। আগুনের উল্টোদিকে বসে পুরবা শুনিয়েছিল রিঞ্চেন তেনোয়ার গাথা। তার কয়েকটি কলি অনুবাদ করলে দাঁড়াবে এইরকম:

উপস্থিত সকলে শোন মন দিয়ে
ঈগল হল পাখিদের রাজা
যখন সে ওড়ে, সবাই ওড়ে
সিংহ রাজা পশুর, যখন সে লাফায়
লাফ দিয়ে ওঠে বুঝি জগৎ সংসার
আর সুরা পান যে করে, সে হল বাণীর রাজা
যখন সে কথা বলে, সবাই মন দিয়ে শোনে তার কথা।*

একটি প্যাকিংবাক্সের ওপর জানু পেতে বসে গাইছিল পুরবা, তারযন্ত্রটি চিবুকে চেপে ধরা ছিল। আগুনের আভায় ওর মুখে বলিরেখা দপদপ করছিল। মাঝে মাঝে সুরের দমকে মুখ তুলছিল আকাশে, ফনফনিয়ে ওঠা আগুনের ফুলকি প্রতিফলিত হচ্ছিল ওর অন্ধ চোখের মণিতে। পাহাড়ের ওপরদিকে বড়ো বড়ো ওক আর মেপলের মাথা হাওয়ায় দুলছিল। তাঁবুর ভেতর স্লিপিংব্যাগে ঢুকে পড়ার পরেও মেস টেন্টের থেকে, যেখানে রাতে কুলিরা থাকত, ভেসে আসছিল ওর গান। ক্রমশ সেই স্বর হারিয়ে গেল চমরির গলার ঘণ্টাধ্বনিতে। অতিকায় রোমশ জন্তুগুলো ভারি মালপত্র বয়ে নিয়ে যেত, রাতের বেলা ওদের ছেড়ে রাখা হত তাঁবুর আশেপাশে।

হিলে থেকে শিংলিলা স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর দিয়ে নেপালের সীমান্ত ছুঁয়ে উত্তরে পর্যন্ত চার দিনের ট্রেক। প্রতিদিন কঠিন চড়াই উৎরাই পথে যাত্রার পর সন্ধ্যাবেলা গান শোনাতো পুরবা— কখনো মেস টেন্টের ভেতর, কখনো খোলা আকাশের নীচে আগুনের ধারে। সকালে প্রাতরাশের পর আমরা চলা শুরু করার আগে তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে প্রথম কুলিদের যে দলটি বেরিয়ে যেত পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, তাদের সঙ্গেই যেত সে। চোখের দৃষ্টি ছাড়া একটি মানুষ কীভাবে ওই অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি পথে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলছিল সে এক বিস্ময়। জন্মান্ধ ছিল পুরবা, অভয়ারণ্যের ধারে গুরুঙদের গ্রামে ওর বাড়ি। জিজ্ঞেস করলে বলত, ইয়াকের ঘণ্টার শব্দ শুনে পথ আন্দাজ করে

---

* আমাদের সেই ট্রেকদলে ছিলেন এক বর্ষীয়ান সমাজবিদ্যার অধ্যাপক, কানাডার মানুষ। গানের সারমর্ম শুনে তিনি বললেন প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি বিরল জনজাতির মধ্যে কুলপতি নির্বাচনের বিচিত্র পদ্ধতির কথা। কুলপতি পদপ্রার্থীরা সবাই মাচার ওপর গোল হয়ে বসে, মাঝখানে থাকে একটি সুরাভর্তি পানপাত্র। প্রত্যেকে চুমুক দিয়ে হাতে হাতে ঘোরাতে থাকে সেটি। সেইসঙ্গে চলতে থাকে সমাজের হিত বিষয়ে আলোচনা। সুরা ফুরিয়ে গেলে ফের ঢেলে দেওয়া হতে থাকে। এইভাবে শেষপর্যন্ত যে মানুষটি সহবৎ মেনে মদ্যপান করে স্পষ্ট উচ্চারণে প্রাসঙ্গিক কথা বলে যেতে পারে, সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে, তাকেই কুলপতি হিসেবে নির্বাচন করে সমাজ।

BanglaBook.org

নাকি চলত। ওর ছেলেবেলা কেটেছে এইসব জঙ্গলে গোপালকদের সঙ্গে ঘুরে। বেশ কিছুকাল হল সরকারি বনবিভাগ থেকে অভয়ারণ্যে গোচারণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও এই পাহাড় জঙ্গলের সব পায়ে-চলা পথ, সব তৃণভূমি, ঝর্ণা, বোল্ডার আর পাহাড়ের শিরা পুরবার স্মৃতিতে খোদাই হয়ে গিয়েছে স্পর্শ-গন্ধ-ধ্বনির এক বিচিত্র মানচিত্রে।

শরৎচন্দ্র দাস কিংবা হুকারের লেখায় এইসব অঞ্চলের পাহাড় জঙ্গল ঝর্ণা উপত্যকাভূমির বর্ণনা জারণ হয়ে চলেছিল মাথার ভেতরে। দার্জিলিঙে পরবাসের দিনগুলোয়, দিনের পর দিন ঘাতক বর্ষার মাঝে, যখন স্যাঁতসেঁতে সীসেরং আলোয় বিভিন্ন প্রহর একাকার হয়ে যায় আর স্নায়ুতে বেজে যায় একটানা বৃষ্টির শব্দ, যখন মনের কোণে বেগনি ছত্রাকের মতো গজায় মৃত্যুভাবনা, মধ্যরাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে থকথকে সজীব কুয়াশার ভেতর ফানুসের মতো বিস্ফারিত হয়ে থাকে শহরের আলো, শিশির জমে ওঠে ভুরুতে, চোখের পাতায়, তখন মনে পড়ে যায় এই বিভ্রমের ওপারে রয়েছে সেই অরণ্যপাহাড়, যার ভেতরে দিয়ে পথ করে নিয়ে গিয়েছে এক বাঙালি যুবক, একশো বছরেরও বেশি আগে। সুযোগ পেলেই শহরের আশেপাশে জড়িয়ে থাকা হুকার ট্রেল ধরে বেরিয়ে পড়ি আমি।

প্রকৃতিবিদ জোসেফ ডাল্টন হুকার দার্জিলিঙের পাহাড়ে এসেছিলেন ১৮৪৮ সালে। শিংলিলা-র বনপাহাড় ধরে টংলু পেরিয়ে সিকিম ও পূর্ব নেপাল হয়ে তিব্বতের পথে গিয়েছেন তিনি। বছর তিরিশ পরে এই পথে যাবেন শরৎ। শিংলিলার অরণ্য প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে হুকারের হিমালয়ান জার্নালে। উনিশশো নব্বইয়ের দশকে দেখি সেই ছবি আমূল বদলে গিয়েছে: ঘন আদিম অরণ্য হারিয়ে গিয়ে ছেয়ে এসেছে চা-বাগান, জাপান থেকে আমদানি করা পাইনগাছ শাসন করছে পাহাড়ের আকাশরেখা। কিন্তু তবুও একই রয়েছে সিলভার ফারের পাতার নীচে নীলাভ ভেলভেট, পাথরের গায়ে অভ্রের শিরা, কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রথম অনির্বচনীয় আলো, দূরাগত গোল্ডেন ঈগলের ডাক, জুনিপার কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ... সেইসব, যা ছড়িয়ে আছে হুকারের জার্নালের পাতায়।

প্রথম গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সবে শেষ হয়েছে, জঙ্গলের ধারে পোড়া বনবাংলোগুলো দাঁড়িয়ে আছে তার সাক্ষী হয়ে। এই সময়ে লেপচা জনজাতির ওপর গবেষণা করতে দার্জিলিঙে এল জুলিয়া গ্রিফিথ নামে এক ব্রিটিশ তরুণী। লোরেটো কলেজের প্রিন্সিপাল মাদার ডেমিয়েনের অফিসে আলাপ হয় তার সঙ্গে। জুলিয়ার কাজের সূত্রে ওর সঙ্গী হয়ে দার্জিলিঙের আশেপাশে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছি এবং একবার তাঁবু কুলি গাইড সঙ্গে নিয়ে শিংলিলার অরণ্যের ভেতর আদিম লেপচা বসতির সন্ধানে গিয়েছিলাম আমরা। সেবার পথ হারিয়ে নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু জুলিয়ার নেপালে প্রবেশের ছাড়পত্র না থাকায় বেশিদূর যাওয়া যায়নি। তখন দেখেছিলাম, ওই অঞ্চলে জঙ্গল আরও ঘন আর দুর্ভেদ্য, প্রকাণ্ড আদিম মহীরুহ ক্যাথিড্রালের মতো

BanglaBook.org

ডালপালা ছড়িয়ে আকাশ ধরে রেখেছে। হুকারের জার্নালে পড়া বর্ণনার সঙ্গে সেই স্মৃতি জড়িয়ে গিয়ে একটা আবছা কামনা হয়ে রয়ে গিয়েছিল মনের এক কোণে, একটা ছমছমে হাতছানির মতো। ক্রমশ আরো অজস্র অপূর্ণ বাসনার ভীড়ে হারিয়ে গিয়েছিল সেটা। তারপর একদিন আমিও দার্জিলিং থেকে বদলি হয়ে চলে এলাম। তবু কখনো নাগরিক ব্যস্ততার মাঝে ক্লান্ত মুহূর্তে, লোকাল ট্রেনের দমবন্ধ ভিড়ে, মিছিলে যানজটে আটকে পড়ে হঠাৎ কখনো সেই ছবিগুলো ভেসে আসত ব্যাকুল সাইরেনের মতো।

এর মধ্যেই একটা সুযোগ এসে গেল। সিকিম পর্যটন দপ্তর থেকে আয়োজন করছে একটি ট্রেক, শিংলিলা অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে দিন পাঁচেকের হাঁটা, পথে তাঁবুতে রাত্রিবাস। কলকাতার মিডলটন স্ট্রিটে ওদের অফিসে নাম লেখাতে গিয়ে জানতে পারলাম বেশ বড়ো মাপের আয়োজন, সরকারি পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ, যাকে বলে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং কিছু বিদেশি পর্যটক যোগ দিচ্ছে এই ট্রেক প্রোগ্রামে। তখন মার্চ মাস, নানান প্রজাতির রডোডেনড্রনের বনে রঙের দাঙ্গা লেগেছে শিংলিলায়। মানচিত্রে চিহ্নিত যে ট্রেকের পথ, সেই অঞ্চল দিয়েই একদা গিয়েছেন শরৎ দাস। তারও আগে গিয়েছেন হুকার সাহেব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাত

তাশিলুম্ফো

১৬ নভেম্বর, ১৮৮১। পাহাড়ের আড়ালে ইয়াম্পুং দোক এসে পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেল। আগের দিন রিংবি ছাড়ার পর ঘন বনের ভেতর নিশিযাপন হয়েছিল। সেখানে ভালুক শুয়োর আর সিকিমি চিতার বাস। সারাদিন টিয়ারং ফেজেন্টের কুজনে মুখরিত হয়ে থাকে। দুর্গম গিরিপথের চড়াই ধরার আগে মোট কমাতে তাঁবুটা দার্জিলিঙে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল দুই কুলির সঙ্গে। অগত্যা গাছের ডালে পাথরে বিছানার চাদর টাঙিয়ে ছাউনি হল। আমিষ রসদ বেঁধে রাখা হয়েছিল উঁচু গাছের ডালে। রাতভর সেখান পেঁচা আর ইঁদুর দলের হানাদারি চলল।

বরফ পাহাড়ের গায়ে সকালের সূর্যালোকে ঝিকিমিকি ইয়াম্পুং দোক দূর থেকে ভারি সুন্দর দেখায়। দূরবীন চোখে না লাগিয়েও আলাদা করে চেনা যায় চমরির ছাউনি আর বসত কুঁড়েগুলো। নীল আকাশে প্রার্থনার ধ্বজা উড়ছে। গ্রামের পথ গিয়েছে পাথর-বাঁধানো নীচু লম্বা মেন্ডঙের পাশ দিয়ে।

কিন্তু গ্রামে পা রাখতে এক করুণ শুনশান ছবি। জনপ্রাণী নেই, ভেড়া, কুকুর চমরি কিছুই নেই। কুঁড়ের চালে ধ্বজার ডগায় ক্ষুধার্ত দাঁড়কাক ডাকছে। ভারি পাথরের দেয়াল আর মোটা পাইনের গুঁড়ির ছাত, অপটু হাতে তৈরি এক ডজন ঘর নিয়ে গ্রাম। প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ, দড়িবাঁধা, ভেতরে ডাঁই করা বুনো লতা, যা দিয়ে লাল রং তৈরি হয়।

গরমের কালে বরফ গলে যাবার পর পুব নেপালের ব্যাপারীরা আসে এখানে, লবণের বিনিময়ে লতার বান্ডিল নিয়ে যায়। ফুরুং জানাল।

গ্রাম ছাড়িয়ে পাথরের খাঁজে বিচিত্র ছত্রাকের আকারে মৌচাক দেখা যায়, তারপরেই শুরু হয় কঠিন চড়াই। অক্টোবরেই ভারি বরফ পড়েছে এবার, ওপরের দিকে গিরিপথগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এগোতে নিষেধ করেছিল রিংবির গ্রামবাসীরা। অনেকটা পথ ওঠার পর ওদের সেই সাবধানবাণী হৃদয়ঙ্গম হল। তিনদিকে আকাশ জুড়ে শ্বেতশুভ্র ঢেউয়ের মতো কেবল বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, উত্তরের গিরিশিরায় ছেয়ে এসেছে কাংচেন শৃঙ্গের হিমবাহ। অনেক নীচে গভীর খাতের ভেতর সগর্জনে লাফিয়ে ছুটেছে রিংবি।

দু-লা পাস পৌঁছে উগেনের মাথা-ঘোরা শুরু হল। এদিকে প্রবল ঝঞ্ঝার দাপট।

BanglaBook.org

অসহায় আছড়ে পড়ল এক কুলি, তুষার-কামড় ধরল তার পায়ে। নিজের জুতো আর কাবুলি মোজা খুলে ওকে দিয়ে নতুন তিব্বতি বুটজোড়া পরে নেয় শরৎ।

তাজা তুষারপাতে সম্পূর্ণ ঢেকে রয়েছে পথ, অগত্যা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ডানা ধরে সন্তর্পণে এগোতে হয়। এখানে কঠিন বরফ, বিপদ পদে পদে— পা টিপে, কখনো চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোনোক্রমে চলা।

যে খাত ধরে আমরা চলছিলাম সেটি এতই গভীর যে তার আঁকাবাঁকা পথের দিকে তাকিয়ে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল, লিখছেন শরৎ। ওপর দিকে ওঠার থেকেও এখানে ঢের বেশি বিপজ্জনক উৎরাই বেয়ে নামা। কুলিরা আমায় পেছনে ফেলে অভ্যস্ত পায়ে নেমে গেল দ্রুত।

অনেকটা নামার পর ক্রমশ একটি উপত্যকা গোচরে এল— প্রায় দু হাজার ফুট নীচে, ঘন পাইনের অরণ্যে ছাওয়া। একটি শুকনো হিমবাহের কাঁকরে পথ ধরে দীর্ঘক্ষণ চলার পর সন্ধ্যা ছটার সময় পৌছন গেল গুমোতাং-এ।

অপরূপ গিরিখাত গুমোতাং ; এদিক ওদিক ছোটো ছোটো চারণভূমি, ন্যাড়া পাহাড়চুড়োর নীচের দিকে জুনিপারের বন, খাতের ও-প্রান্ত থেকে বরফগলা জল এসে জমেছে একটি জলাশয়ে— নাম লাচাম পোখরি, অর্থাৎ সৌভাগ্যের জলাশয়। মাইলখানেক পরিধির জলাশয়ে জলের রং ঘন কালো। এখানে জলের অন্তঃপুরে মণিমাণিক্য আছে, কুলিরা জানায়, আর আছে জলহস্তীর পাল।

১৯ নভেম্বর। সকালবেলায় একটি হাঁটুডোবা জলধারা পেরোতে শুরু হল বোগতো লা-র চড়াই। শুকনো হিমবাহের খাত ধরে পথ উঠে গিয়েছে দুধারে ফার আর জুনিপারের বন। বালি-কাঁকরের ওপর দিয়ে বইছে একটি শীর্ণ জলের ধারা। বোগতোয় বিজন শূন্যতার মাঝে ছোট্ট একটি দংখাং, অর্থাৎ যাত্রীছাউনি, তারপরেই পথ ভাগ হয়ে গিয়েছে দুদিকে। জলধারার পাশ দিয়েই চলছিল দলটা। ইয়াম্পুং-এর গোপালক কিংবা ইয়াংমার লবণ ব্যাপারীরা সাধারণত এই পথ ব্যবহার করে না। এক ধরনের বিষাক্ত লতা জন্মায় এখানে, যাতে মুখ দিলে ভেড়া কিংবা চমরিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি মারাও যায়। কিন্তু অসংখ্য ফেজেন্ট দেখা গেল সারা পথ জুড়, রডোডেনড্রনের ফল ঠুকরে খাচ্ছে। দূরে বুনো ভেড়ার পালের দেখাও মিলল এক ঝলক। শিখরে ওঠার আগে রডোডেনড্রন আর জুনিপার হারিয়ে গেল ক্রমশ, পাথরের খাঁজে লাইকেন আর শ্যাওলায় প্রাণের চিহ্ন।

গত কয়েক দিন ধরে শুধুমাত্র সিদ্ধ ভাত আর নুন চা ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। বোগতো লা-র কঠিন পাস পেরোবার মতো শক্তি ছিল না দেহে, লিখছেন শরৎ। কুলিগুলোর অবস্থা আরও করুণ, বিপুল মালের বোঝা রয়েছে একেকজনের পিঠে। বাতাসে ছুরির ধার, আকাশে মেঘের পাল ছুটেছে বুনো চমরির মতো, এতটাই নীচু দিয়ে বুঝি হাত বাড়ালে ছুঁয়ে ফেলা যাবে। অবশ দেহ কোনোক্রমে হিঁচড়ে টেনে উঠতে থাকি ওপরের দিকে— মাথা বনবন করে ঘুরছে, তীব্র বমির ভাব। একসময় ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

পাসের মুখ পর্যন্ত বাকি পথটা ফুরচুং পিঠে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল শরৎকে। কুলিদের মধ্যেই কেউ একটু চা বানিয়েছিল, কিন্তু শরতের খাবার অবস্থা ছিল না। ঠান্ডায় জমে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছিল, মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফুরচুং জোর করে একটি হিমজমাট ডিম আর কিছু শুকনো ফল খাইয়ে দিল। সর্বাঙ্গ কম্বলে জড়িয়ে গুটিসুটি অবস্থায় মালের গায়ে দেহ ঠেসিয়ে রাখা হল, যাতে গড়িয়ে পড়ে না যায়। এভাবেই রাত্রিটা কোনোক্রমে কাটিয়ে দিল শরৎ।

মাঝরাতে থালার মতো চাঁদ উঠেছিল মেঘমুক্ত আকাশে। সাদা বরফের সেই আলোর বিকীরণে অপার্থিব হয়ে পড়েছিল চারিদিক। অস্ফুট তন্দ্রার ভেতর দূর পাহাড়ের গা থেকে ভেসে আসছিল হিমবাহ ঝরে পড়ার বিচিত্র হাড় হিম-করা শব্দ।

সকালে ফের ফুরচুঙের কাঁধে চেপে প্রাণান্তকর গিরিপথ টপকে হাজার দুয়েক ফুট নেমে আসার পর একটি ঘাসে ছাওয়া উপত্যকায় পৌঁছনো গেল। চারপাশে খর্বাকৃতি রডোডেনড্রনের বন আর বড়ো বড়ো ফার্ন। পাখি ডাকছে। এক আশ্চর্য শান্তি বিরাজ করছে।

প্রভুকে পিঠ থেকে নামিয়ে নীরবে হাঁটু মুড়ে বসে বার কয়েক মাথা ছোঁয়ায় ফুরচুং। কোনো দেবতা নেই, পাথর নেই। নিজের গলায় একটি লকেট চুম্বন করে দুই চোখে ছোঁয়ায়।

—আমার পরিবারের কাছে এ হল পবিত্র ভূমি, ফুরচুং বলে। ঠিক এই জায়গাটায় আমার বাবা চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল। ফিরিয়ে দিয়েছিল এক সাহেব। সে অনেক কাল আগের কথা। আমি তখন এইটুকু।

দুটো হাত প্রসারিত করে একটি শিশুর আকার দেখায় ফুরচুং। তারপর নিজের গলার লকেটটি খুলে দেয় শরতের হাতে।

—এই মেডেলটা আমায় দিয়েছিল সাহেব।

একটি রুপোর ফার্দিং, রাজা চতুর্থ জর্জের মুখ খোদাই করা, রোমান হরফে সাল লেখা রয়েছে আঠেরশো বিয়াল্লিশ।

ক্ষীণ মোহ

৫ ডিসেম্বর, ১৮৪৮। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায় জোসেফ ডাল্টন হুকারের। ছিপ ছিপ করে শব্দ হচ্ছে তুষারপাতের মতো, কিন্তু বাইরে মুখ বাড়িয়ে বোঝা যায় না কিছু। রডোডেনড্রনের বনে তাঁবু ফেলা হয়েছিল, পাতার ফাঁক দিয়ে ডোরাকাটা আলো এসে পড়েছে কুয়াশার গায়ে। তারপরেই দেখা যায় ওদের: নিঃশব্দে সারি দিয়ে হেঁটে আসছে পরিযায়ী মানুষের একটি দল, সঙ্গে ভেড়ার পাল। বড়ো, খচ্চরের আকৃতির ভেড়াগুলো, প্রতিটির পিঠের দুপাশে ঝুলছে নুনের বস্তা। শুকনো ঝরা পাতার স্তূপে খুরের শব্দ হচ্ছে তুষারপাতের মতো। বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ রয়েছে দলে,

BanglaBook.org

সকলের পরনে ভারি তিব্বতি পোশাক। চলার পথে ভেড়াগুলো মুখ নামিয়ে রডোডেনড্রনের শিকড়ে একধরনের পরজীবী আগাছা খায়, দাঁড়িয়ে পড়লে কেউ একজন জিভে অস্ফুট আওয়াজ করে এগিয়ে নেয় ওদের। এছাড়া কেউ কোনো কথা বলে না, নাকমুখ দিয়ে হিমেল শ্বাস বের হয় কেবল। ভোরের পলকা আলোয় স্বপ্নদৃশ্যের মতো মনে হয়। বনের মধ্যে তাঁবু পড়েছে, কিন্তু একটিবারের জন্যেও কেউ থামে না কিংবা ফিরে তাকায় না। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে পথের দিকে। কেবল একটি মেয়ে, কোলে চামড়ার চেবু জড়ানো শিশু, ঘাড় ফেরাতে চকিতে চোখাচোখি হয় জোসেফের সঙ্গেঃ চেরা চোখে তীক্ষ্ণ ঔৎসুক্য আর দুটি সরু বিনুনি পশমি টুপির ভেতর থেকে নেমে এসেছে ঘাড়ের ওপর। চলতে চলতে বারকয়েক পিছন ফিরে তাকায় সে। ক্রমশ গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে যায় দলটা, কুয়াশা ফিকে হয়ে আসে, স্নো ফেজেন্টের ডাক শোনা যায়। খাদের থেকে ক্রমশ সপ্তমে উঠতে থাকা শিসের মতো ডাকঃ ভোরের এই সময়টায় ঘাসের ডগায় শিশির পান করতে নেমে আসে ওরা। জোসেফ ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

ঘুম ভাঙল বেলায়। ইতিমধ্যে কুলিরা উঠে পড়েছে। তাঁবু গুটিয়ে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে ফের শুরু হয় পথ চলা।

চুঞ্জরমা গিরিপথ টপকে ইয়ারলুং উপত্যকার দিকে যাচ্ছিল জোসেফ। পথে নতুন নতুন উদ্ভিদের চারা সংগ্রহ ও সেগুলি নিরীক্ষণের কাজ চলছিল। শীত এসে গিয়েছে, দশ হাজার ফুটের ওপর পুষ্পল উদ্ভিদ বেশিরভাগ শুকিয়ে গিয়েছে, বীজগুলো ঘুমিয়ে গিয়েছে মাটিপাথরের কবরে। পাহাড়ের কোলে শুকনো পোখরির মতো জলাশয়ের মাঝে বোল্ডারের নীচে, বেঁটে রডোডেনড্রন আর জুনিপারের ছায়ায় প্রিমরোজ অ্যানিমোন আর পোটেন্টিলার বিশুষ্ক অবশেষ ছড়িয়ে আছে অঢেল। দেখেই বোঝা যায় গ্রীষ্মের তিনটি মাস গোটা উপত্যকা জুড়ে নানা রঙের ফুলের দোলা লেগে থাকে।

গ্রীষ্মে গোটা উপত্যকাটাই নানা বর্ণের ফুলে ছেয়ে থাকে সন্দেহ নেই। জোসেফের সঙ্গে রয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ একটি ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারঃ থার্মোমিটার, সেক্সট্যান্ট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীন থেকে শুরু করে নানা ধরনের কম্পাস, জরিপের বিবিধ যন্ত্র, কীটপতঙ্গের বাক্স, এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ফুল আর বীজ সংরক্ষণের সরঞ্জাম। চলার পথে সারাদিন নমুনা সংগ্রহ ও নিরীক্ষণ চলে, সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে সেগুলি নথিকরণ, চিত্র অঙ্কন, অনুপুঙ্খ নোট নেওয়া। উদ্ভিদ আর প্রাণীজগৎ ছাড়াও ভূবৈচিত্র্য, পাথরের চরিত্র আর আবহাওয়ার বিভিন্ন খুঁটিনাটিতে ভরে উঠতে থাকে জার্নালের পাতা।

হিমালয়ের অনুসন্ধানকারীরা সাধারণত ভোরবেলায় যাত্রা শুরু করে দুপুরে আবহাওয়া অস্বচ্ছ হয়ে ওঠার আগেই পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে। জোসেফ ব্যতিক্রম। সকালে তরতাজা শরীরমনে তাঁবুর কাছেপিঠে প্রকৃতিপাঠ চলে তার। তারপর বেলায় ভারি প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে দিনের চলা শেষ হয় বিকেলের পর। সেখানে ইতিমধ্যেই তাঁবু সাজিয়ে ফেলেছে অনুগত ভৃত্য আর কুলিরাঃ প্যাকিং বাক্সে তৈরি

BanglaBook.org

টেবিল, ওপরে পরিপাটি লেখার সরঞ্জাম ও মোমবাতি— রাতে পোকার উপদ্রবের জন্য কাচে ঢাকা সেটি। বাইরে কোনো বড়ো গাছের নীচে রান্না চাপিয়েছে ব্যক্তিগত পাচক। ডিনার বলতে মূলত সিদ্ধ ভাত ও আলু*, ভেড়ার স্টু, বিস্কুট আর চা। ক্বচিৎ মুখ বদলাতে টিনের ট্রাফল (ছত্রাক) ও শুকনো খেজুর। সন্ধ্যা থেকে কাজ করতে করতে রাত গড়িয়ে যায়।

সেদিন বেলা বাড়তে আকাশে গম্বুজাকার মেঘ জমতে শুরু হল, প্রথমে সিরি তারপর স্ট্র্যাটাস, বাষ্পবাহী দখিনা বাতাস পাক বেঁধে উঠতে লাগল দ্রুত। বিজন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়েছে পথ, নীচু চক্রাকারে সোনালি ঈগল উড়ছে। চলতে চলতে জোসেফের মনে আবছা স্বপ্নদৃশ্যের মতো ঝাপটা দিয়ে যায় এক তরুণী নারীমূর্তি: তার বাঁকা ছুরির মতো চোখের চাহনি উৎসুক, রহস্যময়; কোলে শিশু।

বিকেলের আগে দলটির দেখা মিলল ফের। বনের প্রান্তে ঘাসে ছাওয়া একটুকরো জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা, পাতার আগুন জ্বেলে চা বানাচ্ছিল। ভেড়াগুলো চরছিল আশেপাশে। জানা গেল, ওরা ওয়ালাংচুন থেকে চলেছে ইয়ালুং-এর পথে।

জোসেফদের তাঁবু পড়েছিল কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ওর স্বামীর চোখের জন্য ওষুধ চাইতে এল।

মেয়েটি সুদর্শনা— হুকার লিখছেন, আমার জন্য উপহার স্বরূপ এনেছিল নস্যি। এই ডিসেম্বরে চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় শিশুটি সম্পূর্ণ নগ্ন, প্রখর সূর্যের তাপ পেয়ে উষ্ণ হয়ে আছে।

দীর্ঘ সময় বরফে তাকিয়ে থাকার কারণে সাময়িক দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিল ওর স্বামী। জোসেফ ওষুধ দেয়, শিশুটির গলায় ঝোলাবার জন্য দেয় একটি ফার্দিং। চকচকে রুপোর মুদ্রা পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে মেয়েটির মুখ। এর আগে কখনো শ্বেতাঙ্গ দেখেনি এরা। মেয়েটি অবাক চোখে খুঁটিয়ে দেখছিল জোসেফের চামড়া, চোখ আর চুলের রং। এতরকম বিচিত্র যন্ত্রও কখনো দেখেনি। তাঁবুর ভেতর ঘুরে ঘুরে নিঃশব্দে নেড়েচেড়ে দেখছিল সে। কোনোরকম জড়তা ছিল না।

হাতছানি দিয়ে ডাকতে এগিয়ে আসে। কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ি ওর কানে চেপে ধরতে তরুণ মুখে ফোটে তীব্র বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। কিন্তু স্প্রিং-আঁটা গোটানো ফিতেটা তুলে চাবি টিপতেই গোল বাঁধল। চামড়ার বাক্সের ভেতর থেকে পাক খুলে সাপের মতো

---

* ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশে তিব্বত যাত্রার সময় সঙ্গে করে আলুর বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন জর্জ বোগল। চলার পথে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সেই বীজ পুঁতেছিলেন তিনি। তার প্রায় পঁচাত্তর বছর পরে হুকারের দিনলিপিতে, কিংবা আরও পরে শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্তে হিমালয়ের প্রত্যন্ত গ্রামে আলু চাষের উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে বোগল ছাড়া আর কারোর সক্রিয় ভূমিকা ছিল কি না জানা যায় না, যদিও হুকার লিখছেন তিব্বতে আলুর চাষ শুরু হয়েছিল নেপালে ইংরেজদের বাগান থেকে। আজও এই অঞ্চলের পাহাড়ে এক বিশেষ ধরনের আলু পাওয়া যায়, টকটকে লাল ও অতীব সুস্বাদু।

BanglaBook.org

সশব্দে ইস্পাতের ফিতেটা বেরিয়ে আসতে মাতাপুত্র একযোগে প্রবল আর্তনাদ করে তাঁবু ছেড়ে ছুট লাগায়।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দেখা উদ্ভিদ পাথর মেঘ পাখি হিমবাহের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাঝে এক ফোঁটা উষ্ণ মানবিক ছবি সময়ের বাধা সরিয়ে মন ছুঁয়ে যায়। দার্জিলিং থেকে উত্তরে সিকিমের ভেতর দিয়ে তিব্বতযাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন জোসেফ হুকার, সেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে। পরে একাধিক পর্যটক অনুসরণ করবে তাঁর পথ। তবে তিরিশ বছর পরে শরৎচন্দ্র দাস হুবহু সেই পথ ধরেননি। কখনো সমান্তরাল, কখনো অপসারী, কখনো আবার পরস্পরে মিলিত হচ্ছিল দুজনের পথ, অনেকটা দুই পাহাড়ি নদীর মতো। আখ্যানের নদী, পাথর জল পাতা বরফ সূর্যাস্ত আর পাখির ডাকে বোনা মানচিত্রের ওপর প্রবাহিত। কথনের মানচিত্র, শত বছর পরেও যার থেকে নিষ্ক্রমণ নেই কোনো অভিযাত্রীর।

রিংবি পেরিয়ে এসে ইয়াম্পুং দোক নামে যে শুনশান বসতি দেখল শরৎ, প্রায় তেমনই এক গ্রামে জোসেফ পা রেখেছিল ইয়াংমা উপত্যকায়। ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের ওপর খানিকটা সমতলভূমি, হিমবাহের সঙ্গে গড়িয়ে আসা বড়ো বড়ো পাথর, তার মাঝে গ্রাম ; কাঠ-পাথরে গোবরমাটি লেপা গুটিকয় কুঁড়ে জোট বেঁধে আছে। একসারি বেঁটে চোর্তেন, ধ্বজা উড়ছে, ঢালের দিকে পাথরে ঘেরা ছোটো ছোটো জমিতে চাষ হয়েছে।

এখান থেকে উপত্যকাটা দুভাগে ভাগ হয়েছে ; একটি শাখা গিয়েছে উত্তরপূর্বে বরফাবৃত পাহাড়ে, অন্যটি উত্তরপশ্চিমে কাংলাচেন গিরিপথে। এই উচ্চতায় জুনিপার গোত্রীয় গাছ হয় না। দৃশ্যপট নিষ্করুণ, কিন্তু জমকালো আর কৌতূহলোদ্দীপক— হুকার লিখছেন। হিমবাহের প্রবাহে ভেসে আসা মোরাম চারদিকে, শুকনো প্রাচীন লেকের বিছানায় সবজে-বাদামি উদ্ভিদ, অতিকায় সব পাথরের চাঙড় আর আকাশের গায়ে অসংখ্য তুষারশৃঙ্গ প্রহরীর মতো। উত্তরপশ্চিমে ১৮ হাজার ফুট উঁচু নাঙ্গোর শীর্ষ থেকে নেমেছে এক সুবিশাল হিমবাহ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জালিকার মতো অসংখ্য ভাঁজ তার গায়ে, খালি চোখেও দেখা যায়, বরফ গলে জল নামার পথ, পলকা স্বচ্ছপ্রায় ছায়ায় সুস্পষ্ট রেখার জট যা অবর্ণনীয়।

আর এই আশ্চর্য দৃশ্যপটের মাঝে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বসতিটাকে দেখে মনে হয় বুঝি মরীচিকা, মৃত কিংবা ঘুমন্ত, প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও।

নীচে শুকনো চাষের জমিতে তাঁবু ফেলা হয়েছিল। পরদিন সকালবেলায় গ্রাম দেখতে গেল জোসেফ। পুরো বসতিটায় দীর্ঘ শীতঘুম শুরু হয়ে গিয়েছে যেন। ফসল ঘরে তোলা হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল থেকে এনে ডাঁই করা হয়েছে জ্বালানি কাঠ, চমরির দুধে জমানো চিজ শুকনো হয়ে এসেছে, গিরিপথ বরফে ঢাকা, মাটি জমে ফ্লিন্ট পাথরের মতো হয়েছে। বড়ো বড়ো বোল্ডারের ফাঁকে গায়ে গায়ে ঠাসা মৌচাকের মতো

BanglaBook.org

কুঁড়েগুলো, মাটিতে অর্দ্ধেক ডোবা, ফাঁকফোকর দিয়ে সরু গলিপথ। ভেতরে ঢুকতে নীচু চালের নিচে খুপরি দিয়ে ধোঁয়াটে বাতাস লাগে মুখে, ভেসে আসে চিজের টোকো গন্ধ। প্রতিটি কুঁড়ের নীচতলায় ভর্তি শুকনো জুনিপার কাঠ, চমরির গোবর আর পশম। মই বেয়ে ওঠা দোতলায় ছোটো ছোটো কুঠরিতে মানুষের বাস। বাইরের আলো এসে ঢোকে না, আঙিঠির আগুনে আলোকিত। একেকটি ঘরে অনেকগুলো ছায়াচ্ছন্ন নারী পুরুষ শিশু সেঁধিয়ে রয়েছে— ঝিমোচ্ছে, পশম বুনছে, কিংবা হাতের জপমালা ঘুরিয়ে চলেছে। আগামী চারটে মাস এভাবেই কাটবে এদের, পাহাড়ি ইঁদুরের মতো শীতঘুমে, বাইরে ছেয়ে থাকবে মৃত্যুশীতল নিস্তব্ধতা। চমরিগুলো কেবল ছাড়া থাকবে খোলা আকাশের নীচে, পায়ের নীচে বরফ, পিঠে পুরু রোমের কম্বলে বরফ, তাদের গলার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাবে পাথরের খাঁজে সবুজের চিহ্ন থাকবে যতদিন। দিনের আলো ফুরোনোর আগে প্রতিদিন মেয়েরা কাঠের বালতি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে শিস দিয়ে ডাক দেবে ওদের। কিছুক্ষণের জন্য পাহাড়ের গায়ে প্রাণ ফিরবে তীক্ষ্ণ শিস আর প্রাণীগুলোর ঘোঁৎ ঘোঁৎ প্রত্যুত্তরের ধ্বনিতে। তারপর একসময় ওদের বাঁটেও দুধ শুকিয়ে যাবে, ঝর্ণাগুলো জমে বরফ হয়ে যাবে, গ্রানাইট নৈঃশব্দ্যের ভেতর কেবল বেজে যাবে হিমবাহ পতনের শব্দ। হিম স্বচ্ছ রাতে আকাশে ছেয়ে থাকবে অগণন নক্ষত্র, আশ্চর্য উজ্জ্বল আর বিস্ফারিত, ছুটন্ত চিতার চামড়ার মতো।

এখানে তিনদিন কাটিয়েছিল জোসেফ। খাবার কিনে এসেছিল, বিশেষত চাকর-পোর্টারদের রেশনে টান পড়েছিল। গোর্খাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল শুধুমাত্র সিদ্ধ ভাত, ঘি আর লঙ্কা ; তিব্বতিদের জন্য যবের ছাতু, চা আর চমরি মাখন। গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছিল দুধ, আখরোটের আকারে আলু আর একটি কস্তুরী হরিণের পা।

৩ ম ধ্যা য়

দেড়শো বছর পরে পাহাড়ের কোলে হারিয়ে যাওয়া একটি গ্রামের চিহ্ন আমরা দেখলাম কালিজারে এসে। পুরো বসতিটা মাটির নীচে সেঁধিয়ে গিয়েছে যেন, এদিক ওদিক একটি দুটি পাথরের দেয়াল কেবল জেগে আছে। পাথরের ওপর বহু প্রাচীন আগুনের ভুষোকালির ছোপ, সবজে-কমলা লাইকেন ছেয়েছে। ওই ছোপগুলো না থাকলে পরপর সাজানো পাথরখণ্ড দেখে ধর্মীয় চিহ্ন ভেবে ভ্রম হতো।

বারো হাজার ফুট উঁচুতে পাশাপাশি উটের কুঁজের মতো দুটি চুড়োর মাঝখানে সরু খাতের ওপর কোনোকালে বসতিটা ছিল। আমাদের তাঁবু পড়েছিল সেখানেই। ওপর দিকে ঢালে সিলভার ফার আর পাইন, মাথাগুলো হাওয়ার দাপট কিংবা বজ্রপাতে ন্যাড়া: দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন কোনো হারানো সভ্যতার ইমারতের থাম। হাজার দেড়েক ফুট ওপরে ফোকটের শৃঙ্গ।

BanglaBook.org

—আলো থাকতে দেখে রাখুন। কাল ভোর হবার আগে ওইখানে উঠতে হবে আমাদের, এই অঞ্চলের প্রায় সবকটা বিখ্যাত চুড়ো দেখা যাবে।

দলনেতা ডক্টর যোশি ঘোষণা করলেন।

কিন্তু তখন পড়ন্ত বেলায় চারদিক থমথমে কুয়াশায় ঢাকা, কাছের পাহাড়গুলোও দেখা যাচ্ছে না। দলের অভিযাত্রীরা একজন দুজন করে এসে পৌঁছচ্ছিল কুয়াশার পর্দা ফুঁড়ে।

যোশির কপালে ভাঁজ পড়ে। বলেন— মনে হচ্ছে রাতের দিকে তুষারপাত হতে পারে।

পোর্টারদের তাড়া লাগাতে ওরা হইচই করে মেস টেন্ট টাঙাতে শুরু করে দিল, কয়েকজন নেমে গেল দুশো ফুট নীচের ঝোরা থেকে জল টেনে আনতে। চমরিগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঢালু ঘাসজমিতে। একপাশে ডাঁই করা ছিল তাদের পিঠে মাল রাখার চামড়ার জিন, দড়িদড়া, আনাজের বস্তা। এরই মাঝে বসে অন্ধ গায়ক পুরবা তারযন্ত্র গলার কাছে চেপে নিবিষ্ট হয়ে পিড়িং পিড়িং সুর তুলছিল। একটা বড়ো ডেকচিতে নুডল স্যুপ ফুটছিল টগবগ করে। সেই গন্ধে পেটের ভেতর খিদের ঘাইহরিণগুলোকে বশে আনার চেষ্টায় অবসন্ন দেহগুলো শুকনো হলুদ ঘাসের ওপর এলিয়ে দিচ্ছিলাম আমরা, জুতো খুলে পায়ের পরিচর্যা করছিলাম, নয়তো কাম্পসাইটের চারপাশ অলস অনুসন্ধান করছিলাম। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একটি বাঁশে বোনা দেয়ালের অংশ দেখলাম, বহুকাল রোদে জলে পচে কালো হয়ে প্রায় মিশে গিয়েছে পাথরের চাটানে— বুননের নকশা মনে হয় যেন আগ্নেয় শিলায় লাভার স্তর।

সকাল সাতটায় ঠুলো ধাপ থেকে হাঁটা শুরু হয়েছিল যখন, আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল। তীব্র নীল, প্রায় বেগনি আকাশ আর ফুল ঝোপ আসা রডোডেনড্রন আর ম্যাগনোলিয়ার ডালে সোনাঝুরি রোদ। সেই আলোয় স্নান করে এক ঝাঁক দুর্গাটুনটুনি ম্যাগনোলিয়ার ফুলে ডুব দিয়ে দিয়ে মধু পান করছিল। পাখিগুলোর ছোট্ট দেহ সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছিল পাপড়ির ভেতর, আর্দ্র মসৃণ গর্ভকেশরের মাঝে। নীচে ঘাসের ওপর বিছিয়ে ছিল সাদা পাপড়ি। দূর পাহাড়ের গায়ে একেবারে নিষ্পত্র গাছে বড়ো বড়ো ফুলগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন রাতের নক্ষত্র, ভোরের আগে টুপ টুপ করে খসে আটকে গিয়েছে ডালে।

হুকার লিখছেন: ১৮৪৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে সাদা ম্যাগনোলিয়া এত অত্যধিক পরিমাণে ফুটেছিল যে সিঞ্চলের বিস্তীর্ণ ঢালে ও আশেপাশে ওই উচ্চতায় পাহাড়ের গায়ে ঝরা পাপড়ির স্তূপ দেখে দূর থেকে মনে হচ্ছিল বুঝি বরফ পড়েছে।[৩]

ঠুলো ধাপে বেশ চওড়া খানিকটা সমতল, দীর্ঘ প্রজাতির লাল রডোডেনড্রনের বন আর তার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে অগভীর একটি নালা। তারপরেই শুরু হচ্ছে খাড়াই। নালা পার হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে কুলিসর্দার পাশাং আমাদের দিকে ফিরে ঘোষণা করল:

—আগারি বাটো ঢেরাই উকালো চ! পুরা গাঁড়-ফাটাউনু!

BanglaBook.org

দলে ভিনদেশি সদস্যদের মুখ চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদও করে দিল।

—বাটো মিনিং ট্র্যাক, উকালো স্টীপ অ্যান্ড গাঁড়-ফাটাউনু মিনিং...

হাতদুটো নিজের পশ্চাদ্দেশে ছুঁইয়ে তালি দিল ফটাস শব্দে। আর কিছু বোঝাতে হয়নি।

প্রাণান্তকর খাড়া পথ উঠে গিয়েছে নাইস আর কোয়ার্জ জাতীয় ভঙ্গুর পাথর কেটে, ওক ম্যাগনোলিয়া আর বার্চের বনের ভেতর। মালবাহী ইয়াকগুলো ঘুরপথে রওনা হয়ে গিয়েছিল ভোরবেলাতেই। খানিকক্ষণ ওঠার পর বনের ওপর কাফনের মতো নেমে এল কুয়াশা। কয়েক পা উঠি আর পাথরে পিঠের রুকস্যাক ঠেকিয়ে দম নিই। গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ঘন শ্যাওলা, তার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে তরল অস্বচ্ছ আলো, দাঁড়কাক ডাকছে কর্কশ স্বরে। বড়ো আকারের পাহাড়ি কাক, চওড়া ঠোঁট আর ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো নীলচে কালো পালক, সারা পথ জুড়ে সব উচ্চতায় দেখা গিয়েছে ওদের। কখনো জোড়ায় জোড়ায়, কখনো শূন্যে অসম্ভব বৃত্তচাপ আর প্যারাবোলা এঁকে খুব সাবলীল আর ক্ষিপ্র উড়ান দিচ্ছিল। হয়তো উচ্ছিষ্ট খাবারের জন্য আমাদের দলকে অনুসরণ করছিল।

আগের দিন দেওনিঙ্গালে ধাপের শুকনো লেক থেকে ঠুলো ধাপ পর্যন্ত পথটাই ছিল দীর্ঘতম। একাধিক গাযে-গা-লাগানো পাহাড়ের পিঠদাঁড়া পেরোতে হয়েছে আমাদের। ক্রমাগত চড়াই বেয়ে ওঠা আর নামা, বাঁশ ওক রডোডেনড্রন ও কনিফার জাতীয় বৃক্ষের আর্দ্র ছায়াচ্ছন্ন বনপথ। মাঝে মাঝেই তিরতির করে বয়ে চলা পাহাড়ি নালা, ওপরে গাছের গুঁড়ি ফেলা রয়েছে। এমনই একটি জায়গার নাম জোড়বাটো, অর্থাৎ জড়িবুটির স্থান। প্রতি ইঞ্চি মাটিতে ছড়িয়ে আছে নানান দুষ্প্রাপ্য ওষধি লতা, আঁধারে ফ্লুরোসেন্ট সবুজ কিংবা ফনা-তোলা সাপের আকারের— ডক্টর যোশি আর পাশাং চেনাচ্ছিলেন আমাদের। পাথর, গাছের বাকল সব ঢেকে আছে সবজে-হলুদ শ্যাওলা আর লাইকেনে। রডোডেনড্রনের ডালে ঝুলন্ত ঘন কালো শ্যাওলার নাম বুড়োর দাড়ি। এই গাছগুলো বহু প্রাচীন, কয়েকশো বছরের পুরোনো। জানা গেল, একটি রডোডেনড্রনের চারা ফুট পাঁচেক উঁচু হতে পঁচিশ-তিরিশ বছর লেগে যায়। গাছগুলো সত্যিই যেন আদিম বৃদ্ধের মতো পিঠ বাঁকিয়ে নুয়ে পড়েছে, কালো শ্যাওলার জটা ঝুলছে পাকানো রাক্ষুসে আঙুল থেকে।

—এ হল কুমোলজ্ জোন, ডক্টর যোশি বললেন।* গাছগুলো বছরে চারমাস বরফের ভারে হেলে থেকে থেকে এমন হয়ে গিয়েছে। শীতকালে গোটা এলাকাটা বরফে ঢেকে যায়, কিন্তু বুড়োর দাড়িগুলো মরে না। হরিণেরা এই শ্যাওলা চেটে জল পান করে প্রাণধারণ করে।

আমাদের দলনেতা ডক্টর যোশি ফরেস্ট সার্ভিসের বড়ো কর্তা, পর্যটন দপ্তরে ডেপুটেশানে আছেন। বছর চল্লিশের লম্বা দোহারা চেহারা, উত্তরপ্রদেশের মানুষ:

* kummolhz— জার্মান শব্দ, মানে বাঁকানো কাঠ

BanglaBook.org

প্রকৃতিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমলার চাকরিতে বেশ কিছুকাল কাটাবার পরেও প্রকৃতিপ্রেমে ভাঁটা পড়েনি। তাই হিলে গ্রাম থেকে এই ট্রেক অভিযানের উদ্বোধনে এসে প্রথামাফিক বক্তৃতা দিয়েই ফিরে যাননি, ভিড়ে গিয়েছেন দলে।

—কাজের ছুতোয় পাঁচদিন এমন নির্ভেজাল ঘোরার সুযোগ কতই বা পাওয়া যায় বলুন? মুচকি হেসে বলেছেন প্রথম দিন পরিচয়পর্বের সময়।

সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করছেন পুরোপুরি: চলার পথে নানান প্রজাতির পাখি ফুল কীতপতঙ্গ ক্যামেরাবন্দী করছেন। কখনো ফিল্ড গ্লাস চোখে এঁটে বাঁশের বনে আঁতিপাতি করে খুঁজছেন রেড পান্ডার চিহ্ন, আবার কখনো পাথরখণ্ডের ওপর একটি বিরল প্রজাতির প্রজাপতি ডানা মেলার জন্য জুম তাক করে অপেক্ষা করছেন বিশ-তিরিশ মিনিট। পর্যটন দপ্তরে যাবার আগে এই ফরেস্ট ডিভিশনের অফিসার ছিলেন, শিংলিলার অভয়ারণ্য নিজের হাতের তালুর মতো চেনেন।

—বনবিভাগ ছেড়ে হঠাৎ পর্যটনে এলেন কেন? জানতে চেয়েছিলাম। দুই দপ্তরের কাজে একটা মূলগত বিরোধ আছে বলে মনে হয় না?

এই প্রশ্নে ডক্টর যোশির কপাল ভাঁজ পড়েছিল। মুচকি হেসে ঠোঁটের ভাঁজে ভারসাম্য এনে বলেছিলেন:

—বন সংরক্ষণের জন্যেও তো টাকা লাগে। সিকিমের মতো একটা ছোট্ট রাজ্য, যার রাজস্বের সুযোগ খুবই সামান্য, সেখানে পর্যটন একটা প্রধান উৎস। আরেকটা উৎস হল জলবিদ্যুৎ। এ রাজ্যে এই দুটোই এখন ইমার্জিং সেক্টর।

অর্থনীতির সঙ্গে পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার যুক্তি নিপুণভাবে মিলিয়ে উত্তরটা দিয়েছিলেন। তখনও বন অধিকার আইন চালু হয়নি, বিলের ওড়া নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। এর কিছুকাল পরে ওড়িশার নিয়মগিরিতে গিয়ে ডক্টর যোশির এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রেক্ষাপট দেখতে পাব আমি।

জোড়বাটো ছেড়ে কিছুটা চড়াই পথে ওঠার পর তিনটি শিরার সংযোগস্থল—চ্যাটালো ভূমির ওপর নিষ্পত্র কাঁটাঝোপ, মরা ওকের বাকলে কার্নিশের মতো এক ধরনের বিশালাকার ছত্রাক, ঝিঁঝি ডাকছে। অনেকটা নীচে একটুকরো আয়নার মতো জলাশয়ে প্রতিফলিত মেঘ, ঝুঁকে পড়া পুষ্পিত রডোডেনড্রন। এরপর আমরা এসে পৌঁছলাম এক বিচিত্র কালো কাঠখোদাই ছবির মতো অঙ্গারের বনে।

বছর দুয়েক আগে খুব বড়ো দাবানল লেগেছিল এখানে, যোশি তখন ডিএফও।

—সেটা ছিল আমার জীবনের দীর্ঘতম রাত। বনবিভাগের কর্মী আর আশেপাশের গ্রামবাসী মিলিয়ে আমরা প্রায় কুড়ি-বাইশজন বিকেল থেকে পরদিন ভোর অব্দি কাটারি কুড়ল আর গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে সেই আগুনের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম।

আগুনটা যে এত বিপুল সেটা গোড়ায় বোঝা যায়নি। দাবানল ছড়িয়ে পড়া আটকানোর জন্য প্রথমে বনের খানিকটা অংশে কৃত্রিম আগুন লাগিয়ে, কাঁচা ডাল দিয়ে

BanglaBook.org

নিভিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি। একটি পাহাড়ি নালায় পরিখার মতো ঘেরা চাটানের মাঝখানে অসহায় দাঁড়িয়ে ওঁরা দেখেছিলেন কীভাবে ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছিল গাছ থেকে গাছে, শত শত বছরের প্রাচীন মহীরুহ কীভাবে পুড়ছিল: প্রথমে গাছের গায়ে শুকনো শ্যাওলা আর ফার্নগুলো দপ করে জ্বলে উঠছিল পোশাকের মতো, তারপর লেলিহান শিখা লাফিয়ে উঠছিল ওপরের ডালে। গাছের মাথাগুলো ভাঙছিল পটাপট, উঁচু উঁচু বার্চের কাণ্ড ফাটছিল বিকট শব্দে, ফোঁপরা জঠরে ধিকি ধিকি আগুন আর মুড়োনো মাথার থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছিল চিমনির মতো।

ফেব্রুয়ারির হাড়কাঁপানো রাত, দমবন্ধ-করা আতঙ্ক। ছোটো একটু আগুন জ্বেলে আঁটোসাঁটো হয়ে বসেছিলেন ওঁরা সারারাত, অপেক্ষা করেছিলেন ভোরের আলো ফোটার জন্য। বনের মধ্যে দিকে দিকে ঝুটো সূর্যোদয়ের মতো আকাশ রাঙা হয়ে উঠছিল।

দুবছর পরেও সেইসব মহীরুহের কালো অঙ্গার আকাশে আর্ত ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে। বেশিরভাগ মৃত, কিন্তু কয়েকটি আশ্চর্যজনকভাবে জীবিতও ছিল। এমনকি দুয়েকটি রডোডেনড্রন গাছে রক্তলাল ফুলও এসেছে দেখলাম। ভুষোকালো গুঁড়ির গায়ে কারা যেন আঁক কেটে দিয়েছিল— আদিম মানব-মানবীর রেখাচিত্র, অতিকায় স্তন আর বিস্ফারিত যৌনাঙ্গসমূহ। কালো কালো কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে নীচে সেই ঝোরাটা দেখা যাচ্ছিল।

কালিজারে এসে ডক্টর যোশি সেই দীর্ঘ আগুনের রাতের গল্প বললেন আমাদের। ভারি কুয়াশা নীচে নেমে এসেছে তখন, দিনের আলো মরে এসেছে। জোরে হাওয়া চলছে ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায়, তাঁবুগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। তখনও বোঝা যায়নি কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে তুষারঝড়। তার আগে আচমকা তাপমাত্রা নেমে গেল, রক্তজমানো ঠান্ডা লাফ দিয়ে নেমে এল যেন। পোড়া জঙ্গল থেকে কাঠকয়লা তুলে এনেছিল কুলিরা। জ্বলন্ত অঙ্গারে হাতমুখ সেঁকে নিতে নিতে যোশি আমাদের বোঝাচ্ছিলেন কীভাবে জঙ্গলের ভেতর গোপালকদের অসতর্ক আগুন থেকে দাবানল লাগে, স্যাংচুয়ারির ভেতর ওদের ছাউনিগুলো ভেঙে দেওয়া হয় যে কারণে।

কিন্তু কালিজারে যে ধ্বংসাবশেষ দেখলাম সেটা কোনো এককালে গোপালকদের অস্থায়ী আস্তানা ছিল নাকি পুরোদস্তুর গ্রাম, বোঝার উপায় ছিল না। ধ্বংসস্তূপের মাঝে জেগে থাকা পাথরের দেয়াল, ঘরের ভিত, তার মাঝে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। কুয়াশার ভেতর ন্যাড়া বাজপড়া ওক গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো হারানো সভ্যতার ইমারতের থাম।

রিংবি পেরিয়ে যে জনহীন বসতি দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র দাস, কিংবা তারও আগে ইয়াংমা উপত্যকায় শীতঘুমে কুঁকড়ে আসা যে গ্রামের বর্ণনা রয়েছে হিমালয়ান জার্নালে,

BanglaBook.org

তত প্রাচীন হয়তো নয়, কিন্তু দার্জিলিঙে নগর পত্তনের সময়েও জঙ্গল হাসিল করে অনেকগুলো গ্রাম বসানো হয়েছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুধ, চিজ, আর জ্বালানি কাঠের যোগান। এজন্য চেবু লামা নামে এক তালুকদারের বংশধরদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল শিংলিলার অরণ্যের কিছু অংশ। সরকারিভাবে অভয়ারণ্য ঘোষিত হবার পর সেই গ্রামগুলো উৎসাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

রাতে তুষারঝড়ে মেস টেন্ট পড়ে গেল, পরদিন ভোরে আমাদের ফোক্‌টের চুড়োয় ওঠার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। সকালে আলো ফোটার পর নেমে এলাম চিয়াভঞ্জন। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় বরফে ঢাকা পাহাড়শ্রেণি, ওপরে মেঘমুক্ত আকাশ অপরাজিতা নীল। পাথরের খাঁজে টাটকা সাদা বরফের ওপর রডোডেনড্রনের লাল পাপড়ি ঝরে খুনখারাবি হয়ে আছে, তার ওপর ঝলকাচ্ছে তরুণ সূর্য। জায়গাটা ভারত-নেপাল সীমান্ত, কিন্তু দু ফুট কংক্রিটের সীমানাসূচক পিলারগুলো হারিয়ে গিয়েছিল বরফের নীচে। পথ হারিয়ে নেপালের দিক থেকে আমরা এসে ঢুকলাম চিয়াভঞ্জনের সীমান্তচৌকিতে।

পাহাড়ের কোলে কয়েকটি কাঠ আর টিনের ঘর আর একটি ভলিবল খেলার মাঠ নিয়ে বিএসএফ আউটপোস্ট: কাঁটাতার, বালির বস্তা, বন্দুকের নল, তেরঙা পতাকা। আমাদের, বিশেষত দলের বিদেশি পর্যটকদের পরিচয়পত্র যাচাইয়ের পর ফের পা দেওয়া গেল ভারতের মাটিতে। বাঙালি দেখে এগিয়ে এসে আলাপ করলেন একজন জওয়ান, কালো পেশল চেহারা, বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুর। জানা গেল, ইউনিটটা পাঞ্জাব সীমান্ত থেকে এসেছে দিন সাতেক হল।

হাজার পাঁচেক ফুটে নেমে আসতে জঙ্গলের চেহারা চরিত্র বদলাল: সাবঅ্যালপাইন বড়ো বড়ো গাছ, বাদামি রক্তাভ ঝরা পাতার স্তূপ বিছিয়ে আছে পাথরবাঁধানো পথে। একটি বড়ো পাহাড়ি নালার ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলা সাঁকো। অভয়ারণ্যের সীমানা ছাড়িয়ে বিকেলের আগে এসে পৌঁছলাম চিত্রে গ্রামে। সেখানে সিকিম পর্যটন সংস্থা আর স্থানীয় গ্রামসমিতির উদ্যোগে সনাতন লেপচা রীতিতে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল। সনাতন পোশাক পরা একদল মেয়ে সকলের গলায় পরিয়ে দিল রঙিন খাদা। আরেকটি দল রেকাবে সাজিয়ে দিল ছোটো সুদৃশ্য কাপে ঘরে তৈরি ছাং আর যবের আটা। ছাঙের কাপে এক চিমটে আটা ফেলে এক চুমুকে পান করাটা রীতি।

গ্রীষ্মময়ন

ফুরচুঙের গ্রামে তিন রাত কাটিয়ে তিব্বতের পথে যাত্রার সময় এমনই এক বিদায়কালীন লোকালয়ের কথা লিখেছেন শরৎ দাস। কাংচেন নদীর ওপর উঁচু ধাপকাটা জমিতে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী গ্রাম, চারদিকে ঘিরে আছে তুষারধবল শৃঙ্গ। গ্রাম ছেড়ে পথ

BanglaBook.org

গিয়েছে শ্যাওলায় মোড়া সুপ্রাচীন দেওদার আর সিলভার ফারের বন চিরে, শুকনো হিমবাহের খাত ধরে উঠেছে ওপর দিকে। কিছুটা দূরে নদীর বাঁকে ছোট্ট একটি মঠ, জলের তোড়ে ঘুরছে প্রার্থনার চাকা। গাঁয়ের পূর্ব সীমানায় সেতুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ফুরচুঙের মা (যাঁর তরুণ বয়সের বর্ণনা রয়েছে হুকারের জার্নালে) ও অন্যান্য বয়স্কারা, হাতে তাঁদের থালায় সুরাপাত্র আর যবের আটা। আটা মেশানো ছাঙে চুমুক দিয়ে থালার ওপর কয়েকটি মুদ্রা রেখে যাত্রা শুরু হল।

নাংগো লা পাস পর্যন্ত কঠিন চড়াই পথে নেওয়া হয়েছিল দুটি ঘোড়া, প্রতিটির ভাড়া আট আনা। শরৎ ও উগেন চড়েছিল ঘোড়ায়। বন্দুক কাঁধে ফেলে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছিল ফুরচুং। আগের রাতে প্রচুর মদ্যপান করেছিল, কিন্তু ওর দীপ্ত হাঁটার ভঙ্গিতে তার রেশ ছিল না। হিমালয়ে আমি যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ এই ফুরচুং— শরৎচন্দ্র লিখেছেন। ওর সুবাদেই কাংবাচেন গ্রামে মিলেছিল হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথ্য আর প্রচুর উপহার— আলু, মাখন, বাজরা, মুরোভা এবং আস্ত একটি ভেড়া। এছাড়া বেতের ঝুড়ি ভরে নেওয়া হয়েছিল রক্তের পুডিং: জবাই করা ভেড়ার অন্ত্রের ভেতর তাজা রক্ত আর জবের আটা ভরে সিদ্ধ করা একধরনের সসেজ।

সামনে দুরূহ বাধা কাংলাচেন। সেটি পার হতে পারলে ততোধিক দুরূহ সীমান্তপাহারা এড়িয়ে তিব্বতের শিগাৎসে প্রদেশ।

দার্জিলিং থেকে সিকিমের ভেতর দিয়ে তিব্বত যাত্রায় পুরো পথটাই পশুপালক, বিশেষত মেষপালকদের গ্রামের ভেতর দিয়ে। ভেড়াদের মালবহনের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা গেল, এছাড়া জঙ্গলে দেখা মিলল বন্য ভেড়ার পাল। হিমালয়ের এই গোটা অঞ্চলেই ভেড়ার মাংস একটি প্রধান খাদ্য। তার বিবিধ পদ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সংরক্ষণের বিচিত্র সব পদ্ধতি। চলার পথে একটি বসতিতে ফাগড়া নামে এক ধরনের ভেড়ার আস্ত ধড় কেনা হল। ভেড়ার দেহে প্রভূত চর্বি জমলে মেষপালকেরা প্রাণীগুলিকে ছালচামড়া সমেত জীবন্ত দগ্ধ করে— শরৎচন্দ্র লিখছেন, যাতে একফোঁটা চর্বিও অপচয় না হয়। তখন নভেম্বরের শেষ, আসন্ন টানা শীতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও তার সংরক্ষণের তোড়জোড় চলেছে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি গ্রামগুলোয়। এমনই একটি গ্রামে দেখা গেল অসংখ্য ভেড়া নিধনপর্ব: নীচু পাথরে ঘেরা খোঁয়াড়ের থেকে শান্ত প্রাণীগুলো সারিবদ্ধভাবে চলেছে বধ্যভূমির দিকে। গ্রামের মোড়লবাড়ির প্রার্থনাঘরে সারি দিয়ে ঝুলছিল পাগড়া।*

উঁচু উঁচু ফার আর দেওদারের বনের ভেতর দিয়ে পথ উঠেছে ইয়াংমায়। নানা রঙের ফেজেন্ট ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে। কুলিরা জানাল, কস্তুরি হরিণ আর

---

* মোঙ্গলিয়ার অধিবাসীদের মধ্যেও সংরক্ষণের একই ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তবে আগুনে ঝলসানোর বদলে জীবন্ত প্রাণীগুলিকে ফুটন্ত জলে চুবিয়ে মারা হতো। একে বলা হতো তাং-ইয়াং, অর্থাৎ ভাপানো ভেড়া।

BanglaBook.org

বুনো ভেড়া রয়েছে বনে। মাইল দুয়েক চলার পর দেখা হয় একদল ব্যাপারির সঙ্গে: দশ-বারোটা চমরি গাই আর ভেড়ার পিঠে কম্বল, যব, নুন আর চামড়ার মোট চাপিয়ে চলেছে। কাংলাচেন গিরিপথ কি খোলা আছে? জানতে চাইলে কয়েকজন জানাল, খোলা আছে; কেউ আবার বলল, দিনকয়েক আগে ভারি তুষারপাতে সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে।

জুনিপারে ছাওয়া একটি ছোট্ট উপত্যকা পার হয়ে ফের খানিক দূর উঠে চারিপাশের দৃশ্যাবলি গোচরে এল: একদিকে নাঙ্গো লা, শুকনো হিমবাহের খাতের ওপারে সারি দিয়ে তুষারমৌলি, অন্যদিকে লালচে অতিকায় গ্রানাইট পাথরের স্তূপ দেখে মনে হয় যেন কোনো সভ্যতার ধ্বংসচিহ্ন। সন্ধ্যা নামার আগে নদী থেকে ফুট পঞ্চাশ ওপরে সবুজ চাটানের ওপর ইয়াংমা গোম্ফায় এসে পৌঁছল শরতের দল। এখানে একটি জীর্ণ কুঠুরিতে রাতে থাকার ব্যবস্থা করল ফুরচুং। কিছু ডিম আর দুধ জোগাড় করে আনা হল নিকটের গ্রাম থেকে, এবং গোম্ফার এক আনির (সন্ন্যাসিনী) সাহায্যে রান্নার আয়োজনও হল। লামারা সবাই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাৎসরিক শাস্ত্র পাঠের কঠোর আচার পালন করছিল। মোট পনেরোজন লামা আর সাতজন আনির বাস। কাঠের গোম্ফায় বিরতিহীন মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি মৌচাক গুঞ্জনের মতো শোনায়।

এদিকে ফুরচুং আর তার সঙ্গী ফুন্টসো মদ্যপান করতে গ্রামে গিয়ে কাটিয়ে দিল রাতভর। শরতের মনের ভেতর একটা শঙ্কা নখ আঁচড়ায়: যদি নেশার ঘোরে ওরা যাত্রার উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয়?

পরদিন সকালবেলায় গ্রামের জনাকয়েক বয়স্ক পুরুষ এল। তাদের মধ্যে মোড়লও রয়েছে: তার মাথায় তিব্বতি টুপি, কানে লম্বা দুল, পরনে লাল সার্জের পুরুগ, একটি চমরের পিঠে চেপে এসেছে। তীর্থযাত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল আগেই, ভাষা ও পোশাক থেকেও সন্দেহের কারণ বিশেষ ছিল না। তবু এই প্রতিকূল ঋতুতে তীর্থযাত্রায় বের হবার কারণ জানতে চাইল মোড়ল। স্বচ্ছন্দ তিব্বতিতে ধর্মীয় বাচনে শরৎ তার সন্দেহের নিরসন ঘটাল সহজেই।

—লাসো লাসো! বলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে মোড়ল। তাড়াহুড়োয় পুণ্যাত্মার জন্য কোনো উপহার না আনতে পারায় মার্জনা চায়।

—শাংপোই যা চোগ! শরৎ বলে। আগামী বছর আবার দেখা হবে।

—শাংপোই যা চোগ! সকলে সমস্বরে বলে ওঠে।

এতদসত্ত্বেও একজন শরতের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে— এই লোকটা ভারতীয়!

আরেকজন বলে— এই হিন্দুটা গিরিপথের বরফ পেরোতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়বে! কুলিরা শিগগিরই ফিরে আসবে সেই সংবাদ নিয়ে।

গোম্ফা ছাড়িয়ে খানিক পথ যেতে একসারি মেন্ডং আর চোর্তেন, তার পরেই ইয়াংমা নদীর ঢালে দেখা গেল বুনো ভেড়া চরছে। কিন্তু এই উপত্যকার মানুষেরা বনপ্রাণী হত্যা করে না, অগত্যা শিকারে নিরস্ত থাকতে হল। বেলা তিনটে নাগাদ দূর থেকে দেখা গেল ইয়াংমা গ্রাম, ৩০ বছর আগে যা প্রথম চাক্ষুষ করেছিলেন জোসেফ

BanglaBook.org

হুকার। তিনি যখন গিয়েছিলেন, পুরো গ্রামটাই আসন্ন শীতের অপেক্ষায় ঝিমিয়ে এসেছিল, পাহাড়ি ইঁদুরের মতো কোটরে সেঁধিয়ে এসেছিল। শরৎ দেখল পুরুষেরা আলস্যে মদির, কিন্তু মেয়েরা মকাই ঝাড়ছে, জ্বালানি কাঠ যোগাড় করছে, ঘরকন্নার টুকিটাকি কাজ করছে।

এখানেও ফুরচুংকে ছাং-এর আসর থেকে ছাড়িয়ে আনতে বেগ পেতে হল। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর উপত্যকা পেরিয়ে একটি ঝুলন্ত পাথরের নীচে তুষারমুক্ত জমিতে তাঁবু পড়ল।

পরদিন পথ গিয়েছে ইয়াংমার খাত ধরে, নদীর বুক স্বচ্ছ বরফের চাঙড়ে ঢাকা। চারদিকে পাহাড়চুড়ো আকাশ ছুঁয়েছে। আকাশে পাখি নেই, মেঘের কণাও নেই, এক বিচিত্র নৈঃশব্দ্যের ভেতর কেবল পায়ের নীচে বরফ ভাঙার মচমচ শব্দ। এক জায়গায় উপত্যকা চওড়া হয়ে এসে একটি প্রায় জমে যাওয়া লেক, বর্ষার পর দোকপারা চমরির পাল চরাতে নিয়ে আসে। চা ও প্রাতরাশ সারা হল এখানে।

এরপর থেকেই চড়াই ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে, পথে তুষার সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে ন্যাড়া গ্রানাইট। ইয়াংমা নদীর উৎসমুখের কাছাকাছি এসে ফুরিয়ে যায় উদ্ভিদরেখা।

একটি হিমবাহ সিকি মাইল চওড়া আর লম্বায় প্রায় তিন মাইল, কোমর-ডোবা বরফ। ফুরচুঙের কাঁধে সওয়ার হল শরৎ। তারপর শুরু হল বিশালাকার নগ্ন কালো পাথর আর তুষারের রাজ্য। ঠিক হয়েছিল ফুগপা-কারপো (শ্বেত গহ্বর) নামে একটি বরফের গুহায় রাত্রিবাস হবে। কিন্তু কোনোক্রমে ততদূর পৌঁছনোর আগেই অন্ধকার নেমে এল। ঘন কুয়াশায় এক হাত দূরের দৃশ্যও দেখা যায় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জমে বরফ, পদে পদে ক্রিভাস— পাথরের ফাটলে মরণফাঁদ। ফুগপা-কারপোয় পৌঁছনোর আশা ছেড়ে দিয়ে দুটি জোড়-লাগা পাথরের মাঝে বরফ সরিয়ে গুটিসুটি মেরে কোনোক্রমে রাতের আশ্রয় নেওয়া গেল।

ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা বায়ুমণ্ডল, শৈত্য, সারাদিনের পথশ্রম আর ক্ষুধাতৃষ্ণায় কতখানি যে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম সেটা ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যাবে না— লিখছেন শরৎচন্দ্র দাস। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা মনে পড়লে এখনও কেঁপে উঠি। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাত ছিল সেটি। সারারাত ধরে হাওয়ায় ভেসে আসছিল বরফের গুঁড়ো, গায়ের কম্বলে জমে উঠছিল স্তূপাকারে, কুয়াশা চুঁইয়ে আসা নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল হিমপ্রপাতের শব্দ।

৩০ নভেম্বর। দিনের আলো ফুটতে চারদিক উজ্জ্বল সোনায় মোড়া, সামনে ঝকঝক করছে কাংলাচেন শৃঙ্গ। মাত্র কয়েক গজ দূরেই রয়েছে ফুগপা কারপো, রাতের অন্ধকারে দেখা যায়নি। তবে কোনো গুহা নয়, দুটি খাড়া আলগা পাথরের মাঝে মাথাগোঁজার মতো ঠাঁই। সৌভাগ্যক্রমে রাতে নতুন করে আর তুষারপাত হয়নি। বরফের ওপর

BanglaBook.org

গাইডের আঁক কাটা পথ ধরে খুব সন্তর্পণে শরৎ আর উগেন উঠে এল গিরিপথের পিঠে। মাথার ওপর অপরাজিতা-নীল আকাশ, চক্রবালে ছেদহীন বরফাবৃত শৃঙ্গ, উত্তরপশ্চিমে দেখা যায় ফেরুগ পর্বতমালা।

আহ্, তিব্বত!

বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি বিছানো শুকনো হিমবাহের খাত ধরে নীচের দিকে নেমে আসতে আসতে পাহাড়ের রং পাল্টে যায় ক্রমশ। ভারতের দিকের সাদা ক্রমশ হয়ে ওঠে কালচে লাল। স্নায়ুর ওপর উষ্ণ স্পর্শের মতো ছেয়ে আসে সবুজ উদ্ভিদরেখা, ঝোরার শব্দ। বনের ভেতর পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে জুনিপারের বীজ, দূরে চমরি চরছে, গোপালকদের তাঁবু থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। তিনদিন প্রায় অনাহারের পর গরম ভাত আর মাখন-চা জোটে সকলের।

জায়গাটির নাম তাশি-রাবকা, তিব্বতের সীমান্তবর্তী জেলার ভেতর। ওই নামে একটি সরু নদীও বইছে। এককালে, যখন ইয়াংমা আর ওয়ালুং জেলা সিকিম রাজ্যের মধ্যে ছিল, রাজার দলবল তিব্বতে যাবার পথে এখানে বিশ্রাম নিত। এক বিশাল বোল্ডারের মাথায় সেই পাথরের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিছুটা দূরে গোপালকদের তাঁবু। দুই তিব্বতি রমণী ও এক ভয়ঙ্করদর্শন ম্যাস্টিফ কুকুর বসেছিল তাঁবুর বাইরে। ফুরচুং ওদের তাঁবুতে গিয়ে গল্পগাছার ছলে খোঁজখবর নিয়ে এল। এক বাটি তারা (এক ধরনের পাতলা গাঁজানো দই) পান করেও এল।

তাশি-রাবকার নজরদারি এড়িয়ে যাওয়াটাই ছিল কঠিন বাধা। সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামের কাছে এসে পৌঁছল দলটা, কিন্তু অন্ধকার নামার জন্য অপেক্ষা করা হল পাথরের আড়ালে। রাতে চাঁদ উঠল। পাহাড়ের গায়ে টানা উঁচু পাথরের দেয়াল যা গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাতারাতি গেঁথে তুলেছিল তিব্বতিরা। দেয়ালটি নদীর ওপর এসে সেতু হয়েছে, সেখানে আটটি নজরচৌকি। ওধারে ঘুমন্ত গ্রাম। পাথরের আড়াল থেকে নেমে এসে নিঃশব্দ পায়ে সেতুর কাছাকাছি এসে উগেন আর ফুরচুং আতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়ল।

জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে চরাচর, কোথাও একটা রাতচরা পাখি ডাকছে, নদীর বুকে বড়ো বড়ো বরফের চাঙড়ের ফাঁক দিয়ে তিরতির করে বইছে জল।

শান্তমতি ফুন্টসো উপায় বাতলায়।

—পাহারাদারেরা যদি জেগে থাকে তাহলে আমরা ওয়ালুং প্রদেশের গান গাইতে গাইতে যাব, নিজেদেরও ওয়ালুংপা বলে পরিচয় দেব।

দুরুদুরু বুকে সেতুর ধারে চোর্তেনের কাছাকাছি আসতে চমরির লোমের তাঁবু থেকে হাঁক শোনা যায়—

—কে যায়? কোথায় যায়?

—আমরা ওয়ালুংপা, চলেছি শিগাৎসে! ফুন্টসো জবাব দেয়।

মোটা মোটা কাঠ আর পাথরে তৈরি সেতু। আর একটিও বাক্যবিনিময় না করে দলটা সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে যায় দলপতির কুঠুরি।

BanglaBook.org

বাইরে একটি শিকলবাঁধা ম্যাস্টিফ ঘুমোচ্ছিল, তার কালো রোমে ঝিলমিল করছিল জ্যোৎস্নার বিদ্যুৎরেখা।

৩ ডিসেম্বর। সন্ধ্যার আগে তাশিলুম্ফো মঠের অধীনস্থ অঞ্চলে ঢুকে পড়তে মন থেকে সব শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা খসে গেল।

তাশি রাবকা পার হবার পর কেবল বিস্তীর্ণ বিজন বাতাসতাড়িত চরাচর, ছোটো ছোটো চটকের মতো এক ধরনের পাখির ঝাঁকের ওড়াউড়ি, দূর আকাশে চিল আর দিগন্তে নীচু বালির পাহাড়। কোথাও বা উঁচু ঘাসে-ছাওয়া প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পথ গিয়েছে, পায়ের শব্দে খরগোশ আর খেঁকশিয়াল ছিটকে সরে যায়। দূরে দূরে একটি-দুটি গ্রাম, মেয়েদের মাথায় বিচিত্র কাপড়ের সাজ, গাধার পাল নিয়ে চলেছে চালের ব্যাপারীরা। কোথাও বয়ে চলেছে সরু নদী, খাল কেটে যবের খেতে সেচ দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় মাটির নীচে পাথর কেটে তৈরি একটি গোম্ফা, ভেতরে জনা কুড়ি সন্ন্যাসী থাকে।

রোদসেঁকা ইটে তৈরি ভেড়ার খোঁয়াড়ে স্থানীয় একদল শিকারির সঙ্গে রাত্রিবাস হল এক জায়গায়। একটি কোমরডোবা নালা ফুরচুঙের কাঁধে চেপে পার হল শরৎ। একটি শুকনো নদীর খাতে প্রবল ধুলোঝড়ের মধ্যে পড়ল সবাই। বুনো গাধার দঙ্গল ছুটে যাচ্ছে দেখা গেল। রে চু উপত্যকায় একটি জমাট বরফনদী পার হতে ছোটো ছোটো গ্রাম, ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়ছে যব আর মকাইয়ের খেতে। এখানে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ, তাই ফসল নষ্ট করলেও পায়রা মারে না কেউ। পাহাড়ের পায়ের কাছে একটি ছোটো মঠ পার হয়ে নাম্বু গ্রামে পৌঁছে ঘোড়া ভাড়া করা হল।

৯ ডিসেম্বর। তাশিলুম্ফোয় প্রবেশের দিন। সেই মেঘভারাতুর চাঁদের রাতে দার্জিলিং থেকে বের হবার পর ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে একটি মাস। পথের সব বাধাবিপত্তি আর ক্লান্তি ছাপিয়ে শরতের মনে সাফল্যের উত্তেজনা। রাতে ঘুম আসে না। সাড়ে তিনটেয় উঠে পাটভাঙা পোশাক পরে যাত্রা শুরু হল। দিনের আলো ফুটতে পথে দেখা যায় ব্যাপারীর দল, গাধা আর চমরির পিঠে বিপুল বোঝা চাপিয়ে চলেছে শিগাৎসের দিকে। হিমেল দিন, মৃদু বাতাস বইছে। গন্তব্য যত এগিয়ে আসে শরতের দেহমন এক বিচিত্র ফুর্তিতে হালকা ফুরফুরে হয়ে আসে। কিন্তু উগেন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিরক্তি ফুটে বেরোচ্ছে ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারে।

দুপুর নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল পাহাড়ের দাঁড়ার ওপর জুং লুগরি নামে একটি জায়গায়। এখান থেকে ধাপ কেটে নেমে গিয়েছে তাশিলুম্ফোর পথ, সর্বত্র পাথরে উৎকীর্ণ ওম-মণি-পদ্মে-হুম মন্ত্র। ঝাঁকড়া উইলো গাছের নীচে একটি ছোট্ট সরাই, পাশ দিয়ে নালা বইছে। দরজায় শিকলবাঁধা ম্যাস্টিফ, বৃদ্ধা বসে আছে জপমালা হাতে,

BanglaBook.org

চালের ওপর পায়রার বকমবকম। শরৎকে দেখে বেরিয়ে আসে সরাইয়ের মালিক, নাম লোবডেন। নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে:

—পাণ্ডিব লা, চিয়াগ ফেব নাং চিগ! হে পণ্ডিত, ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক।

কুকুরটি ঝাঁকড়া লোমের ফাঁকে চোখ খুলে দেখে নেয় একবার।

লোবডেনের ঘরে চা ডিম ইত্যাদি খেয়ে দাম মিটিয়ে উঠে পড়তে বিকেল হয়ে এল। কিছুটা এগোবার পর একটি পাথরের চাটান, বাঁশে ছাওয়া বিশ্রামঘর পথিকের জন্য, আর তারপর একটি সরু বাঁক ঘুরে নীচে তাকাতে শরতের বুকের থেকে একটি হৃৎস্পন্দন খসে গেল।

প্রায় এক হাজার ফুট নীচে বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপর বিছিয়ে আছে তাশিলুম্ফোর মন্দির মঠ আবাসগৃহ। মেঘমুক্ত আকাশে আশ্চর্য বর্ণময় সূর্যাস্ত হচ্ছে, আর নীচে অসংখ্য চোর্তেন সৌধ প্রাসাদ ও সমাধির গিল্টি-করা চুড়োয় সোনালি আলো পড়ে ঝিকমিক করছে।

শ্রীসমাধিস্থল

তাশিলুম্ফোর দৃশ্য এমনই দেখেছিলেন জর্জ বোগল। লিখছেন, প্রাসাদের প্রশস্ত ছাদগুলো তামায় মোড়া। ইমারতগুলো সব কালচে ইটের তৈরি। শহরের ঘরবাড়িগুলো একে অপরের গায়ে গায়ে উঠে গিয়েছে; তার মাঝে গিল্টিকরা মন্দিরগুলো রয়েছে। পাথরে মোড়া সুপ্রশস্ত সব উঠোন, চারিপাশে ধাপ-কাটা, সরু গলিপথগুলিও পাথরে বাঁধানো। সব মিলিয়ে এক রাজকীয় দৃশ্য!

বোগল আর শরতের দেখার মাঝে কেটে গিয়েছে একশো বছর। ইতিমধ্যে ১৭৯২ সালে নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের পর তিব্বত ভিনদেশিদের জন্য নিষিদ্ধ দেশ। সেই যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোর্খাদের পক্ষপাতিত্ব করায় বোগলের হাতে গড়া ব্রিটিশ-তিব্বত মৈত্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভারতে শেষ হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল, রানি ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যুক্ত হয়েছে একছত্র শাসনব্যবস্থায়।

একশো বছরে পৃথিবীটাও বদলে গিয়েছে। ফরাসি বিপ্লব হয়েছে, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর জন্ম হয়েছে নতুন নেশনের, শিল্পবিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপে, বাষ্পচালিত জাহাজ আর রেলইঞ্জিন আমূল বদলে দিয়েছে দূরত্বের ধারণা, মানচিত্রে সাদা শূন্যস্থান খুব বেশি আর নেই। জর্জ বোগল যে-বছর তাশিলুম্ফোয় গেলেন, তার ঠিক আগের বছর জেমস কুক পা রেখেছেন দক্ষিণ গোলার্ধের এক অজানা ভূখণ্ডে, আদিম আরণ্যক প্রকৃতির মাঝে বহু বিচিত্র প্রাণী উদ্ভিদ ও জনজাতির মানুষের মহাদেশ। শরৎ চন্দ্র দাস যখন তিব্বতের পথে পা বাড়ালেন, ততদিনে অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ, জনজাতির মানুষ বিলুপ্তপ্রায়।

আর এতকিছুর মধ্যে তাশিলুম্ফোর সেই দৃশ্য রয়ে গিয়েছে অমলিন, অপরিবর্তনীয়। জর্জ বোগল তাঁর দেখা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, শরৎ চন্দ্র দাসের হাতে ছিল ক্যামেরা।

BanglaBook.org

আট

কেসাং লেপচার বাঁশি

জুং লুগরির ওপর থেকে তাশিলুম্ফো প্রথম যেদিন চাক্ষুষ করলেন শরৎ দাস, তাঁর সেই দেখার ভেতরে ছেয়ে ছিল একশো বছর আগে জর্জ বোগলের দেখা। তাঁর বর্ণনাতেও ফুটে উঠেছে এক প্রলম্বিত সময়ের উদ্ভাস। লেখাটা পড়ার প্রায় কুড়ি বছর পরে সেই দৃশ্য স্বপ্নে দেখলাম আমি, অনেকটা সিনেমায় লম্বা প্যান শটের মতো: এক বর্ণময় সূর্যাস্তের আলোয় ঝিকমিক করছে কল্পশহরের অসংখ্য চোর্তেন মেন্ডং মন্দিরের গিল্টিকরা চুড়ো, আর তার ভেতর থেকে পাক খুলে উঠে আসছে একটি বাঁশির সুর।

স্বপ্নের সেই দৃশ্য ফুটেছিল দীর্ঘক্ষণ, যতক্ষণ না প্রতিটি চুড়ো থাম ঘরবাড়ির ছাদ পাথরবাঁধানো চত্বর পথ ধ্বজা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর মোরগের ডাকে ফর্দাফাঁই হয়ে গেল। চোখ খুললাম এক অচেনা ঘরে— ছোটো কাঠের ঘর, দোতলায়। কাচের জানলায় লেসের পর্দার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। সেই আলোর গায়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো ঝুলে আছে অদ্ভুত বাঁশির সুর। মোরগের ডাক, কাঠের মেঝেয় পায়ের শব্দ, জল পড়ার শব্দ, দূরাগত গরুর হাম্বা রবে সম্পূর্ণ জেগে উঠি, কিন্তু বাঁশিটা বেজেই চলে। চোখ মেলে ভালো করে দেখি, পরিপাটি সাজানো ঘর, দুটি বেতের চেয়ার, ওয়ার্ডড্রোব, মেঝেয় দড়ির কার্পেট, বাথরুমের দরজার বাইরে দু জোড়া ভেলভেটের বাথরুম স্লিপার, দেয়ালে পাহাড়ি দম্পতির সিপিয়া ফোটোগ্রাফ, একপাশে ঝুলছে তিরধনুক, পাখির পালক-গোঁজা চামড়ার টুপি। বারান্দার চালে হলুদ মকাইছড়া জানলা দিয়ে দেখা যায়।

পাঁচদিন শিংলিলার অরণ্যে ট্রেক শেষে উত্তরে গ্রামে স্থানীয় রীতির অভ্যর্থনার পর কাছেই নাগবেলি রিসর্টে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা একটি অনুষ্ঠান শেষ সেখানে। একদল পাহাড়ি মেয়ে লেপচা, শেরপা ও লিম্বু জনজাতির পোশাক পরে নাচগান পরিবেশন করল রিসর্টের লনে, চিরায়ত কৃষিনির্ভর সংস্কৃতির বিভিন্ন লোকাচারের দৃশ্যরূপ। তারপরে ছিল এলাহি নৈশভোজ। বুফে টেবিলে চেনা খাবার ছাড়াও বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব খাদ্যপানীয় এবং ট্রাউট মাছের কয়েকটি পদ ছিল। জানা গেল, একটি সরকারি ট্রাউট ব্রিডিং ফার্ম রয়েছে উত্তরেতে।

সরকারি আয়োজন, তাতে শামিল কয়েকটি বেসরকারি পর্যটন সংস্থা ও স্থানীয়

BanglaBook.org

জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে যথারীতি ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্ব। হি-বার্মেক জেলার বিধায়কের পর পর্যটন দপ্তরের তরফে বলতে উঠলেন ডক্টর যোশি।

পর্যটন সিকিমে একটি প্রধান শিল্প— ডক্টর যোশি বললেন— কিন্তু বহুকাল ধরেই সেটি গ্যাংটক-কেন্দ্রিক আর পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিস্ট নির্ভর। সরকারের তরফে আমরা চাইছি দেশবিদেশের মানুষেরা আরও বেশি করে আসুন, সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে আসুন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই উদ্যোগ। আপনারা পাঁচদিন শিঙ্গালিলার প্রকৃতি উপভোগ করলেন, আজ রাতে এখানে বিশ্রাম নিয়ে আরও একটি দিন স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর আতিথ্য আর সংস্কৃতি উপভোগ করুন। এখান থেকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে আপনাদের হি, বার্মেক আর মার্তামে নিয়ে যাওয়া হবে, গ্রামের ভেতর স্থানীয় মানুষের গৃহে হোম স্টে।

পরদিন বিদায়ের পালা। এতদিন একসঙ্গে একটি বৃহৎ পরিবারের মতো কাটাবার পর মধুর বিষাদ মেশা, ছবি তোলা, ঠিকানা বিনিময়— যেমন হয়। এখান থেকে সোজা গ্যাংটকে ফিরে যাবেন ডক্টর যোশি, তার আগে ট্রেকিং-এর জিনস-টিশার্ট ছেড়ে আমলার স্যুট পরে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গেই আরেকটি গাড়িতে ফিরে যাবে নাচগানের মেয়েদের দলটি। জানা গেল, ওরাও গ্যাংটক থেকেই এসেছে। শহুরে সাজ আর আদবকায়দার ভেতর থেকে আগের রাতের এথনিক পোশাক আর ভারি গয়নায় মোড়া সেই আদিবাসী কৃষককন্যাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আমাদের দলে সেই গায়ক পুরুষকে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দেখেছিলাম একঝলক— ডাইনিং হলের পেছনে খোলা জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে উবু হয়ে বসে খাচ্ছে, ওর সামনে থাবা পেতে বসে আছে একটি ছাইরঙা কুকুর। সকালবেলায় দেখতে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভোরে উঠেই সে হাঁটা দিয়েছে বনের ধারে ওর গ্রামের দিকে।

আমাদের ও এক ফরাসি দম্পতির জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল মার্তাম গ্রামে শেরিং লেপচার বাড়িতে। বছর তিরিশের স্মার্ট সুবেশ যুবক শেরিং নিজেই স্কর্পিও চালিয়ে এসেছিল অতিথিদের বাড়িতে নিয়ে যেতে। ঠিক হয়েছিল মার্তামে যাবার আগে আশেপাশে কয়েকটি দ্রষ্টব্য ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে আমাদের। তার আগে রিসর্টের কম্পিউটারে নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলে ওর বাড়ি আর গ্রামের আগাম ঝাঁকিদর্শন করিয়ে দিল।

গ্যাংটকের গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে বি কম পাস করেছে শেরিং। ওর মতো অন্যান্য হোম স্টে-র কারবারিরাও সকলেই তরুণ প্রজন্মের— শিক্ষিত, উদ্যমী, ইংরেজিপটু ও প্রযুক্তিবান্ধব। জানা গেল, এদের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন রয়েছে। সরকারি পর্যটন দপ্তরের ছত্রছায়ায় প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের ঋণ ও পর্যটকদের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদির ব্যাপারে সহায়তা দেয় সংগঠন। এভাবে গোটা সিকিম জুড়ে কর্মসংস্থান হয়েছে কয়েক হাজার পরিবারের। খুব সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটি ব্যাপার দেখে মনটা একটু দমে গেল। অভিযাত্রীদলে যে কয়জন বিদেশি ছিল, তাদের নিজের নিজের অতিথিনিবাসে টানার জন্য একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলছিল।

BanglaBook.org

শেষপর্যন্ত দিশি ও বিদেশি অতিথিদের মধ্যে থেকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে যাবার একটা রফাসূত্র বের হল ওদের মধ্যে থেকেই। অবশ্য তাতে সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায়নি, কারণ আমাদের মধ্যে অভারতীয়ের অনুপাত ছিল এক চতুর্থাংশ। যাইহোক, সেই সুবাদে শেরিং লেপচার কপালে আমরা জুটলাম এক ফরাসি দম্পতির সঙ্গে লেজুড় হিসেবে।

পুরোপুরি ফরাসি অবশ্য নয়, ঠিক সেই অর্থে দম্পতিও নয়। নারীটি দক্ষিণ এশিয় বংশোদ্ভূত এবং ওরা বসবাস করছিল যুগলে— যাকে বলে লিভ টুগেদার। বয়স দুজনেরই মধ্য তিরিশ। অঢেল ছুটি আর পরিমিত পুঁজি নিয়ে ভারত ও নেপালে, মূলত হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করছিল ওরা। গ্যাংটকে থাকাকালীন এই ট্রেক প্রোগ্রামের খবরটা পায়।

ফরাসি হলেও ফ্রাঁসোয়াকে ঠিক ফরাসিদের সম্পর্কে চালু ধারণার খোপে ফেলা যায় না; রোগাপাতলা নয়, আড্ডাবাজও নয়। অত্যন্ত মিতবাক, দোহারা চেহারা আর মুণ্ডিত মস্তকে অনেকটা বরং জার্মানদের মতো দেখতে। সেই তুলনায় জুন ঢের বেশি প্রগলভ আর মিশুকে। প্রতিদিন ট্রেকের শেষে মেস টেন্টে কিংবা আগুনের ধারে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা আড্ডা ধূমপানে অংশ নিত, ফ্রাঁসোয়ার তুলনায় ইংরেজিতেও স্বচ্ছন্দ ছিল সে। তবে, সম্ভবত ফ্রাসোঁয়ার ইচ্ছেতেই, সব সময়েই আগেভাগে গন্তব্যে পৌঁছে সবচেয়ে প্রান্তিক আর একান্ত তাঁবুটি বেছে নিত ওরা। কালিজারে ওদের তাঁবুটি ছিল একটি পোড়ো দেয়ালের আড়ালে, সেজন্য রাতে তুষারঝড়ে সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল ওরাই। প্রতিদিন ভোরবেলা ফ্রাঁসোয়াকে দেখা যেত বেশ কিছুটা দূরে কোনো গাছের নীচে পাথরে পদ্মাসনে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে আছে।

পশ্চিম সিকিমের অন্দরেকন্দরে হাত ধরাধরি করে চলেছে পর্যটনশিল্প আর মসৃণ পিচরাস্তা। সীমান্ত এলাকা হবার সুবাদে কেন্দ্রীয় অনুদানের একটি ব্যাপার আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে রাজ্যের উদ্যোগও চোখে পড়ার মতো। শেরিং লেপচাকে সেকথা বলতে স্টিয়ারিং থেকে একটি হাত শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বের করে আনে একটি ডঙ্গল।

—আর এইটা। আমাদের এদিকটায় প্রায় সর্বত্রই মোবাইল সিগন্যাল পৌঁছয়। হোম স্টে কারবারের বারো আনাই দাঁড়িয়ে আছে ইন্টারনেটের ওপর। বুকিং পেমেন্ট সব অনলাইনেই হয়।

সবুজ পাহাড়ের মাথায় যেদিকে চোখ যায় মাথা তুলেছে মোবাইল টাওয়ার— একুশ শতকের চোর্তেন। পথের ধারে বড়ো বড়ো হোর্ডিং-এ হোটেল রিসর্ট থেকে শুরু করে তিস্তার বুকে রিভার ক্রুজ— নানা ধরনের বর্ণময় পর্যটক-টানা বিজ্ঞাপন। আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য সিংশোর ব্রিজ, এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম ঝুলন্ত সেতু। তার ঠিক মাঝখানে নির্দিষ্ট স্পট-এ অতল খাদ আর গগনচুম্বী পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে একদল পর্যটক। আমাদের ট্রেক দলের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আবার এক প্রস্থ হাই-বাই, আবার গাড়ি ছোটে আরেকটি দ্রষ্টব্যে, পাহাড়ে পর্যটনের পরিভাষায় যাকে বলে পয়েন্ট।

BanglaBook.org

হি গ্রামের শেষে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে একটি ঝর্ণার ওপর একটি অতিকায় বৌদ্ধ প্রার্থনাচক্র তৈরি হচ্ছে। এক কোটি টাকা বাজেট, শেরিং জানাল। পিচরাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে বিশাল কংক্রিট প্যাভিলিয়নের ভেতর চক্রের কাছে। ঝর্ণা থেকে টানা হচ্ছে কৃত্রিম নালা, কাজ শেষ হলে প্রবাহিত জলে চক্র ঘুরবে। এপাশে অস্থায়ী ছাউনি বানিয়ে বৌদ্ধ মন্ত্র আর প্রতীক চিহ্নিত বড়ো বড়ো ফাইবারের টুকরো ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ করছে উত্তরভারতীয় শ্রমিকেরা। নীচে পর্যটকদের জন্য তৈরি হচ্ছে শৌচালয়। (তার নালিও কি ঝর্ণাতেই গিয়ে মিশবে? মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে বর্জ্য তরল প্রার্থনাচক্রে উঠে আসবে না নিশ্চয়ই?) ঝর্ণার দুপাশে খাড়া পাথরের গায়ে ঝালরের মতো অতিকায় সব ফার্ন, মাটি আঁকড়ে সুপ্রাচীন বার্চ পাইনের শিকড় শ্যাওলায় ঢাকা, জলের কলোচ্ছ্বাসে মিশে যাচ্ছে নানান পাখির ডাক। আর এসবের মাঝে এক কোটি মূল্যের কংক্রিট-সেরামিক-ফাইবারের ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এমন দিনে পর্যটকের কোলাহল আর গাড়ির হর্নের নীচে চাপা পড়ে যাবে জলের ধ্বনি, পাখির ডাক।

সেই আগামীর প্রস্তুতিতে ইতিমধ্যেই রাস্তার ধারে গজিয়ে উঠেছে দুটি রেস্টুরেন্ট ও চা-পানীয়ের দোকান। দেখামাত্র জুনের চা তেষ্টা পেয়ে যায়।

আহ, ত্যে! বলে রোদচশমা কপালে ঠেলে সে ঢুকে পড়ে দোকানের ভেতর। সেখানে মোমো তৈরি হতে দেখে খিদেও পেয়ে যায় ওর। ফ্রাঁসোয়া বাদে আমাদের সকলের জন্যই মোমো অর্ডার দিয়ে দেয় শেরিং। গম্ভীর মুখে ফ্রাঁসোয়া দোকানে সাজানো নানান ধরনের দিশি বিদেশি চিপস, বিস্কুট, চকোলেট, শুকনো ফল, সফটড্রিঙ্ক, বিয়ার, ফলের রস ইত্যাদির লেবেল খুঁটিয়ে পড়ে উপযুক্ত খাদ্যপানীয়ের সন্ধান করে।

অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত প্লাস্টিকের প্যাকেট, টেট্রাপ্যাক ও অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান: তাদের গায়ে লেখা আছে দাম, উৎপাদনের তারিখ, উপাদান, রং ও প্রিজারভেটিভের রাসায়নিক গোত্র, ক্যালরির মাপ ও প্রস্তুতকারী কারখানার ঠিকানা— যা পড়তে শুরু করলে সুরাট থেকে সাংহাই, পুণে থেকে পেনাং, এক কথায় গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মানচিত্রটাই উঠে আসে। দূরদূরান্ত থেকে এই প্রত্যন্ত পাহাড়ে সেগুলি বয়ে আনতে কত পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়েছে, তা অবশ্য লেখা নেই। বোতল আর টেট্রাপ্যাকগুলো যে জীবাণুবিয়োজ্য নয়, সেগুলি আগামী কতকাল অবিকৃত হয়ে যাবে এই পার্বত্য প্রকৃতির মাঝে, লেখা নেই তাও।

হি গ্রামে দৈত্যাকার প্রার্থনাচক্র থেকে বার্মেকের স্থানীয় লোকশিল্পের এম্পোরিয়াম, সেখান থেকে ডেন্টামের চিজ কারখানা হয়ে মার্তামে শেরিং লেপচার বাড়ি পৌঁছতে বিকেল গড়াল। তার আগে নীচের খাদ থেকে ঘন কুয়াশা উঠে আলো কমে এসেছে, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পিচসড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় প্রায় সত্তর ফুট নেমে পাহাড়ের খাঁজে শেরিংদের বাড়ি। চারপাশে উঁচু উঁচু পাইন আর উইলো গাছে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা, টুপ টুপ করে জল ঝরে পড়ছে পাতার থেকে। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে গ্রামে নীচের ঢালে বসতি।

BanglaBook.org

হলুদ বাঁশ বেতলতায় বেঁধে তৈরি গেট, ওপরে ঝুলছে লতানে বেগনি ফুলের গাছ। সেই ফ্রেমে ছবির মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন এক প্রৌঢ়: তাঁর মাথায় বাঁশে বোনা টুপির নীচ দিয়ে নেমেছে সরু পনিটেল, থুতনিতে সামান্য দাড়ি, মুখে অসংখ্য বলিরেখায় চাক বেঁধেছে অমলিন হাসি। গাড়ি থেকে নামা-মাত্র জোর করে আমাদের হাতের ব্যাগ টেনে নেন। নুড়িবাঁধানো পথে বাড়িতে ঢুকে শেরিং আলাপ করিয়ে দেয়— ওর বাবা, কেসাং লেপচা। ওর মা, স্ত্রী, এক অধবা পিসি ও এমনকি পোষা কুকুর ও বেড়ালের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয় একে একে। মা আর পিসির পরনে গাউনের মতো সাবেকি ধরনের পোশাক, গলায় একরাশ গয়না। স্ত্রীর পরনে অবশ্য জিনস কামিজ। কুকুরটি সন্তানসম্ভবা। কাঠ-পাথরে তৈরি সাবেকি মূল বাড়িটির লাগোয়া এক চিলতে বাগানে মুরগির ঘর, সবজির খেত, গোয়ালের ছাউনি (যা রূপান্তরিত হয়েছে গ্যারেজে) আর সম্পূর্ণ পাইনকাঠে তৈরি একটি দোতলা কটেজ, অতিথিদের জন্য। ছবির মতন, আক্ষরিক অর্থেই, যা আমরা দেখেছি নাগবেলি রিসর্টের কম্পিউটারে। সেই কটেজের একতলায় বসার ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে খাদা আর ছাং-সাম্বা দিয়ে অভ্যর্থনা করেন ওর মা, সেইসঙ্গে কপালে টিকা পরান ও দলের দুই নারীর মাথায় ছোঁয়ান ফলন্ত যবের ছড়া। আমরা থালার ওপর মুদ্রা রাখি।

অভ্যর্থনাপর্ব মিটতেই সুদৃশ্য পোর্সেলিনে চা নিয়ে আসেন শেরিঙের পিসি, ট্রেতে ঘরে তৈরি অনেকটা শেলের মতো ভাজা রুটি নিয়ে আসে ওর স্ত্রী, আর শেরিং স্বয়ং বেশ একটু আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ওর পরিবার, বাড়ি ও গ্রাম সম্পর্কে একটি দীর্ঘ উপক্রমণিকা শুরু করে দেয়, যার উদ্দিষ্ট শ্রোতা মূলত ফ্রাঁসোয়া ও জুন। কেমন যেন মনে হয় সাজানো অভ্যস্ত ভঙ্গি, সকলেই যে যার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমনকি পোষা প্রাণীগুলিও— কুকুরটি শুয়ে পড়েছে দরজার বাইরে পাপোশে আর হৃষ্টপুষ্ট বেড়ালটি লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে শেরিঙের কোলে। ওর বাবাকেই দেখা যায় না কেবল। আমাদের ব্যাগপত্র নামিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন সবজির বাগানে। বাড়ির রান্নাঘরে যাবতীয় সবজি বাগান থেকেই আসে, শেরিং সগর্বে জানায়— পিওর অরগ্যানিক ফার্মিং! অতিথিশালার একতলায় প্রশস্ত বসার ঘরটি বিশেষ ভাবে সাজানো। মেঝের ওপর কুশন পেতে বসার ব্যবস্থা, কয়েকটি নীচু রঙিন চিত্রিত টেবিল, বৌদ্ধ মন্দিরে যেমন দেখা যায়; এছাড়া ঘরের কোণে সাবেকি পাথরের যাঁতা, ঢোল, বর্শা ইত্যাদি রয়েছে। দেয়ালে পরিবারের কয়েকটি ফোটোগ্রাফ— সাম্প্রতিককালে তোলা কিন্তু সিপিয়া প্রিন্ট— আর মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিঙের একটি বড়ো ব্লো-আপ। চামলিঙের ছবিটি বাদ দিলে আর সবকিছুই চর্চিত, শিল্পসম্মত, অনেকটা যেন মিউজিয়ামের মতো; জীবন্ত মিউজিয়াম।

হোম স্টে সংগঠন থেকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে কি এই বিষয়গুলিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়? শেরিং লেপচাকে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ওদের বাড়িতে পা রাখার পর থেকেই এমন একটা অনুভূতি মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের লাগোয়া খাবার ঘরে বসে, কিংবা ডিনারের পর বাড়ির লোকেদের

BanglaBook.org

সঙ্গে ভাষার বাধা সরিয়ে অল্পবিস্তর আলাপচারিতার মাঝে, শেরিঙের অভ্যস্ত পারিবারিক রসিকতার ফাঁকে মনে হচ্ছিল সবকিছুই কেমন যেন নিখুঁত পরিপাটিভাবে সাজানো: একটি জীবনধারা যেন সহজ পাঠোপযোগী বয়ানের মতো করে খুলে মেলে ধরা হচ্ছে। পরদিন সকালে আমাদের চলে যাবার কথা, কিন্তু থাকলে কী কী করা যায়, গ্রামে কী কী দেখা যায়, কোথায় একটি ছোটো ট্রেক করে নেওয়া যায়, সেইসব (শেরিঙের ভাষায় 'অ্যাক্টিভিটি') নির্দিষ্ট করে ছকা রয়েছে।

দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে বেরিয়ে ক্লান্ত শহুরে মানুষ হয়তো এমনই চায়, যেখানে এথনিকের সঙ্গে মিশে থাকবে পেশাদারিত্ব, সাবেকি অভ্যর্থনার আচারের সঙ্গে আধুনিক সুবিধাযুক্ত বাথরুম, প্রত্যন্তের অনুভূতির সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। কী জানি। কিন্তু দীর্ঘকাল বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি গ্রাম্য মানুষের সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা থেকে আমার পুরো ব্যাপারটাই একটু যেন কৃত্রিম মনে হয়েছিল। পাঁচদিন শিংলিলার ব্যাপ্ত প্রকৃতির মাঝে কাটাবার পর সেই অনুভবটা তীব্র হয়েছিল আরও।

বদলে যাচ্ছে পাহাড়ের জনজীবন, বদলে যাচ্ছে মানুষ, বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি, এমনকি পাহাড়ের আকাশরেখাও। নাগরিক দূষণ আর আবর্জনা এসে জমছে। শুধু যে বাইরেটা বদলাচ্ছে তাই নয়, বদল ঘটছে ভেতর থেকেও। যে জীবনছবি দেখেছিলেন জর্জ বোগল, যা দেখেছিলেন জোসেফ হুকার, তারপর শরৎ চন্দ্র দাস, দু-দুটো শতাব্দী জুড়ে যা ছিল স্থির, অপরিবর্তনীয়, সেসব কিছু হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

অবচেতনে হয়তো এই ভাবনাটার একটা রেশ ছিল, তাই ভোরবেলায় স্বপ্নে দেখলাম শরৎ দাসের প্রথম তাশিলুম্ফো দর্শনের সেই ছবি— সোনালি সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে অসংখ্য মন্দির গোম্ফা চোর্তেন পেগোডের চুড়ো, আর তার ভেতর থেকে পাক খুলে উঠে আসছে এক অদ্ভুত করুণ ছমছমে বাঁশির সুর।

মোরগের ডাকে স্বপ্নটা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু বাঁশির তান রয়েই গেল। বাঁশি বাজাচ্ছিলেন কেসাং লেপচা।

শেরিংদের বাগানে মকাই খেতের আড়ালে ছোট্ট কাঠের গাজেবোর মতো প্রার্থনার ঘর। প্রতিদিন ভোরে সূর্য ওঠার সময় কেসাং চলে যান সেই ঘরে। ছফুট বাই ছফুট অনাড়ম্বর কুঠুরির ভেতর চমরি লোমের জাজিম পাতা, তার ওপর নীচু খাজাঞ্চির টেবিল। দেরাজে চামড়ায় মোড়া একটি প্রার্থনার বই আর টেবিলে একটি বড়ো আড়বাঁশি রাখা। জাজিমে হাঁটু মুড়ে বসে কেসাং প্রথমে বই খুলে মন্ত্রপাঠ করেন প্রকৃতিদেবীর উদ্দেশ্যে, বিগত দিনগুলির মতো আনকোরা নতুন একটি দিনে প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব সংসারে অনুপ্রবেশ করার জন্য আগাম মার্জনা ভিক্ষা করেন। তারপর বাঁশিটি দুহাতে ধরে ফুঁ দিয়ে তোলেন এক সরল পবিত্র সুর, চিন্ময় জগতে নতুন দিনের সকালকে, গাছ লতা পাখি পাথর কেঁচো ঝর্ণা ও অশরীরী শক্তিদের আবাহন করেন।

BanglaBook.org

কেসাং অ্যানিমিস্ট বন ধর্মাবলম্বী, লেপচাদের মধ্যে যা বৌদ্ধধর্ম আসার আগে প্রচলিত ছিল সভ্যতার আদিকাল থেকে। মার্তামের লেপচা বসতিতে এগারোটি পরিবারে এখনও মেনে চলা হয় এই ধর্মীয় রীতি। তবে শেরিঙদের বাড়ি বৌদ্ধ আচারও পালিত হয় তিথিনক্ষত্র মেনে, সরকারিভাবেও ওরা বৌদ্ধ হিসেবেই নথিভুক্ত।

রসুইঘরের লাগোয়া হলঘরে আমাদের সকালের চায়ের আসরে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে এই কথাগুলো বললেন কেসাং লেপচা। প্রার্থনা সেরে আসার সময় বাগান থেকে কালচে সবুজ র‍্যাস্পবেরি তুলে এনেছিলেন ; তখনও পাকেনি, কিন্তু তীব্র তাজা স্বাদ। আগের দিন ডেন্টাম থেকে কেনা দিশি সাবানের গোলার মতো হলদে রঙের গাউডা চিজের সঙ্গে জমেছিল বেশ। ফ্রাসোঁয়ার কাছ থেকে জানা গেল, নেদারল্যান্ডের গাউডা নামের একটি শহরের থেকেই নামকরণ এই চিজের, তবে এখন পৃথিবীর সর্বত্রই তৈরি হয়। অ্যালপাইন অঞ্চলে কিছু বিশেষ ধরনের ঘাস জন্মায়, সেই ঘাস খাওয়া গরুর দুধের থেকে হয় চিজ, ঋতু আর উচ্চতার ওপরে নির্ভর করে স্বাদের বিশিষ্টতা।

নির্মল সকালবেলায় ফ্রাসোঁয়ার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য খসে গিয়েছিল, বেশ গল্পগাছার মেজাজেই ছিল সে। জুন বিছানা ছেড়ে ওঠেনি তখনও।

ঘরটা বেশ বড়ো, মেঝেয় পুরোনো পাথর বিছানো, ওপাশে রান্নার জায়গাটি দু ধাপ নীচে। মাটির উনুন, ওপরে মাচায় জ্বালানি কাঠ ডাঁই করা রয়েছে। একদিকে গ্যাসের ব্যবস্থাও আছে। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের বাসনপত্র, রান্নার আধুনিক সরঞ্জাম, এমনকি একটি মাইক্রোওয়েভ আভেনও। চাল থেকে ঝুলছে ভুট্টা রসুন আর ছত্রাকের ছড়া, তাকের ওপর পরিপাটি সাজানো বাঁশের কোঁড় পাহাড়ি লঙ্কা ডল্লোখুরসানি বুনো টমাটো ইত্যাদির আচার। বসার এই ঘরটির মাঝখানে মেঝেয় পাথরের ফাঁকে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা। ঘরের একটি দিক খোলা বাগানের দিকে, সেখানে ফলন্ত ইসকুশলতা ঝুলছে। গাছপাতার ফাঁক গলে আসা একফালি রোদে পোষা বেড়ালটি তাড়া করে ফিরছিল এক জোড়া হলুদ রঙের প্রজাপতিকে। কুকুরটি যথারীতি শুয়েছিল পাপোশের ওপর।

আমাদের জন্য প্রাতরাশ বানানোর কাজে বউয়ের সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল শেরিং, ওর মা প্লাস্টিকের গামবুট পরে মাথায় একটি নীল স্কার্ফ বেঁধে বাইরে মুরগির ঘর সাফ করছিলেন। রেডিও নেপাল বাজছিল। একটি পরিবারের সহজ স্বাভাবিক ছবি। আগের দিনের সেই আনুষ্ঠানিকতা খসে গিয়েছে সকালের প্রাত্যহিকতার চাপে।

উনুন থেকে চিমটে করে কয়েকটি জ্বলন্ত কাঠকয়লা এনে পাথরের ফাঁকে রেখে কেসাং লেপচা বসলেন আমাদের সামনে, বলতে শুরু করলেন তাঁদের আদিভূমির কথা।

উত্তর সিকিমের জোঙ্গু উপত্যকায় কেসাংদের আদি গ্রাম, সেখানে এলাচের বাগান ছিল ওঁদের। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত লেপচাদের কাছে জোঙ্গু হল পবিত্র উৎসভূমি। সৃষ্টির আদি ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে প্রকৃতি মায়ের বুকের ওপর জোঙ্গুতে জন্ম হয়েছিল লেপচা জাতির। মৃত্যুর পরে সকল লেপচার বিদেহী আত্মা ফিরে যায় সেখানে।

জোঙ্গু উপত্যকা লেপচা রিজার্ভ হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সে শুধুই খাতায় কলমে। প্রকৃতপ্রস্তাবে জোঙ্গু এক আক্রান্তভূমি, সেখান থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে আদি বাসিন্দারা। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের চেনা গল্প।

—অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে ওখানে, ফ্রাসোঁয়াকে কথাবার্তার খেই ধরিয়ে দিই আমি।

—ছোটবড় সব মিলিয়ে ছাব্বিশটি, শেরিং জানায়। সবচেয়ে বড়ো যেটি, স্টেজ ফোর, তৈরি হচ্ছে তিস্তার ওপর। এই নিয়ে আন্দোলনও চলছে আমাদের।

এখানে আসার আগে ইয়ুমথাং গিয়েছিল ফ্রাঁসোয়ারা। যাবার পথে কি বিশাল আকারের বাঁধ তৈরি হতে দেখেছে, সে কথা জানায়।

উত্তেজিতভাবে হাতমুখ নেড়ে কেসাং লেপচা দেখান কীভাবে গাছপালা কেটে অরণ্য উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে অব্যক্ত আতঙ্ক আর হতাশা।

জোঙ্গু উপত্যকার পবিত্র বনে শুধু যে অসংখ্য গাছ কাটা হয়েছে তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের কাজে বাইরে থেকে অসংখ্য মানুষ এসে থাকতে শুরু করেছে, গোটা এলাকার জনবৈশিষ্ট্যটাই বদলে গিয়েছে— শেরিং জানায়। ওদের মুখে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে এক কল্পভূমির ধারণা, শত শত বছর ধরে যা এক জনজাতির বিশ্বাস আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া হয়েছে, মৃত্যুর পর যেখানে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেন কেসাঙের মতো মানুষেরা, প্রতিদিন সেই ভূমিকে তিনি জাগিয়ে তোলেন বাঁশির সুরের ভেতর।

সেই কতকাল আগে এই বাঁশির সুরের মতো এক হারিয়ে যেতে থাকা সংস্কৃতির খোঁজে দার্জিলিঙে এসেছিল জুলিয়া গ্রিফিথ। ওর অনুসন্ধানের মূল বিষয় ছিল লেপচা সমাজে বৌদ্ধধর্ম আসার অগে বন ও অন্যান্য প্রাণবাদী লোকাচারগুলো, শত শত বছর পরেও যা নাকি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নীচে টিকে রয়েছে ইটচাপা ঘাসের মতো। সত্যি বলতে কি, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর কী আশ্চর্য, সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে এখানে আমি পেয়ে গেলাম কেসাং লেপচার মতো একজন মানুষকে।

প্রাতরাশের পর মার্তাম থেকে আমরা যাব রিঞ্চেনপং। সেখান থেকে জোড়থাং হয়ে ফিরে যাব। ফ্রাঁসোয়ারা যাবে গ্যাংটকের কাছে ফোদং মনেস্ট্রি দেখতে, কালুক থেকে জিপ বদল করতে হবে ওদের। শেরিংদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে রিঞ্চেনপঙের পথে আমার মনে ছেয়ে আসে জুলিয়ার স্মৃতি। দার্জিলিঙে যে কয়েক সপ্তাহ জুলিয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেটা ছিল এক দুর্লভ প্রাপ্তি। তখন আমি পাহাড়ে আনকোরা, সমতলের গড়পড়তা বাঙালির মতো একটা পড়ে-পাওয়া রোমান্টিকতা নিয়ে চাকরি করতে এসেছি। জুলিয়ার চোখ দিয়ে ব্রিটিশের হাতে গড়া শৈলশহরটাকে দেখতে শুরু করেছিলাম আমি, দেখেছিলাম তার গায়ে সূক্ষ্ম কুয়াশার মতো বিভ্রমের স্তর। সত্যি বলতে কি, জুলিয়া আমায় উপহার দিয়েছিল একটা দেখার ভঙ্গি। একই পাহাড়শ্রেণিকে,

BanglaBook.org

একই শহরকে, একই জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ভেতরেই লুকিয়ে আছে প্রজ্ঞার রহস্যঘন চাবিকাঠি, জুলিয়া বলেছিল। এরপর সেই বিভিন্ন দেখাগুলোকেই খুঁজে গিয়েছি আমি। এমনকি শিংলিলার অরণ্যপথে ট্রেকের মধ্যে দিয়েও আসলে আমি খুঁজে গিয়েছে তিনটি শতক ধরে ঔপনিবেশিক সাহেব ও এক বাঙালির দেখাকে, তাদের দেখার ভেতর দিয়ে দেখতে চেয়েছি পাহাড়ের প্রকৃতিকে, গাছপালা পাখি পাথরকে, একটি হারিয়ে যাওয়া গ্রামের চিহ্নকে। অথচ, কী আশ্চর্য, জুলিয়া গ্রিফিথ সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল আমার স্মৃতি থেকে। ফিরে এল মার্তামে ভোরবেলায় শোনা কেসাং লেপচার বাঁশির সুরের মতো।

রিঞ্চেনপঙে জমজমাট বাজার বসেছে। বছর কয়েক আগেও রাস্তার পাশে একটি ছোট্ট ঘুম-ঘুম গ্রাম ছিল, পর্যটনের জোয়ারে রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গজিয়ে উঠেছে একাধিক হোটেলঃ কংক্রিট-টিন-মার্বেল-সেরামিক-প্লাস্টিকের টুরিস্টট্র্যাপ। তবু একই আছে রাস্তার দুধারে নানাধরনের শাক আর বুনো ছত্রাক নিয়ে বসা লোলচর্ম বৃদ্ধার দল, তাদের বিচিত্র রঙিন সাজ, গয়না আর অমলিন চেরা চোখের হাসি। আর আকাশের গায়ে আছে এক অমলিন পাহাড়শ্রেণি। কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিবেশী কাঞ্চ পাণ্ডিম কুম্ভকর্ণ সহ অনেকখানি রেঞ্জ দেখা যায় পাইন শাখার ফাঁকে।

রিঞ্চেনপং জিপস্ট্যান্ড থেকে পাথরের ধাপকাটা পথ উঠে গিয়েছে সবজি খেতের ভেতর দিয়ে। কিছুটা ওঠার পর সেই পথ গিয়ে ঢোকে ছায়াচ্ছন্ন ক্রিপ্টোমেরিয়া জাপোনিকা, ওরফে ধুপি গাছের জঙ্গলে। নীচের ঘিঞ্জি বাজার ঝিকঝিকে ভিড় আর গাড়ির হর্ন শুকনো পাতার মতো খসে যায়। পাখির ডাক শোনা যায়, পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় তুষারমৌলি। বিখ পোখরির বিষাক্ত জলরাশি ডানদিকে রেখে গোম্ফায় এসে পৌঁছতেই ছেয়ে আসে ঘন কুয়াশা। ইতিমধ্যে দূরের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলো ঢেকে গিয়েছে মেঘের আড়ালে।

আঠেরো শতকে তৈরি কাঠ আর পাথরের মেরুন-সাদা গোম্ফা, দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় প্রশস্ত সমতল জমির ওপর। এখান থেকেই দীক্ষা পেয়ে লামা হয়েছেন উগেন গ্যাৎসো। সে প্রায় শ দেড়েক বছর আগের কথা। ঘন কুয়াশার ভেতর ছুটোছুটি করে খেলা করছে একদল খুদে লামা। তাদের মেরুন জোব্বা আর চিৎকারের ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে মাঠময়। কুয়াশার আড়াল থেকে চিৎকার শোনা যায়— উগেন, ছিটো ছিটো! কুয়াশার পর্দা ফুঁড়ে একট ছুটন্ত বালক আচমকা আমাদের সামনে পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, হাঁফাতে থাকে; স্বচ্ছ কাচের মতো চোখ ওর, মুণ্ডিত মাথায় সরু রিবনের মতো একটি নীল শিরা।

মাঠের একদিকে জমিটা যেখানে উঁচু হয়ে উঠেছে, একসারি পাইন। বাতাস বইছে তার ওপর থেকে। সারা মাঠ জুড়ে বাঁশের গায়ে বাঁধা প্রার্থনার ধ্বজা উড়ছে। সেই পতাকার সরণিতে এসে দাঁড়ালে বাতাসের পতপত শব্দ ঠিক যেন দ্রুতলয়ে হৃৎস্পন্দনের মতো শোনায়।

BanglaBook.org

জুলিয়া গ্রিফিথের মতোই সুদূর ইউরোপ থেকে এই মুলুকে এসেছিলেন এক নারী, প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদ আর বৌদ্ধধর্মের টানে, বিশ শতকের গোড়ায়। তাঁর নাম আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীল। সিকিমে এসে যুবরাজ সিদকিয়ং টুলকু নামগ্যেলের সঙ্গে পরিচয় হল। যুবরাজ ছিলেন একাধারে দীক্ষিত লামা, অন্যদিকে আবার অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী, বহু ভাষাবিদ। টুলকুর সঙ্গে এলিজাবেথের গভীর সখ্য হয়, সম্ভবত প্রেমও। এই রিঞ্চেনপং গোম্ফার মাঠে, এই হৃৎস্পন্দিত প্রার্থনা ধ্বজার অরণ্যে প্রথম দেখা হয় দুজনের। তখন যুবরাজ টুলকুর বয়স বত্রিশ, এলিজাবেথ চল্লিশোর্ধ্বা। সেই সাক্ষাতের কথা এলিজাবেথ লিখে গিয়েছেন তাঁর বইতে। দু বছরের মধ্যেই রহস্যময় কারণে মৃত্যু হবে টুলকুর, তখন তিনি সিকিমের রাজা। এলিজাবেথ ডেভিড-নীল বাঁচবেন একশো দুই বছর। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি ভোলেননি এলিজাবেথ।

হরিদ্রাভ ত্বক, ছোটখাট চেহারার মানুষটি— আলেক্সান্দ্রা লিখছেন— পরনে কমলা জরি-বসানো পোশাক, টুপিতে একটি হিরের নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। যেন চারিপাশের পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন এক অলৌকিক পুরুষ। শুনলাম উনি নাকি পুনর্জন্ম পাওয়া এক লামা*, এবং সিকিম দেশের যুবরাজ। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছিল উনি আদপেই রক্তমাংসের মানুষ কী না। জমকালো সাজে সজ্জিত ছোট্ট ঘোড়ায় আসীন, সঙ্গে দলবল রামধনু-রঙিন পোশাক পরা: মনে হচ্ছিল বুঝি চোখের পলক পড়লে মরীচিকার মতো অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি এক বিমুগ্ধ বিস্ময়, যার ভেতরে আমি এক পক্ষকাল বেঁচেছি। আমার জীবনের এই পর্যায় যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া।[৪]

পতাকার সরণি দিয়ে হেঁটে আসি গোম্ফার ভেতর। সমবেত মন্ত্রপাঠ শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, এক তরুণ লামা লম্বা কার্পেটের আসন গুটিয়ে তুলছে। চমরি মাখনের দীপ জ্বলছে বেদির ওপর। সেই আলোয় চিত্রিত আঁধারে যেন ভেসে রয়েছেন কৃষ্ণকায় বুদ্ধ, ধ্যানের ভঙ্গি কিন্তু দুটি চোখ বিস্ফারিত। তাঁর কোলের ওপর মুখোমুখি দুই পায়ে কোমর জড়িয়ে বসে আলিঙ্গনাবদ্ধ এক নগ্ন শ্বেতাঙ্গিনী। প্রজ্ঞা জড়িয়ে ধরেছে করুণাকে।

BanglaBook.org

---

* যুবরাজ টুলকু সম্পর্কে মনে করা হতো ওঁর কাকা অষ্টম চোগিয়াল, যিনি ফোদং গোম্ফার প্রধান লামা ছিলেন, পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছেন।

বিস্মৃতির শহরে

সেবার জুলিয়া গ্রিফিথের সঙ্গে শিংলিলার জঙ্গল থেকে ফিরে এক আত্মীয়বিয়োগের খবর পেয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। এক পক্ষকাল পরে দার্জিলিঙে ফিরে জানতে পারলাম জুলিয়া চলে গিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ঘুরে স্বদেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা ও বলেছিল আমায়। কিছুদিন পরে পিকচার পোস্টকার্ড আসতে শুরু হল— ম্যানিলার আকাশরেখা, কুয়ালালামপুরের মনুমেন্ট, তাইওয়ানের আদিবাসী দম্পতি, পোখারা লেকের জলে অন্নপূর্ণা, ফুকেতের সমুদ্রে ডলফিনের লাফ...

দার্জিলিঙের আর্দ্রতায় পোস্টকার্ডগুলো বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দুতিনটি আজও রয়ে গিয়েছে আমার কাছে ; হলদে হয়ে এসেছে, পিছনে টানা হস্তাক্ষরে দু-চারটি লাইন ফিকে হয়েছে। কিন্তু সবজেটে চোখ, সোনালি চুল, নাকের দুপাশে ন্যাশপাতির মতো রোদপোড়া দাগ— এমন কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়া জুলিয়ার মুখের কোনো স্মৃতি আমার নেই। আজ এতদিন পরে মনে হয় জুলিয়া আসলে ছিল একটি রূপক, আমার ভেতরে জমে থাকা একটি ধারণার মূর্ত অবয়ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা, রেন অ্যান্ড মার্টিনের গ্রামার বই আর স্টেটসম্যান কাগজ ছেনে আমার মনে সেই ধারণা ছেলেবেলা থেকে গেঁথে তুলেছিলেন আমার দাদু। তিনি ছিলেন ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টার। জীবনের কয়েক সপ্তাহ আমি সেই রূপকের মধ্যে বেঁচেছি। দাদুর মৃত্যু আর জুলিয়ার হারিয়ে যাওয়া যে একই সঙ্গে ঘটল, সেটা কাকতালীয় হয়তো নয়।

প্রথম যৌবনে কর্মসূত্রে একবার মাত্র দার্জিলিং গিয়েছিলেন দাদু। তার দুটি স্মারক আমাদের বাড়িতে ছিল। প্রথমটি একটি ছোট্ট ফ্রেমবিহীন ফোটোগ্রাফ, বইয়ের আলমারির ভেতর রজেটের থিসরাসের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা: ঝাপসা ব্রোমাইড প্রিন্টে খুঁটিয়ে দেখলে চেনা যায় অবজারভেটরি হিলে পাইনবনের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক, পরনে কাঁচিপাড় ধুতি, গলাবন্ধ কোট, হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা, পাম্প শু, গলায় কমফর্টার, নাকে প্যান্স-নে। দ্বিতীয়টি ঠাকুমাকে লেখা একটি চিঠি, শৈলশহরের বর্ণনা দিয়ে, ইংরেজিতে। ভিক্টোরিয়ান অলঙ্কার খচিত সেই চিঠির ভাষা আমার এফ.এ. অনুত্তীর্ণা ঠাকুমা কতটা মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিলেন জানার উপায় নেই, তবে পাঁপড়ের মতো হলদে আর মুচমুচে চিঠিটি তাঁর গয়নার বাক্সে রাখা থাকতে দেখেছি আমি।

রৌদ্রতপ্ত গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে তুষারশুভ্র প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান যে হিমালয়,

BanglaBook.org

তাহারই পর্বতের শিখরে দার্জিলিং শহর বুঝি বা ব্রিটিশদিগের বুদ্ধি, উদ্যম ও শক্তির এক সর্বোত্তম সৌধস্বরূপ— দাদু লিখছেন, যার তর্জমা করলে দাঁড়াবে অনেকটা এইরকম। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা সত্যই কঠিন। পাইন দেওদার ওক উইলো শোভিত পথগুলি সর্পের ন্যায় পাহাড়ের গাত্র পেঁচাইয়াছে— অনেকটা তোমরা যেরূপ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে 'ছিরি-বরণডালা'* গড় সেইরূপ। তাহাদের ধারে ধারে ছিমছাম কটেজ ও ভিলাগুলিতে গথিক, টিউডর ও সুইস স্থাপত্যশৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। চারিধারে কেয়ারি করা ইউরোপীয় ফুলের বাগান। গ্রীষ্মকালে এগুলি ইংরেজ রমণী ও শিশুদের কলকাকলিতে ভরিয়া থাকে। এক্ষণে প্রায় জনশূন্য। পথেঘাটে দুটি চারিটি সাহেব ভিন্ন ভদ্রজন বিশেষ চোখে পড়ে না। স্থানীয় পার্বত্য মানুষেরা শহরের নিম্নে বাজার এলাকায় বসবাস করে। ইহাদের দেখিতে অনেকটা চিনেম্যানদের ন্যায়। শিশুগুলি ফুটফুটে, নারীরাও চটকবতী, তবে শুনিয়াছি বড়োই ক্লেদময় ও দুর্গন্ধযুক্ত।

তুমি চিন্তা করিও না, ডাক ও তার বিভাগের অতিথিশালায় ব্যবস্থা অতি উত্তম। এক বিহারি পাঁড়েজি আমার রান্না করিতেছে। ইহা ভিন্ন ম্যলে উৎকৃষ্ট পাঁউরুটি ও বিস্কুট পাওয়া যায়।

এই ম্যল এলাকাটি শহরের শীর্ষে, ব্রিটিশদিগের প্রমোদ ও বিচরণের স্থান। একদা এই স্থানে নেটিভদিগের জন্য কতিপয় নিষেধাজ্ঞা ছিল, এক্ষণে শিথিল হইয়াছে। অবশ্য দেশের অন্যত্র যে অশান্তির অগ্নি জ্বলিতেছে, হেথায় তাহার আঁচমাত্র নাই। সবকিছুই পূর্ববৎ, শান্ত ও স্নিগ্ধ জীবনছন্দে বিরাজমান। ম্যল ঘিরিয়া দোকানগুলিতে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য, বিশেষত মেমসাহেবদিগের পোশাক ও প্রসাধনের বিচিত্র সম্ভার। তোমার জন্য একটি উপহার কিনিয়াছি, এক্ষণে উহা রহস্যাবৃতই থাকুক।

দার্জিলিং শহরে অনেক দ্রষ্টব্য রহিয়াছে। কাজের কর্ম চুকিলে আমি সেগুলি দেখিয়া বেড়াই। তবে এই শহরের সর্বাপেক্ষা মহৎ দ্রষ্টব্য হইল কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারমৌলি। মেঘাবৃত থাকিবার কারণে এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই, তবে গতকাল সন্ধ্যায় ফ্যারেল সাহেবের মুখে ইহার যে বর্ণনা শুনিয়াছি, মনে হয় না দেখিলে জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। বিখ্যাত শৈলশহরে এক পক্ষকাল কাটাবার সেই স্মৃতি দাদুর বার্ধক্যের কল্পনায় জারিত হয়ে ছিল। চাকরির নিয়োগপত্র পকেটে নিয়ে আমি জীবনে প্রথমবার দার্জিলিং যাবার সময় সেই স্মৃতির ছবি দইয়ের ফোঁটার মতো আমার কপালে এঁকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দার্জিলিঙে এসে সেই স্মৃতির শহর দাস স্টুডিয়োয় সাদাকালো ভিন্টেজ ফোটোগ্রাফে ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাইনি আমি। সম্পূর্ণ অচেনা একটা শহর, যা আমার কল্পনায় ছিল না। সেই দাদুর মৃত্যুর পর পারলৌকিক কাজ সেরে এসে আবার

---

* শ্রী-বরণডালা। দাদু লিখছেন— chhree & varanadala

BanglaBook.org

নতুন করে অচেনা এক শহরে ফিরে এলাম আমি, অচেনা আর নির্জন, যে দার্জিলিং ছেড়ে গিয়েছিলাম সেই দার্জিলিং নয়।

সেবার শীতের ছুটিতে আমি বাড়ি ফিরিনি। সহকর্মীরা সবাই দল বেঁধে সমতলে ফিরে যাবার পর, হস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি চলে যাবার পর শুনশান কলেজের চারপাশ, সন্ধ্যার পর কোয়ার্টার কম্পাউন্ডে শিয়াল দেখা যায়। প্রফেসার নোরবুর মতো দু-তিনজনের কটেজের জানলায় আলো জ্বলে, কিন্তু আমার ওদিকে যেতে ইচ্ছে করে না, পরিচিত মানুষের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে না। ক্রমশ শীত জেঁকে বসতে শুরু হয়। স্থানীয় লোকজন অনেকেই নেমে যায় শিলিগুড়ি বা অন্যত্র, কিছু কিছু দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে পরিচিত মানুষ প্রায় আর চোখেই পড়ে না। চেনা শহরে অজ্ঞাতপরিচয় আগন্তুকের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে এক বিচিত্র মুক্তির আস্বাদ পাই আমি।

ক্রিসমাসের আগে অল্প কিছু ট্যুরিস্টের আনাগোনা শুরু হয়। গ্রীষ্ম কিংবা পুজোর ছুটিতে যে গড়পড়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের ভিড়টা দেখা যায় তার থেকে স্বতন্ত্র, বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশের মানুষ, তাদের গায়ে দামি শীতপোশাক আর ব্যাগপত্রে বিমানযাত্রার স্টিকার, ম্যলের আশেপাশে দামি হোটেলগুলোতেই গিয়ে ওঠে। শহরের নীচের দিকে তাদের দেখাও যায় না সচরাচর। এই সময় শহরটা কার্ট রোড বরাবর স্পষ্ট দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় যেন, ঠিক যেমনটি হতো ব্রিটিশ আমলে— ম্যলের সংলগ্ন অঞ্চলে সাহেবমেমরা আর চকবাজার ও তার নীচে নেটিভকুল। ক্রিসমাস-নিউইয়ারের আগে রাংতায় রিবনে সেজে ওঠে ম্যলের দোকানগুলো, জিমখানা ক্লাবে আলোর রোশনাই, হাসির রোল, বার-রেস্তোরাঁর ব্যান্ড আর গীর্জায় অর্গ্যানের ধ্বনি শহরের নীচের দিকে এসে পৌঁছয় না।

শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে চকবাজারে পোর্টার আর শেয়ার জিপের ড্রাইভার খালাসিদের জটলাটাও পাতলা হয়ে আসে, অনেকেই ফিরে যায় দেশগাঁয়ে, অধিকাংশ দোকানপাটে তালা পড়ে যায়। বাজারের ভেতরদিকে সরু অলিগলি দিয়ে হেঁটে বেড়াই আমি: শুনশান পাথরবাঁধানো চত্বর, পলকা রোদে শস্যদানা খুঁটে খাচ্ছে পায়রার ঝাঁক, কোণের দিকে প্যাকিং বাক্সের কাঠ জড়ো করে আগুন পোয়াচ্ছে জনাকয় কুলি, কাঁধে তাদের অলস রশি, চমরি মাখন আর বুনো ছত্রাক নিয়ে বসেছে উলুরিঝুলুরি শাকবুড়ি, কামারের দোকানে লেপচা বুড়ো, মাথায় চেরা বাঁশের টুপি, ভুষোকালিময় দেয়ালে ঝুলন্ত দা ছুরি কাটারি খন্তা, যার আকার ও পেটাইয়ের কৌশল অবিকৃত আছে বিগত দেড়শো বছরে। শস্তা ভোট কম্বলের গাঁট নিয়ে বসেছে মুসলমান ব্যাপারীরা।

এককালে দার্জিলিং ছিল তিব্বতযাত্রার তোরণদ্বার। জোসেফ হুকার, শরৎচন্দ্র দাস কিংবা ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড থেকে শুরু করে নানান পর্যটক গুপ্তচর রাজকর্মচারী এই শহর দিয়েই গিয়েছে পাহাড়পাড়ের রহস্যের দেশে। সেইকালে এই চকবাজার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নেপাল সিকিম দিয়ে পৌঁছে যেত তিব্বত সীমান্তের দুর্গম গ্রামে,

BanglaBook.org

গিরিপথের বরফ গললে ব্যাপারীরা বেচাকেনা করতে আসত চমরির চামর, চামড়া, ধাতুসামগ্রী, ভেষজ রং। শীতের দুপুরবেলা বাজারের নির্জন গলিঘুঁজিতে আমি সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের চিহ্ন খুঁটে বেড়াই। কোনো টিকে-যাওয়া আদ্যিকেলে দোকান, মিশকালো কাঠের ঝাঁপে সেকেলে নকশা, একটি ক্ষয়াটে মুখের আদল, একজোড়া ঘোলাটে চোখের চাহনি আচমকা আমায় ফিরিয়ে দেয় দেড়শো বছর আগের এক দার্জিলিঙে— অচেনা, ছমছমে, দাস স্টুডিয়োয় ঝাপসা ছবির মতো।

যেমনটি দেখেছিল কিন্টুপ, শাংপো অভিযান থেকে ফিরে, দার্জিলিং ছেড়ে যাবার চার বছর পরে।

শ্রীমাধব

অমাবস্যা থেকে শুক্লানবমী পর্যন্ত দশদিন প্রত্যহ শাংপোর স্রোতে পঞ্চাশটি করে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সিলমোহর-আঁটা কাঠের টুকরো ভাসিয়েছিল কিন্টুপ। তারপর দুর্ভেদ্য গিরিখাত এড়িয়ে ভাটির পথে অনেকদূর চলার পর প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের সীমানায়, যেখানে একের পর এক নির্ঝরে প্রপাতে ভাঙতে ভাঙতে রহস্যনদী ঝাঁপ দিয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। বন্য হিংস্র অবোর জনজাতির বাস সেখানে। নিরুপায় কিন্টুপ ঘুরপথে ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে ফিরে এল দার্জিলিঙে। একশো বছর আগে এই অঞ্চল দিয়েই তাশিলুম্ফো গিয়েছিল জর্জ বোগল।

চমরির পিঠে ঘন কালো লোমের মতো অরণ্যে ছাওয়া দিগন্তবিস্তৃত সমভূমির বুক চিরে বয়ে চলেছে শান্ত রুপোলি জলধারা, যা সাংপো থেকে নাম পাল্টে দিবাং, তারপর লুহিতের সঙ্গে মিশে দিহাং ও অবশেষে ব্রহ্মপুত্র হয়েছে— উঁচু পাহাড়ের কোল থেকে এই দৃশ্য দেখে বুকের ভেতর যে দমফাটা উত্তেজনা অনুভব করেছিল কিন্টুপ, তেমনই এক অনুভূতি সে ফিরে পেল চার বছর পরে দূর থেকে দার্জিলিঙের পাহাড় দেখে। তখন দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে, পাহাড়ের মাথায় নেমে এসেছে সজল মেঘ, অনেক নীচে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে রঙ্গিত। উলটোদিকের পাহাড়ে গোপালক গুরুঙদের বসতিতে আশ্রয় নিল সে। সন্ধ্যা নামার পর ক্রমশ মেঘ সরে গেল, আঁধার আকাশের গায়ে মিটিমিটি করতে লাগল দার্জিলিঙের আলো।

তখনও দার্জিলিঙে বিদ্যুৎ আসেনি, ম্যালের রাস্তায় কেরোসিনের বাতি জ্বলে। দূর থেকে তার আলো ক্ষীণ তারার মতো দেখায়। চারটে বছর অবিশ্বাস্য কঠিন জীবন কাটাবার পর প্রবাসের শেষ রাতে নিজের শহরের আলো দেখে কী মনের অবস্থা হয়েছিল কিন্টুপের ? ওই আলোর মধ্যে সে বুচারবস্তির নীচের দিকে একটি ছোট্ট ঘরের আলো খুঁজেছিল কি ? জানার উপায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই এসব কথা ওর বয়ান থেকে লেখা সরকারি রিপোর্টে নেই। পদে পদে জীবন বিপন্ন করে একটা অসম্ভব কাজ ঠিকভাবে

BanglaBook.org

সম্পন্ন করতে পারার একটা তৃপ্তিতে হালকা হয়ে ছিল মন। ঘরে ফেরার উত্তেজনায় অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। গুরুঙদের কুঁড়েয় ওর ঠাঁই হয়েছিল একতলায় নীচু সুড়ঙ্গের মতো একটা ঘরে ; একপাশে ডাঁই করা শুকনো মকাই পাতা, চাষের সরঞ্জাম। ওপরে কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে ঘরকন্নার শব্দ আসছিল: বাসনপত্রের ধ্বনি, শিশুর কান্না, মানুষের কথাবার্তা। পরদিন ভোরের আগে বেরিয়ে পড়ল কিন্টুপ।

উৎরাই পথে নেমে রঙ্গিতের পাড়ে এসে পৌঁছোতে আলো ফুটে গেল। বড়ো বড়ো বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে কলোচ্ছ্বাসে বইছে নদী, ওপরে পলকা বাঁশের সাঁকো। এপারে কয়েকঘর লিম্বুদের বসতি ; বেতের বোনা শঙ্কু আকৃতির মাছ ধরার জাল ঘরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। দার্জিলিং পাহাড়ে ওঠার পথে এক জায়গায় দেখল একসারি ঘাসে-বোনা চালা, ভেতরে ডাঁই-করা আলুর বস্তার পাশে ঘুমোচ্ছে দুজন কুলি। চার বছর আগে এই পথে যাবার সময় চালাঘরগুলো ছিল না। আরও খানিক ওঠার পর দেখা হয়ে গেল একদল তিব্বতি ব্যাপারীর সঙ্গে ; খচ্চরের পিঠে মোট চাপিয়ে নেমে আসছে তারা। ক্রমশ যত শহরের কাছে এগোয়, ততই কেমন যেন অচেনা লাগে কিন্টুপের। নীচের দিকে ঢালে অনেকটা জঙ্গল সাফ হয়ে সবুজ মখমলের মতো ঘন নীচু চা গাছের বাগান। সাদা রঙের অনেকগুলো কটেজ দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে। একটা আবছা সন্দেহ জমে কিন্টুপের মনে: পথ ভুল করে অন্য কোনো জনপদের দিকে চলেছে না তো সে? কিন্তু এই পাহাড়ি ঢাল, এই গিরিশিরার গড়ন, রঙ্গিতের এই খাত কোনোভাবেই ভুল হওয়া সম্ভব তো নয়। আরও কিছু পথ ওঠার পর দুজন কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করে নিঃসন্দেহ হয় সে ; হ্যাঁ, এটাই দার্জিলিং।

আলেবোং গ্রামের দিকটায় কার্ট রোডে ওঠার পর সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। চারবছর আগে যে শহর ছেড়ে গিয়েছিল সে, এ সেই দার্জিলিং নয়। উজ্জ্বল মেঘমুক্ত দিনের বেলায় পথে অসংখ্য মোষের গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, বিচিত্র পোশাক-পরা লোকজন, চারিদিকে নতুন বাড়িঘর। বাজার এলাকাটা গমগম করছে, খোলা চত্বরে মেলা বসে গিয়েছে যেন। এতকাল পরে এক জায়গায় এত মানুষ দেখে ঘোর লেগে যায় কিন্টুপের, সন্ত্রস্ত নিশি-পাওয়ার মতো পথে চলতে থাক সে। ওর বিশ্রস্ত বেশবাস দেখে ভুরু কুঁচকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে এক লামা ভিক্ষু, মোজাজুতো-পরা দুই গোর্খা রমণী খিলখিল করে হেসে ঠোঁট চাপড়ে বলে ওঠে— আম্মাম্মাম্মাম্মা! বাজার ছাড়িয়ে যতই এগোতে থাকে, তত বেড়ে চলে বিভ্রমের ঘোর ; পথচারীদের কথাবার্তা শুনে ভাষা বুঝতে পারে না। কসাইখানার কাছে এসে দূর পথের বাঁকে একটা বিচিত্র ধাতব শব্দ শুনতে পায় কিন্টুপ। শব্দটা ক্রমশ বাড়তে থাকে, এগিয়ে আসতে থাকে, মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে ধস নামছে, অসংখ্য পাথর গড়িয়ে নামছে। পাথর নয়, লোহা। অথচ কী আশ্চর্য, রাস্তায় এত মানুষজনের মধ্যে কোনো হেলদোল নেই, যে যার নিজের মতো করে পথ চলেছে, গল্পগাছা করে চলেছে। পুরো ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

BanglaBook.org

আর তারপরেই দেখা যায়, স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন, যা পেমাকোচুং মঠের দেয়াল থেকে কিন্টুপের দিকে চেয়ে থাকত রাতের পর রাত: এক বিকট নীল আগুনমুখো সাপ। সেই সাপটাই পথে নেমে এসেছে এই দিনের বেলায়, প্রবল আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে ধেয়ে আসছে, তার মাথার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভসভস করে, পেটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে গিলে খাওয়া একদল মানুষ।

—নাগ! নাগ! বলে আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনদিকে ছুটতে শুরু করে কিন্টুপ, আর এঁকেবেঁকে তাকে গিলে খাবার জন্য তেড়ে আসতে থাকে ইস্পাতের কিম্ভূত জানোয়ারটা, কানফাটানো হুঙ্কার দিতে থাকে। রঙ্গ দেখতে পথে লোক জমে যায়, মদেশিয়া গাড়োয়ানগুলো জিভ ঘুরিয়ে মোষের হ্যাটা দিতে থাকে, কিন্টুপ তবু ছুটতে থাকে প্রাণপণে। ঘোড়ায় চড়ে লঘু চালে আসছিল এক ইংরেজ, ছুটতে ছুটতে তার মুখোমুখি এসে পড়ায় কিন্টুপের চুলের মুঠি ধরে দ্রুত টেনে নেয় রাস্তা পাশে। অশ্বারোহীর পা জড়িয়ে ধরে ককিয়ে ওঠে কিন্টুপ—

—নাগ! সাহিব! নাগ!

কিন্টুপের কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ইস্পাতের চাকার ঝমাঝম ধ্বনির ভেতর চিৎকার করে ওঠে সাহেব:

—ইটস আ ট্রেন, ইউ ব্লাডি ফুল! আ ট্রেন!

চার বছর আগে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গুপ্তচর হয়ে যখন দার্জিলিং ছেড়েছিল কিন্টুপ, তখন রেলের লাইন পাতা শুরু হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সেন্ট অ্যান্ড্রুর গীর্জার নীচের দিকে পাহাড় কেটে জঙ্গল সাফ হয়েছে, মোষের গাড়িতে করে ইস্পাতের সেতুর অংশ আসছে সারাদিন ধরে। বুচারবস্তিতে কিন্টুপের প্রতিবেশী মেয়েপুরুষ অনেকেই কাজ পেয়েছে কুলি গ্যাঙে। কিন্তু এর আগে কখনো রেলগাড়ি দেখেনি সে, জানতে পারেনি এই আশ্চর্য যন্ত্রযান কীভাবে শহরটাকে বদলে দিয়েছে এই চারটে বছরে।

৩ ম মোয়ম

দাদুর পারলৌকিক কাজ শেষ করে এক পক্ষকাল পরে আমি যে অচেনা, নিঃসঙ্গ দার্জিলিঙে ফিরলাম, তার সত্যিকারের বদলটা ঘটেছিল আমার নিজের ভেতরেই। শহরটাকে একটা অন্যরকম চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেছি আমি। তখন নভেম্বরের শেষ। দীর্ঘ শীতের আগে ক্রমশ নির্জন হয়ে আসা শহরে সেই দেখাটা ফুটে উঠতে লাগল জলের ধারার নীচে ফোটোগ্রাফের ব্রোমাইড প্রিন্টের মতো। ঠান্ডা বাড়ার সঙ্গে জলের মতোই স্বচ্ছ হয়ে এল দিনগুলো, রাতগুলো। কুয়াশামুক্ত কৃষ্ণপক্ষের মুঠো মুঠো তারায় ভরা আকাশ, তার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ধূমকেতু, নাম হেল-বপ। তার

BanglaBook.org

সবুজাভা অনেকটা জুলিয়া গ্রিফিথের চোখের মতো, পূচ্ছটি সূর্যমুখী ধুলোর ; আমাদের সেই শিংলিলার জঙ্গলে অভিযানে রাতের আকাশে দেখা যেত অচেনা পাখির পালকের মতো। দার্জিলিঙে ফিরে এলাম যখন, ততদিনে হেল-বপ সৌরমণ্ডল ছেড়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে। আর তারপরে আসতে লাগল জুলিয়ার পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ডগুলো। ক্রমশ ধূমকেতুটি ফিকে হতে হতে পশ্চিমের আকাশে হেলে যেতে লাগল, উজ্জ্বল ধুলোর পুচ্ছ পাখার মতো মুড়ে এল কক্ষপথের নীলাভ পুচ্ছের ভেতর, তারপর একদিন আকাশে উঠল না হেলবপ। পিকচার পোস্টকার্ড আসাও থেমে গেল। তারার আলোয় দূরে ফালুট পাহাড়ের মাথায় চিকচিক করতে লাগল নতুন বরফের রেখা।

শীত আসছে। নির্জন শহরের পথেঘাটে একা একা হেঁটে বেড়াই, নিজের পুরুষসত্তায় ক্লান্ত, শুকনো নিরেট ফেল্টের রাজহাঁসের মতো গিয়ে ঢুকি অন্ধকার সিনেমা হলে, দর্জির দোকানে, সেলুনে সাবানের গন্ধে আমার কান্না পায়, নিজের পা আর নখ, নিজের চুল আর ছায়া কেবলই ক্লান্ত করে আমায়।

এখন দিন ফুরোনোর আগেই চকবাজার শুনশান হয়ে পড়ে, লেবং জোড়বাংলোর লাস্ট-টার্ন ল্যান্ডরোভারগুলো ছেড়ে যায়। খাঁ খাঁ জিপস্ট্যান্ডে এদিক সেদিক কুলিদের আগুন, পাতাখোরদের ঠেক পার হয়ে ছায়াচ্ছন্ন কনভেন্ট রোডের মুখে আসতে একদিন পেছন থেকে কেউ ফিসফিসে গলায় আমায় ডাক দিল:

—দাজু, একছিন!

ঘাড় ফেরাতে দেখি মলিন কোট-পাজামা পরা এক কৃশকায় ব্যক্তি। একটু দূরে রেলিঙের ধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবতী। পরনে ঘাগরা, কাঁধে নীল ওড়না জড়ানো।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ায় লোকটি দু-পা এগিয়ে এসে নীচু নিষ্প্রাণ গলায় বলতে শুরু করে ওর কাহিনি। যুবতীটি দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে। বিজনবাড়ির নীচে কোনো এক গ্রাম থেকে সকালবেলায় ডাক্তার দেখাতে এসেছিল ওরা। হাসপাতালে ভিড় থাকায় সারাদিন লেগে যায়। ইতিমধ্যে বিজনবাড়ির শেষ বাস চলে গিয়েছে। সঙ্গে যা টাকাপয়সা ছিল, ওষুধ আর চিকিৎসা বাবদ সেসব ফুরিয়ে গিয়েছে। এই শহরে ওরা কাউকে চেনে না। সামনে প্রচণ্ড শীতের রাত, সঙ্গে শীতবস্ত্রও কিছু নেই। কী করবে, কোথায় যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

লোকটার কণ্ঠস্বরে এক গভীর অসহায়তা ছুঁয়েছিল আমায়। পার্স বের করে কিছু টাকা তুলে দিয়েছিলাম ওর হাতে। টাকাটা পেয়ে মনে হল যেন অবাক হল এক মুহূর্তের জন্য, ছোটো করে বলল— শুক্রিয়া! ঠিক সেই সময় একটি গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে চলে গেল রাস্তা দিয়ে। সেই আলোয় মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম এক ঝলক: কৃষ্ণকায়, নাকে নাকছাবি, আয়ত চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; পাহাড়ি নয়।

ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তার বেশ কিছুদিন পরে আবার একদিন— ততদিনে তাপমাত্রা আরো নেমে গিয়েছে, বিকেলের পর রাস্তায় লোকচলাচল অনেক কমে

BanglaBook.org

এসেছে— ঠিক সেইরকম এক দিনফুরোনো আলোছায়ায় কনভেন্ট রোডের মুখে একই জায়গায় আবার সেই ডাক:

—একছিন, দাজু!

টুপি পরেছিলাম আমি, ঘাড় ফেরাতে আমার মুখ দেখে চিনতে পেরে লোকটি আর এগোয় না, ইতস্তত করে। পেছনে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই যুবতী, কাঁধের ওড়নাটা মাথায় ঘোমটার মতো করে জড়ানো। লোকটি সরে যায়, মেয়েটি দাঁড়িয়েই থাকে।

একটা বিচিত্র অস্বস্তি নিয়ে ফিরে আসি আমার হিমনির্জন বাসায়। লোকটি কি যুবতীর স্বামী, বাবা, নাকি... ? ওরা কি মদেশিয়া? আমার মনে পড়ে যায় হেডলাইটের আলোয় এক ঝলক দেখা সেই কালো পাথরে কোঁদা মুখ, সেই আয়ত চাহনি। কোথায় যেন দেখেছি? অবিকল এই মুখ, এই আলোয় হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠা চোখ?

কলম্বোয় তীব্র নিঃসঙ্গতার দিনগুলোয় পাবলো নেরুদা থাকতেন শহরের বাইরে একটি কাঠের ক্যাবিনে। তার শৌচালয়টি ছিল পিছনের বাগানে, প্রতিদিন সকালে সেটি সাফ করে দিয়ে যেত এক তামিল নারী, কষ্টিপাথরে কোঁদা মূর্তির মতো, শ্রীলঙ্কায় নেরুদার দেখা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। পরনে সস্তা সোনালি পাড় লাল শাড়ি, হাতে পায়ে ভারি মল, নাকের পাটায় কাচের নাকছাবি যেন দামি চুনির মতো ঝিকমিক করছে। মাথায় মলপাত্র বয়ে নিয়ে উদাসীন দেবীর মতো হেঁটে যেত সে, বনের লাজুক প্রাণীর মতো, ফিরে যেত ভিন্ন এক অচেনা জগতে। দিনের পর দিন সেই অপরূপ সৌন্দর্যের চলচ্ছবি দেখে সইতে না পেরে এক সকালে তরুণ নেরুদা মেয়েটির কবজি খামচে ধরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন বিছানায়। মেয়েটি বাধা দেয়নি, সাড়া দেয়নি, একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনি; মিলনের পুরো সময়টা চেয়েছিল কেবল: ঠাণ্ডা, নির্মম, আয়ত চোখের চাহনি।

আমার চেতনায় ছেয়ে আসে সেই ছবি, সেই দুটো চোখ, আমার নিঃসঙ্গতা জুড়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে মেঘের মতো। চারদিক অস্বচ্ছ, ভুল পা বাড়ালেই অতল অবসাদের খাদ, কুয়াশায় দেখা যায় না। অসহায় হাতড়ে চলি আমি, আর্ত হাতে খামচে ধরি স্মৃতির লতাগুল্ম, বরফের মতো ঠান্ডা বিছানায় নিজেকে জাপটে ধরি একটু উত্তাপের আশায়।

BanglaBook.org

দশ

হীরক শুকরী

পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অতিথি হয়ে শিগাৎসের কাছে খাংসারে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির গৃহে আতিথ্যলাভ করেছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। সেখানে রিনপোচে নামে এক নারীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিব্বতে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল শরতের, তাদের কথা ভ্রমণবৃত্তান্তে আছে। কিন্তু সম্ভবত নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রায় কারোর নাম উল্লেখ নেই; কয়েকটি ক্ষেত্রে পদমর্যাদাসূচক খেতাবটি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যতিক্রম রিনপোচে— খাংসারে গৃহকর্তার পুত্রবধূ, দুই পুত্রের একমাত্র স্ত্রী।

বছর কুড়ি বয়স রিনপোচের— শরৎচন্দ্র লিখছেন— নম্র স্বভাবা, চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে দাসীরা অতিথিদের সেবার ব্যবস্থা করল।

আলাপের পর প্রথম বাক্যালাপ শুরু করে উগেন।

—তিব্বতের কোন পরিবারের মেয়ে গো তুমি?

—আপনি কুশো মানকিপার নাম শুনেছেন? পাল্টা প্রশ্ন করে সপ্রতিভ রিনপোচে।

—একজন মানকিপাকে আমি চিনি, উগেন বলে। তিনি সিকিমের রাজার মাতুল।

—হ্যাঁ তিনিই, রিনপোচে বলে। আমার বাবা। গত বছর দেহ রেখেছেন তিনি। এমনই দুর্ভাগ্য আমার, জীবদ্দশায় তাঁকে শেষ দেখা দেখতেও গেলাম না।

একটু থেমে, গভীর শ্বাস নিয়ে রিনপোচে বলে— আপনি কি আমার পিসতুতো দাদা দেনজং গ্যালপোর প্রজা?

মাথা নাড়ে উগেন।

—কতকাল পিসিমাকে দেখি না আমি। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একেবারের জন্যেও দেশে যাইনি।

রিনপোচের চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে। অবনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। শরৎ ও উগেন পরস্পরে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে।

গৃহকর্তার পুত্রদের সঙ্গে দেখা হল না, ব্যবসার কাজে লাসায় গিয়েছে ওরা। চামড়া ও ধাতুর ব্যবসা ছাড়াও শিগাৎসে প্রদেশে একাধিক খামার আছে এদের। পাথর আর কারুকার্যময় পপলার কাঠে তৈরি ছিমছাম সাজানো বাড়িটিতে সম্পদের ছাপ স্পষ্ট।

BanglaBook.org

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

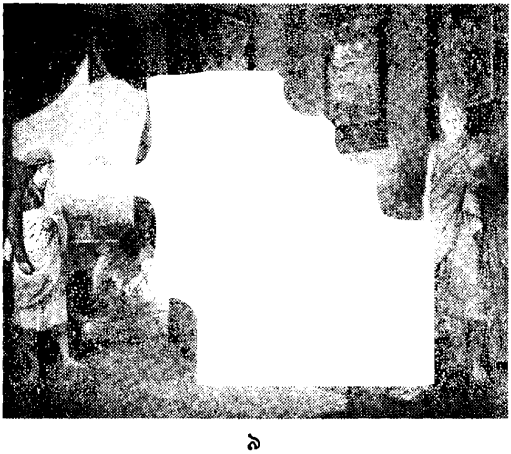

৯

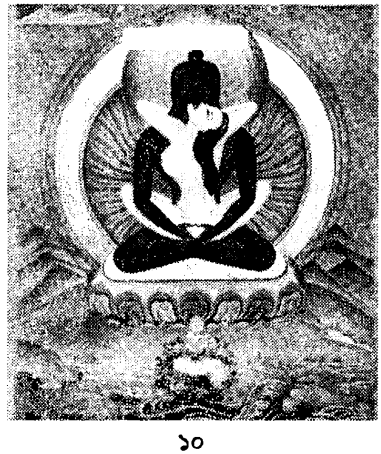

১০

১১

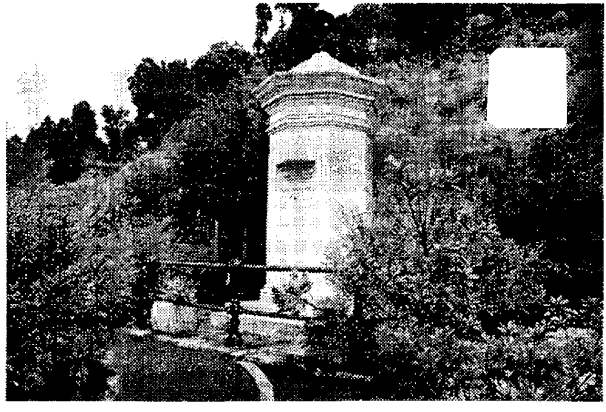

১২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৩

১৪

১৫

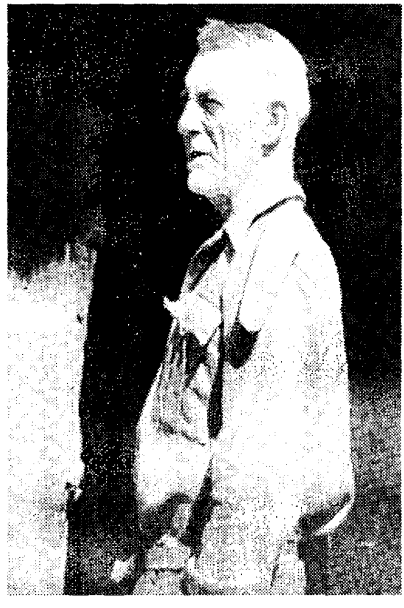

১৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৭

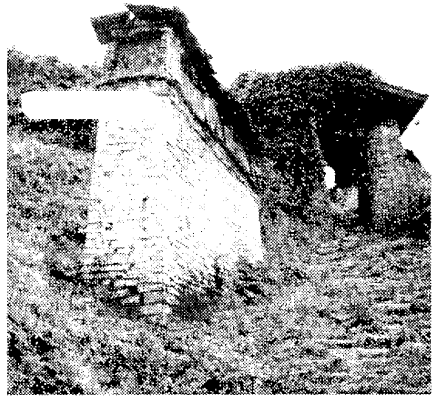

১৮

রাতে ভোজের আয়োজন হল যে ঘরটিতে, সেটি বেশ বড়ো ; ছাতের মাঝখানে আলোর অলিন্দ, মেঝে জুড়ে পুরু খাম্বা কার্পেট বিছানো রয়েছে।

খাবার পরিবেশন হল চিনা কায়দায়, তামার পাত্রে, চপস্টিক আর চামচ সহযোগে। প্রথমে এল গ্যা-তুগ— ময়দা আর ডিম দিয়ে তৈরি ফিতের মতো, ভেড়ার মাংসের কিমা সহযোগে রান্না করা, সঙ্গে স্যুপ। দ্বিতীয় দফায় ভাত ও প্রায় ছ-রকমের মাংসের কারি, সঙ্গে সবজির আচার, সাদা ও কালো ছত্রাক, সবুজ চিনে ঘাসের একটি পদ, আলু আর তাজা মটরশাকের তরকারি ও নুডল। তৃতীয় দফায় মিষ্টি পোলাও। চতুর্থ দফায় এল সিদ্ধ ভেড়ার মাংস, সাম্বা (অর্থাৎ, যবের ছাতু) ও অবশেষে চা।

ভোজনপর্ব চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে, সম্পূর্ণ নীরবে, ভৃত্যেরা একের পর এক পদ পরিবেশন করে যায়। খাওয়া শেষ হলে উগেন নীচুস্বরে জানায়, বিশেষ ভোজের অনুষ্ঠানে এমনকি তেরো দফায় খাবার পরিবেশনও করে থাকে এরা।

খাওয়ার পরে অতিথিকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের একটি ঘরে। সেখানে রয়েছেন আং-লা, গৃহের প্রধানা ও কর্তার অশীতিপর মা। ঘরে একদিকের দেয়ালে সারি দিয়ে তিব্বতি মুখোশ কালো কাপড়ে ঢাকা, মাঝখানে তামার আঙিঠিতে অঙ্গার জ্বলছে। তার কমলা আভায় আং-লার বরফের মতো সাদা চুলে ঘেরা বিশীর্ণ মুখটি সুদূর হিমবাহের খাঁজে সুপ্রাচীন গোপালকের ছাউনির মতো। হাত তুলে শরৎকে আঙিঠির তাপের কাছে এসে বসতে অনুরোধ করেন তিনি। একপাশে বসেন গৃহকর্তা, তাঁর স্ত্রী, সামান্য পিছনে হাঁটু মুড়ে বসে রিনপোচে।

তিব্বতি ভাষা যদিও ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে শরৎ, কিন্তু বৃদ্ধার গ্রাম্য কথ্যভাষা বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় উগেন দোভাষির কাজ করে।

—পবিত্র গ্রন্থ থেকে আমরা জেনেছি আর্যাবর্তের পণ্ডিতদের কথা। ধর্মের বাণী প্রচার করতে তাঁরা গিয়েছেন বিশ্বের দিকে দিকে। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তেমন একজন পণ্ডিতকে কাছে পেয়েছি।

শীর্ণ, জরাগ্রস্ত দেহ থেকে উদ্গত আশ্চর্য সতেজ কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয় শরৎ।

—সৌভাগ্য আমাদের। প্রকৃতির কঠিন বাধা পার হয়ে এই পবিত্রভূমিতে আসতে পেরেছি।

এরপর কাংলাচেন পাস পেরিয়ে আসার পথ নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। শীতের শুরুতে ওই পথ যে সত্যিই অগম্য এবং শরতেরা প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে, এই বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন গৃহকর্তা। এরপর আং-লা বারাণসী, কপিলাবস্তু ও বুদ্ধগয়ার মতো নগরগুলির সম্পর্কে জানতে চান, যাদের স্থানমাহাত্ম্যের কথা শৈশবকাল থেকেই শুনে এসেছেন তিনি। দু-চার কথায় ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার কথা জানায় শরৎ। দেশে বর্তমানে ইংরেজদের রাজ্যপাট, কিছুকাল আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ব্রিটেনের রানি, তারও আগে দীর্ঘকাল ছিল

BanglaBook.org

মুঘলদের শাসন। সেই আমলে হিন্দু আর বৌদ্ধদের পবিত্র মন্দির বিহার চৈত্যগুলো ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবার কাহিনি শুনে আ-ংলা অশ্রুপাত করতে থাকেন।

প্রসঙ্গ বদলে গৃহকর্তা হঠাৎ বলে ওঠেন— আমি জানি আর্যাবর্তের পণ্ডিতেরা হাতের রেখা পড়ে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। আজ যখন তেমন একজনকে পেয়েছি, আমি চাই আপনি আমার ও আমার স্ত্রীর হাতের রেখা দেখুন।

এবার শরৎ পড়ে যায় ফাঁপরে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রিধারী যুবক, পশ্চিমী জ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত, হস্তরেখা দেখে ভাগ্যগণনার শাস্ত্রটি তার জানাও নেই, কোনো বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে তিব্বতিদের গভীর আগ্রহের ব্যাপারটা জর্জ বোগলের ডায়েরিতে পড়ে এসেছে সে। এই মানুষগুলোর বিশ্বাসভঙ্গ করতে মন সায় দেয় না, নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে সেটা সমীচীনও নয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলে:

—যদিও এই বিদ্যাটা অল্পস্বল্প চর্চা করেছি, কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিচারের ব্যাপারে হাতের রেখা খুব একটা সাহায্য করতে পারে বলে মনে করি না আমি। আর তাছাড়া ভবিষ্যৎ জীবনের দুর্দশা জানার থেকে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। মানবজীবন যন্ত্রণায় ভরা, পুনর্জন্ম থেকে চিরমুক্তির জন্যই প্রভু বুদ্ধ নির্বাণের সাধনা করেছিলেন।

এই সারগর্ভ বাচনে শ্রোতারা মুগ্ধ হলেও গৃহকর্তা নাছোড়। হাত বাড়িয়ে ধরে অনুনয়ের স্বরে বললেন:

—তবু আমার আয়ুষ্কাল অন্তত যদি বলেন। অপঘাতে মৃত্যুর যোগ থাকলে পূজার্চনার ব্যবস্থা করতে পারি।

কীভাবে প্রত্যাখ্যান করি? কীভাবেই বা মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণী করি? শরৎচন্দ্র লিখছেন।

—আপনার হাতে আয়ুরেখা স্পষ্টতই দীর্ঘ। আর সৌভাগ্যের ব্যাপারে ঈশ্বর যে আপনার প্রতি সদয় এ তো সবাই জানে।

নগরে

গৃহকর্তার মা আং-লার মনশ্চক্ষে আঁকা সময়হীন মন্দির-বিহার-সৌধ-নগরে গরীয়ান ভারতবর্ষের পটে যে ধ্বংসাবশেষের ছবি আঁচড়ে তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র দাস, যা প্রাচীনার চোখে জল এনেছিল, কতটা তীক্ষ্ণ আর অনুপুঙ্খ ছিল সেই ছবি? কতটাই বা ইতিহাসাশ্রিত? সেটা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ। তার বেশ কিছুকাল আগে থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গল আর মাটিপাথরের স্তূপের ভেতর থেকে উঠে আসছে আশ্চর্য সব পুরাতাত্ত্বিক কীর্তি। শতাব্দীর গোড়ায় একটি বাঘের পেছনে ধাওয়া করে একদল সাহেব শিকারি খুঁজে পেলেন অজন্তার গুহাগুলি। তার কয়েক বছর পরে

BanglaBook.org

ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার টি এস বার্ট এক পাল্কি বেহারার কাছে খোঁজ পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চাক্ষুষ করলেন বন্য লতাঝোপে ছাওয়া অনুপম খাজুরাহোর মন্দির। ঠিক সেই সময়েই জেমস ফার্গুসন কোনারকে ধ্বংসপ্রাপ্ত সূর্যমন্দিরের স্কেচ আঁকছেন। ভোপালের ব্রিটিশ এজেন্ট ক্যাপ্টেন জনসন বনের ভেতর সাঁচির একটি স্তূপ খুঁড়ে ফেললেন গুপ্তধনের সন্ধানে। ট্রিগনোমেট্রিক সার্ভের সময় দেশ জুড়ে উঠে আসতে লাগল অসংখ্য ছোটো বড়ো সৌধের অবশেষ।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল এইসব নতুন নতুন অনুসন্ধানের এক বিশাল মহাফেজখানা— তথ্য, স্কেচ, নকশা, লিথোগ্রাফ, অ্যাকোয়াটিন্ট এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফোটোগ্রাফির প্রযুক্তি আসার পর অসংখ্য ফোটোগ্রাফ। প্রাচীন ভারতভূমির বহমান ইতিহাসের এই ছেদ, এই জঙ্গলাকীর্ণ মাটিপাথর-চাপা গহ্বর, যা উঠে এসেছিল ব্রিটিশদের আবিষ্কার হিসেবেই, যার ভেতর দিয়ে নিয়মিত উন্মোচিত হচ্ছিল এক স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতের ধ্বংসাবশেষ, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল ছিলেন যুবক শরৎচন্দ্র। এছাড়া বারাণসীর মতো প্রাচীন শহরে উপর্যুপরি লেখা আর মুছে ফেলা পাণ্ডুলিপির মতো জমা হয়ে ছিল এক সুদীর্ঘ সময়কালের অসংখ্য পরত। আঠেরো শতকে ড্যানিয়েলদের ওরিয়েন্টাল সিনারি থেকে শুরু করে অসংখ্য সাহেব-মেমসাহেবের আঁকা ছবিতে চিত্রায়িত হয়ে ছিল নিষ্করুণ রৌদ্রে ধোয়া সমভূমির ওপর আশ্চর্য সব স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, বন্য ঝোপঝাড়ে ছাওয়া, তাদের ছায়ায় এদিক ওদিক অলস শয়ান কিংবা নিত্যকার ধরাবাঁধা কর্মে লিপ্ত ছোটো ছোটো পতঙ্গের মতো মানুষ, তাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনযাপন: গাঢ় রঙে আঁকা ঘন অতীতের ওপর পাতলা মরীচিকার মতো বর্তমান।

একটি বিশেষ ঔপনিবেশিক ইতিহাসদৃষ্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন শরৎ। দুর্গম পথে জীবন বিপন্ন করে তাঁর তিব্বতযাত্রা সম্ভবত এক স্থির নিষ্কম্প্র অতীতের সন্ধান, যা হিমালয়ের প্রাচীরের আড়ালে শীতল বিশুষ্ক সুউচ্চভূমিতে অটুট অবিকৃত ছিল এক ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন কালের গর্ভে। সেই অটুট আবহমানকে 'আবিষ্কার' করতেই গিয়েছিলেন শরৎ। অন্যদিকে, তিব্বতে যাঁরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তাঁরা দেখেছিল এক শাশ্বত জীবন্ত পবিত্রভূমির থেকে আসা পুণ্যাত্মাকে।

শরৎ দাসও কি তাঁদের সেভাবে দেখেছিলেন? ব্রিটিশ গুপ্তচর হিসেবে তাঁর দায়িত্ব মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হননি তিনি। যাত্রাপথে প্রতিটি পদক্ষেপ জপমালায় গুণে পথের দৈর্ঘ্য মেপেছেন, নদীর বিস্তার, গিরিপথের উচ্চতা জরিপ করেছেন, জীবজন্তু উদ্ভিদ পাথর থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য, আচার ও দৃষ্টিভঙ্গি খুঁটিয়ে নজর করেছেন। চলতে চলতে দেখা এবং দেখতে দেখতে লেখা, লেখার ভেতরে নিজেকে একটি চরিত্র হিসেবে স্থাপন করা, নৈর্ব্যক্তিক অথচ নির্লিপ্ত নয়, সম্পূর্ণ নতুন এক প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য বীক্ষা গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন তিনি। তিব্বতে যাঁদের

BanglaBook.org

অতিথি হয়ে ছিলেন, বলাই বাহুল্য, তাঁদের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্থানকালের বোধ।

সেই বোধের একটা আভাস আমি পেলাম মার্তামে, কেসাং লেপচার ভেতর। শরৎ দাসের মধ্যে দিয়ে যে শাশ্বত আর্যাবর্তকে দেখতে চেয়েছিলেন প্রাচীনা আং-লা, যা ধ্বংসস্তূপের নীচে হারিয়ে গিয়েছে জেনে ব্যথিত হয়েছিলেন, অনেকটা তেমনই এক দেখায় জারিত হয়ে ছিল কেসাং লেপচার জোঙ্গু উপত্যকা, যা তাঁর জাতিগোষ্ঠীর উৎসভূমি ও পূর্বপুরুষদের আত্মার আবাস, সমস্ত গাছপালা পশুপাখির আকর, কোনো ধরনের নদীবাঁধ বা জলবিদ্যুৎপ্রকল্প যাকে বিনষ্ট করতে পারে না। এই নিয়ে খুব বেশি কথা বলেননি মুখচোরা মানুষটি। আমরা যতক্ষণ ওঁদের বাড়িতে ছিলাম, খুব বেশি দেখতেও পাইনি ওঁকে। শেরিং ও তার স্ত্রী যে বিধিসম্মত পরিপাটি গ্রাম্য লেপচা জীবনের ছবিটি মেলে ধরেছিল আমাদের সামনে, সেই ছবির এক কোণেই ছিলেন তিনি। বাগানে কিংবা রান্নাঘরে কাজের ফাঁকে চোখাচোখি হলে লাজুক হেসে মাথা ঝুঁকিয়েছিলেন, রাতে ডিনারের পর হালকা বৃষ্টি শুরু হলে ছাতা ধরে আমাদের মূল বাড়ি থেকে কটেজে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এমনকি জোঙ্গু উপত্যকায় সরকারি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে শেরিং যখন কথা বলছিল, তখনও প্রায় নীরবই ছিলেন তিনি। তবু সেদিন ভোরবেলায় তাঁর বাঁশির সুর শেরিঙের সমস্ত কথা আর ছবিকে ছাপিয়ে বেজে উঠেছিল, কুয়াশার ভেতর সুগন্ধী ধোঁয়ার মতো পাক খুলে উঠে আমাদের চেতনায় তার রেশ রেখে গিয়েছিল।

একটি স্থানকে পুরাণকথার আলোয় দেখা, এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন কালের ভেতর দিয়ে দেখা— সাবালক হয়ে জীবনে প্রথমবার বারাণসী গিয়ে নিজের ভেতরে তেমনই এক দৃষ্টি অনুভব করেছিলাম আমি। ইতিমধ্যে আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির মতো নানান কাহিনি, সিনেমা আর পারিবারিক স্মৃতির ভেতর দিয়ে অন্তরঙ্গ কল্পনার এক বারাণসী তৈরি হয়েছিল। সেখানে যাবার পর নৈর্ব্যক্তিক পর্যটকের মতো করে নৌকোয় বসে ক্যামেরায় চোখ রেখে শহরটাকে এক জীবন্ত চলমান পটচিত্রের মতো করে দেখতে পারিনি। সরু গলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি, নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম নিরন্তর মানুষের স্রোতে। শেষপর্যন্ত শহরটার কোনো পূর্ণাঙ্গ ইমেজ আমার স্মৃতিতে নেই। রয়েছে কেবল কিছু শব্দ, গন্ধ আর টুকরো টুকরো ছবি: মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, হরিশচন্দ্র ঘাটে ধোপাদের কাপড় আছড়ানোর ছপাৎ ছপাৎ শব্দ, গোময় ও ফুটন্ত দুধের মিশ্র গন্ধ, পরপর সিঁড়ির ধাপে খিলানের ত্রিমাত্রিক আলোছায়া, কাকভোরে জলের ধারে প্রার্থনারত বৃদ্ধার নীল, কম্পিত ঠোঁট...

জুলিয়ার মুখেরও কোনো পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি আমার নেই; কেবল সবজেটে চোখ, সোনালি চুল, নাকের দুপাশে রোদপোড়া তামাটে ত্বক...

BanglaBook.org

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এলে পুরো বাড়িটা নিঝুম হয়ে আসে, কেবল বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। দোতলায় শরতের জন্য যে শোবার ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছে তার জানলার মাঝখানে এক টুকরো কাচ, চারিপাশে পার্চমেন্ট সাঁটা। এখানকার সব অবস্থাপন্ন মানুষদের বাড়িতেই এমন থাকে। বাইরে চাঁদ উঠেছে, কাচ ভেদ করে ক্ষীণ হলুদাভ আলো এসে ঢুকছে ঘরে। ঘরে কুলুঙ্গিতে মাখনের দীপ আর জ্বলন্ত আঙ্গিঠির আভার সঙ্গে মিশে এক বিচিত্র আবহ সৃষ্টি হয়েছে। কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালে চাঁদ দেখা যায় না, নীচে বাড়ির ভিতর উঠোনের একফালি অংশ, মসৃণ নুড়ি পাথরে বাঁধানো। সেই পাথরের ওপর জ্যোৎস্না চিকচিক করছে, তারই প্রতিফলিত আলো প্রবেশ করছে ঘরে। উঠোনের এক কোণে কুচকুচে কালো এক ম্যাস্টিফ, শিকলে বাঁধা, ঘুমোচ্ছে। পুরো বাড়িটাই ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। দোতালায় টানা নীচু কাঠের বারান্দা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার শেষপ্রান্তে অন্দরমহলে একটি ঘরে বাতি জ্বলছে। কাঠের কারুকার্যময় ঝিল্লির ওপাশে আলো যেন রহস্যময় ফানুসের মতো মনে হয়।

কাঠের মেঝেয় খসখস পায়ের শব্দে ঘোর কাটে শরতের। চায়ের পাত্র হাতে নিয়ে এসেছে রিনপোচে স্বয়ং।

তিব্বতিরা সাধারণত জলপান করে না, শরৎ লিখছেন, জল পানে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা। এখানে সাধারণ মানুষেরা ছাং পান করে তৃষ্ণা মেটায়, সম্পন্নরা পান করে চা।

—পণ্ডিতের বিশ্রামের ব্যাঘ্যাত করলাম না তো? রিনপোচে শুধোয়।

—একেবারেই না, শরত বলে। আমি জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার দৃশ্য উপভোগ করছিলাম।

—হ্যাঁ, আজ ত্রয়োদশী, আকাশও মেঘমুক্ত। রিনপোচে জানায়, তারপর একটু থেমে বলে, আমি কিন্তু একটি বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

শরৎ সরাসরি তাকায় রিনপোচের দিকে। সন্ধ্যার সেই পশমী চুবুর বদলে একটি সাদা রেশমের গাউনের মতো পোশাক পরনে, তাতে রুপোর জরির কারুকাজ। রেশমের ভেতর দিয়ে গলায়, বাজুবন্ধে স্বর্ণালঙ্কার চিকচিক করছে; মাথার চুল খোলা। অদ্ভুত অপার্থিব দেখাচ্ছে তাকে।

—আমি আমার ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

—ঈশ্বর যে আপনাকে উদার হাতে দিয়েছেন, সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ভবিষ্যৎ জানার এই ব্যাকুলতা কেন, রিনপোচে?

—রিনপোচে! নিজের নাম উচ্চারণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নারী, বলে— রিনপোচে আমার শাশুড়ির দেওয়া নাম। আমার বাপের বাড়ির নাম ছিল ভিন্ন।

—রিনপোচে, অমূল্য রত্ন, খুবই উপযুক্ত নাম, শরৎ যোগ করে। আপনার শাশুড়ি দূরদৃষ্টিময়ী, আপনার শ্বশুরও একজন পুণ্যবান মানুষ, আপনার দুই উজ্জ্বল স্বামী, এই প্রাসাদোপম গৃহ, এত ধনসম্পত্তি...

BanglaBook.org

রিনপোচে দু-পা এগিয়ে এসে মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে আচমকাই দ্রুত স্বরে বলতে শুরু করে:

—এরা ধনী, কিন্তু চাষির মতো পরিশ্রম করে। আমার স্বামীরা বছরের বেশিরভাগ সময় ব্যবসার কাজে দূরদূরান্তে কাটায়, শাশুড়ির হুকুম মেনে উদয়াস্ত কাজ করতে হয় আমায়— কার্পেট বোনা, দাসদাসীদের পরিচালনা করা, রান্নার তদারকি... বাড়ি থেকে বেরোনোর কোনো উপায় নেই। বেরোলেও কিছু নেই, চারিদিকে কেবল ধূ ধূ রিক্ত উপত্যকা— ছুরির মতো হাওয়া চলে দিনরাত। আমার চামড়া ফেটে রক্ত ঝরে। আমার বাপের বাড়ির দেশ এমন নয়, সেখানে বাড়ির মেয়েবউরা এমন পরিশ্রম করে না। আহ, কতকাল আমি বাপের বাড়ি যাইনি। অনেক দূরের দেশ, জানেন তো?

—জানি, শরৎ বলে। সিকিমের রাজপরিবারের মেয়ে আপনি।

—হ্যাঁ, চুম্বি উপত্যকায় আমার দেশ। সেখানে প্রকৃতি সজীব, সরস। তিনবছর হয়ে গেল আমি সবুজ উপত্যকাভূমি দেখিনি, অরণ্যে-ছাওয়া পাহাড় দেখিনি। আপনি ফেরার পথে আমায় নিয়ে যাবেন আমার বাপের বাড়ি?

এর কী উত্তর হয়? একজন নারী নিজের পরিবার পরিজন থেকে দূরে এসে বিরহ কাতরতা অনুভব করছে, উষর প্রকৃতির মাঝে বন্দি হয়ে নিজের সবুজ মাতৃভূমির প্রতি টান অনুভব করছে। শরৎ দ্বিধান্বিত হয়। সেই ফাঁকে ডান হাতটি প্রসারিত করে নিজের উরুর ওপর রাখে রিনপোচে।

শরৎ দেখে একটি হাত, নিরাভরণ, হাতির দাঁতের মতো মসৃণ, রুপোলি জরির কাজ করা রেশমি হাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

—এমন উৎকৃষ্ট জরি বসানো রেশমের কাপড় ভারতের কোন শহরে তৈরি হয় জানেন? শরৎ জিজ্ঞেস করে।

রিনপোচে উত্তর দেয় না। তার দৃষ্টি শরতের মুখের ওপর নিবদ্ধ, ঊর্ধ্বাঙ্গে এক করুণ প্রার্থনার ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর জ্যোৎস্নার প্রভা আরও গাঢ় হয়েছে। রিনপোচেকে দেখে মনে হয় যেন সেই আলো জমিয়ে তৈরি এক কুহেলিকা, পরনের পোশাকটি উজ্জ্বল কুয়াশার মতো। আঙিঠির স্পন্দমান আভায় কুয়াশার আড়ালে গিল্টি-করা মঠনগরীর আভাস।

—বারাণসী! শরৎ স্খলিত স্বরে বলে।

হাঁটু মুড়ে রিনপোচের মুখোমুখি বসে হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয় সে, উষ্ণ আর পালকের মতো নরম। তার নিজের হাতটি বরফশীতল, অথচ ঘামে ভিজে উঠেছে।

তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের রূপ নিয়ে যত বাঙ্ময় বর্ণনা আমি পড়েছি— হুকার লিখছেন— তার কোনোটাই মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি কল্পনার সেই আবেশ, সেই অনুভব, যখন এই গরিমা চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। আমি তাই পাঠকের মনে তেমন

BanglaBook.org

কোনোরূপ ভাবসঞ্চারের চেষ্টা করব না। এই দৃশ্য যে প্রত্যক্ষ করেছে সেই অভিভূত হয়েছে এর নিখুঁত ধারালো রেখায়, বরফে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে বিস্ময়কর রঙের খেলায়, উদিত বা অস্তসূর্যে দীপ্যমান মেঘে কমলা সোনালি আর চুনীর প্রতিফলিত আভায়, সূর্য ডোবার পর, যখন রক্তাভা দ্রুত ঢেকে আসে সবুজে, এক বিচিত্র পাণ্ডুরতায়। কোনো বর্ণনাই এর পরপর মিলিয়ে যেতে থাকা দৃশ্যাবলী সঠিক ধরতে পারে না, এই সৌন্দর্য এতই অপার্থিব যে স্মৃতিতেও বেঁধে রাখা যায় না, এতই দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকে যে কেবল দেখে যেতে হয়, দিনের পর দিন, পাহাড়শ্রেণির এই সুউন্নত গরিমার অভিঘাতে অভ্যস্ত হবার অনেককাল পরেও।

হিমালয়ের এই সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেননি প্রত্যক্ষবাদী প্রকৃতিবিদ জোসেফ ডাল্টন হুকার। শরৎচন্দ্র দাস পেরেছিলেন কি?

শৈশবস্মৃতি

ছোটোবেলায়, সবে নিজে নিজে গল্পের বই পড়তে শিখেছি তখন, একটা বিচিত্র ভাবনা মন ছুঁয়ে যেত আমার: বইগুলো যখন বন্ধ অবস্থায় তাকের ওপরে থাকে, তখনও কি পাতায় ছাপা অক্ষরগুলো সারিবদ্ধভাবে স্থির হয়ে থাকে, নাকি জীবন্ত হয়ে উঠে খুশিমতো জায়গা বদল করে নিজেরাই আশ্চর্য সব গল্প তৈরি করে নেয়? ভাবতাম আমি। কয়েকবার পা টিপে টিপে গিয়ে আচমকা কোনো একটি বই তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই পাতা খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে অক্ষরগুলো ফিরে যেত যে যার জায়গায়, ঠিক যেমন ক্লাসে দিদিমণি ঢোকার আগেই আমরা ছুটোছুটি খেলা ফেলে বেঞ্চিতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়তাম সুবোধ ছেলেমেয়ে হয়ে। স্বভাবতই এসব ভাবনার কথা সেসময় কাউকে বলিনি। সেটা ছিল সকল জড়বস্তুকে সপ্রাণ দেখার বয়স, মানবসমাজের আদি আলোআঁধারি পর্যায়ে যেমন ছিল। তাছাড়া তখন সবে বড়োদের মুখে গল্প শোনার পাট চুকিয়ে ছাপা অক্ষরের দেশে প্রবেশ করেছি, কাহিনির জীবন্ত সঞ্চরমাণ কথনের রেশ মন থেকে মুছে যায়নি তখনও।

ছেলেবেলার সেইসব ভাবনার রেশও থেকে যায় কোথাও, বড়ো বয়সে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কখনো-সখনো, ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে, গভীর রাতে, বিছানায় আধশোয়া হয়ে, বুকের ওপর ধরা বইটা হাত থেকে খসে যাবার ঠিক আগে, যখন চোখের পাতা বুঁজে আসছে আর খুলছে আলোকিত শার্সির গায়ে মথের পাখার মতো, টিনের চালে শিশির ঝরছে টুপটাপ। তখন ছাপা অক্ষরগুলো নাচতে শুরু করে, জায়গা বদল করে, পাতা ছেড়ে উঠে আসে, নিজেদের মতো করে বুনে উঠতে থাকে। তখন বন্ধ চোখের পাতায় ফোটে অদ্ভুত সব রং রূপ, মথের ডানার থেকে ঝরে রঙের রেণু, জ্যোৎস্নায় ঘুমন্ত কালো ম্যাস্টিফের রোমে ছোটে নীল বিদ্যুৎরেখা, হাতির দাঁতের মতো মসৃণ ত্বকে ফুটে ওঠে ঘামের মুক্তোছড়া, একটা রাতচরা পাখি ডেকে ওঠে

BanglaBook.org

কোথাও, ম্যাস্টিফটা ঘুমের মধ্যেই পাথরে নখ আঁচড়ায়, বুকে ধুকপুকুনির শব্দ শোনা যায়, বাড়তেই থাকে, তারপর দরজায় করাঘাত হয়ে বাজে।

ঘুম ভাঙলে দেখা যায় জানলার কাচে জমে ওঠা বাষ্পে ঝলকাচ্ছে দিনের আলো, টেবিল ল্যাম্পটা মাথার পেছনে জ্বলছে, মেঝেয় লুটোচ্ছে *জার্নি টু সেন্ট্রাল টিবেট অ্যান্ড লাসা*। দরজায় করাঘাত হয়েই চলেছে।

দরজা খুলতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসার নোরবু— হাতে দুধের প্যাকেট আর খবরের কাগজ, কাঁধে ওভারকোটের ওপর বার্চ গাছের গুঁড়ো গুঁড়ো মঞ্জরি পড়েছে।

—গুড মর্নিং! হোপ আই ডিড নট ডিসটার্ব ইয়োর স্লিপ?

—ওহ্, পান্ডিব লা, চিয়াগ ফেব নাং চিগ! আমি বলে উঠি।

নোরবু হাসেন, ওঁর সোনার দাঁতটি ঝিকমিক করে ওঠে।

ঘরে নিঃসীম নৈরাজ্যের মাঝে একটিমাত্র আরামকেদারায় গিয়ে বসেন।

—এই ঠান্ডার সময় একলা তুমি কেমন আছো দেখতে এলাম। দার্জিলিঙের শীতকে ভয় পায় কলকাতার বাঙালিরা। শরৎবাবু অবশ্য ছিলেন ব্যতিক্রম।

নোরবুকে বসিয়ে রেখে দাঁত মেজে চা বানিয়ে এনে দেখি মেঝেয় পড়া থাকা বইটি উঠে এসেছে ওঁর হাতে, পাতা উলটোচ্ছেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

—শরৎবাবুর তিব্বতযাত্রার একটা মর্মান্তিক পরিণতি আছে, সেটা সেদিন তোমায় বলতে চাইনি। মনে আছে?

আমি মাথা নাড়ি, মনে আছে।

—তিব্বত থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শরৎ দাসের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়, ওঁর যাত্রার উদ্দেশ্যও। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য দার্জিলিঙে চরও পাঠায় লাসার সরকার। এরপর শুরু হয় ধরপাকড়। যারা কোনো-না-কোনো ভাবে ওঁকে সাহায্য করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, বাড়িতে এনে আপ্যায়ন করেছে, ওঁর যাওয়া-আসার সময় কুলি ঘোড়া চমরির ব্যবস্থা করেছে, তাদের প্রত্যেকের বিচার হয় এবং শাস্তি হয়। দেশদ্রোহিতার শাস্তি। যাদের অপরাধের মাত্রা কম তাদের শিকল পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, বাকিদের নিক্ষেপ করা হয় কারাগারে। পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রী সেংচেন দোর্জেচেনের মৃত্যুদণ্ড হয়।

শিগাৎসের বাজারে শিকল-পরা বন্দিদের দেখেছেন শরৎ; লিখেছেন— একাধিক দল, তাদের কারোর হাতে পায়ে শিকলবেড়ি পরানো, কারোর বা হাতগুলো কাঠের পাটায় আঁটা। অনেকেরই চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে। গায়ে অত্যাচারের টাটকা দাগ। সরকার এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় না, বাজারে ভিক্ষে করে বেড়ায়। এক করুণ বীভৎস দৃশ্য।

তবে বিভিন্ন পর্যটকের লেখায় তিব্বতের কারাগারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আরও বীভৎস। এগুলি আসলে ছিল পাথরের গুহার ভেতরে অন্ধকূপ, ওপর দিকে

BanglaBook.org

বায়ুচলাচলের একটি ফোকর থাকত কেবল। খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা হতো সেই ফোকর দিয়ে। বাইরে বেরোবার পথ গেঁথে দেওয়া হতো। বাইরে বেরোবার আর দরকারও হতো না অবশ্য, কারণ কিছুকালের মধ্যেই মানুষগুলো এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত। জীবন্মৃত হয়ে টিকেও থাকত কেউ কেউ। ১৯০৩ সালে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের নেতৃত্বে যে ব্রিটিশ সেনা অভিযান তিব্বতে গিয়েছিল, তারা সেই অন্ধকূপের পাথর ভেঙে এমন কিছু বন্দিকে মুক্ত করে। তাদের মধ্যে সেই দণ্ডিত দেশদ্রোহীরাও কেউ কেউ ছিল।

ইতিমধ্যে কুড়ি বছর পার হয়ে গিয়েছে। এতকাল অন্ধকূপে কাটানোর পর তাদের মানুষ বলে চিনতে পারাই কঠিন: সাদা ফ্যাকাশে জীব, কঙ্কালসার সরীসৃপের মতো, পুরুষ নারী আলাদা করা যায় না, পোশাক পচে খসে গিয়েছে কবেই, আলোর অভাবে চোখের মণিগুলোও সাদা হয়ে গিয়েছে অ্যালবিনোর মতো, পাথরের ঘাম আর শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে রয়েছে কুড়িটা বছর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে বের করে আনার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিনের আলোর চাপে ছটফট করে মারা গিয়েছিল তারা।

সেংচেন দোর্জেচেনের মৃত্যুদণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিল কয়েক হাজার মানুষ। তাশিলুম্ফোর মঠে পাঞ্চেন লামার প্রধান পারিষদ ছাড়াও তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়— ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও কঠিন রোগ নিরাময়ের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, এমনটাই মনে করত সাধারণ মানুষ। সাংপোর একটি ঝর্ণায় জীবন্ত ডুবিয়ে মারা হয়েছিল তাঁকে। সেই দৃশ্য দেখতে গোটা শিগাৎসে শহরটাই বুঝি ভেঙে পড়েছিল নদীর পাড়ে। যেখানে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে নামছে সাংপো, সেইখানে অনেক উঁচু থেকে তাঁকে পাথরে বেঁধে দড়িতে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে নামানো হয়। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও আশ্চর্য শান্ত ছিলেন নাকি সেংচেন, একাগ্র মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। দর্শকদের সমবেত বিলাপের ধ্বনি সাংপোর গর্জন ছাপিয়ে উঠেছিল।[৫]

—এটা খুবই অদ্ভুত যে শরৎ দাসের কাছে জরিপের যন্ত্রপাতি দেখেও তাঁকে একটিবারের জন্যে সন্দেহ করেননি লামা সেংচেন, নোরবু বলেন। উলটে কিনা জরিপ বিজ্ঞান শিখেছেন, কলকাতা থেকে ক্যামেরা আনিয়ে ফোটোগ্রাফির প্রযুক্তি শিখেছেন, সেই নিয়ে তিব্বতি ভাষায় বইও লিখতে শুরু করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে শরৎ যখন তাশিলুম্ফোয় ছিলেন, তখন তাঁর কাছে নিয়মিত ইংরেজি ফিজিক্স আর বীজগণিতের পাঠ নিতেন লামা, দূরবীন আনিয়ে আকাশ নিরীক্ষণ করতেন, ম্যাজিক ল্যানটার্নে দুনিয়া দেখতেন। এইসব থেকে আমার একটা কথাই মনে হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর খিদে এতটাই তীব্র ছিল যে শরৎ দাস যে ব্রিটিশ গুপ্তচর হতে পারে, এই ভাবনাটাকে তিনি আদৌ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি।

—এক জায়গায় দেখছি উনি শরৎকে বলছেন, আমি চাই বিশ্বের দরজাটা খুলে যাক, নতুন যুগের হাওয়া আসুক। সেই দরজাটা রয়েছে ভারতে, প্রভু বুদ্ধের বাণী যে পথে এসেছে সেই পথেই আসবে সেই যুগ।

BanglaBook.org

আমার কথায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন লোবসাং নোরবু, হাত দুটো জড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন:

—যদি সত্যিই সেটা হতো, তাহলে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের অভিযান অন্য এক তিব্বত দেখত।

—অথবা হয়তো সেই অভিযানের আর দরকারই হতো না, আমি বলি।

ঐ মা য় ক্ষ

খাংসারে সেই চাঁদের রাতে রিনপোচের হাতের রেখায় কী দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র? জন্মভূমির সবুজে ছাওয়া পাহাড় উপত্যকা আর কোনোদিন দেখতে পায়নি সেই নারী। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তারও শাস্তি হয় অন্ধকূপে আমৃত্যু বন্দিত্ব। কুড়ি বছর পরে পাথর ফাটিয়ে বের করে আনা ফ্যাকাশে কঙ্কালসার সরীসৃপের মতো প্রাণীগুলোর যৌনাঙ্গ দেখে পুরুষ নারী তফাৎ করা যায়নি। তাদের মধ্যে রিনপোচে ছিল কি?

রিনপোচে ছাড়াও তিব্বতে থাকাকালীন আরেকজন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় শরতের। তিনি ছিলেন লাচাম, অর্থাৎ রাজকুমারী— লাসার এক ধনী প্রভাবশালী রাজপুরুষের স্ত্রী। প্রথম সাক্ষাতের দিনটা শরতের স্মৃতিতে দাগ কেটেছিল। লাচামের বয়স বছর তিরিশ, পরনে মোঙ্গোল গাউন— লিখছেন; মাথায় নানান আকারের মুক্তো আর রত্নখচিত মুকুটের মতো অলঙ্কার। পোশাকটিতে অত্যন্ত দামী চিনা সাটিনের ওপর অপূর্ব জরির কাজ, বুকের ওপর মুক্তো প্রবাল আর তৈলস্ফটিকের অজস্র হারছড়া। তাশিলুম্ফোয় এসে ঠান্ডা লেগে শ্বাসনালির রোগে ভুগছিলেন লাচাম, স্থানীয় বৈদ্যদের জড়িবুটিতে কাজ হচ্ছিল না। শরতের চিকিৎসায় নিরাময় হল।

তিব্বতযাত্রার সময় নিজের জন্যে কিছু বায়োকেমিক ওষুধ নিয়েছিলেন। যাত্রাপথে, এবং শিগাৎসেতে থাকাকালীন, কয়েকজন রোগীকে সেই ওষুধ প্রয়োগ করে সারিয়ে তোলার সুযোগ হয়। এর ফলে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে তাঁর খ্যাতি পূর্ণতা পায়। লাচামের চিকিৎসা করে অতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটল; রাজকুমারীর দলের সঙ্গে লাসা যাত্রা এবং লাসায় তাঁদের প্রাসাদোপম গৃহে আতিথ্যলাভ।

তাশিলুম্ফোয় পৌঁছনোর পর থেকেই লাসায় যাবার একটা বাসনা শরতের মনে জমেছিল। কিন্তু শিগাৎসে থেকে লাসা দীর্ঘ কঠিন পথ, দস্যুকণ্টকিত। লাচামের সঙ্গে পরিচয়ের পর জানা গেল তিনি শীঘ্রই দুই পুত্রকে নিয়ে লাসায় ফিরছেন। ওই দলে সফরসঙ্গী হলে অচেনা পথে নিরাপত্তা তো আছেই, এছাড়া লাসায় গিয়ে আশ্রয়ও জুটবে।

দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিল শরৎ। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র, যেমন আগুন জ্বালানোর চকমকি পাথর ও হাপর, চা তৈরির বাঁশের পাত্র ইত্যাদি

BanglaBook.org

ছাড়াও বিশেষভাবে বানানো হল শীতের পোশাক। তার মধ্যে অনেকগুলো শিশু ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি একটি কোটও ছিল। তখন মে মাস, তিব্বতের উপত্যকায় বসন্ত এসেছে। কিন্তু পথে তুষারপাতের সম্ভাবনাও ছিল।

১১ মে ১৮৮২, শুরু হল লাসার পথে যাত্রা। বেরোবার আগে লামা সেংচেনের কাছে বিদায়ী আশীর্বাদ নিতে যাওয়া হল। অভ্যর্থনাকক্ষের লাগোয়া একটি প্রশস্ত আসবাবহীন ঘরের মাঝখানে এক টুকরো খাম্বা জাজিমের ওপর বসেছিলেন সেংচেন, সামনে নীচু চিত্রিত ডেস্কে একটি ড্যাগেরিওটাইপ ক্যামেরার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঘরের তিনদিকে দেয়ালজোড়া শেলফে অসংখ্য পুঁথির বান্ডিল, একদিকে ঘেরা বারান্দায় খাঁচায় টিয়াপাখি আর একটি টবে কাশ্মিরি কেশরের চারা। মঠের সোনালি চুড়োয় প্রতিফলিত সকালের আলো এসে পড়েছিল লামার হলুদ রেশমি গাউনে। প্রণাম করে একটি অতীব সুন্দর খাদা উপহার দিল শরৎ।

—শরৎচন্দ্র! দুটো হাত মাথায় সস্নেহে ছুঁইয়ে বললেন লামা সেংচেন। লাসা যাত্রার জন্য প্রকৃষ্ট সময় নয় এটা। মধ্য তিব্বত জুড়ে গুটি বসন্তের প্রকোপ চলেছে। তাছাড়া ভিনদেশির জন্যে লাসা মোটেই উপযুক্ত শহর নয়। ওখানে লোকজন কুটিল ও সন্দেহপ্রবণ, শিগাৎসের মতো নয়। সবসময় সতর্ক থাকবে, কোনো একটি জায়গায় একটানা বেশিদিন থাকবে না। লাচাম অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী, ওই তোমায় রক্ষা করবে। কঠিন বাধার মুখে পড়বে তুমি, কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করতেও পারবে।

ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হয়েছিল তিব্বতি নতুন বছর লোসার। তারপরেই শীতের প্রকোপ কমে এসেছে। পপলার আর উইলো গাছে নতুন পাতার কুঁড়ি ফুটছে, জলের ধারে বুনো দোপাটির ঝোপে পীতবর্ণ ফুল এসেছে ঝেপে, মাঠে নতুন কচি ঘাস খুঁটে খাচ্ছে ভেড়ার পাল। চাষিরা হলকর্ষণ শুরু করে এই সময়েই। শরৎ দেখল উপত্যকাভূমি সবুজ হয়ে আছে ফসলে। চাষিরা হাল-টানা চমরগুলোকে সাজিয়েছে রঙিন পশম আর কড়ির সাজে, দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে। আকাশ অসহ্য নীল, আয়নার মতো জলাশয়ে হাঁসের ঝাঁক। এই অনাবিল জীবনের মাঝে বসন্তের মড়কের সংবাদ কষ্টকল্পনা মনে হয়।

লাসার সড়ক কাঁচা ও বন্ধুর— কোথাও বিশ ফুট চওড়া, কোথাও পথের রেখা মাত্র, মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কখনো হয়ে ওঠে শুকনো সেচের খাল। চাকালাগানো গাড়ির চল নেই এ দেশে কোথাও, মানুষ পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়া খচ্চরে চেপে চলেছে।

লাচাম চড়েছে একটি সুন্দর সাদা ঘোড়ায়। তার পিঠে অপূর্ব নকশাতোলা কাপড়ের সাজ, বসার আসনটি তাতার দেশের। মাথায় মুক্তোর সাজ, গলায় প্রবাল আর তৈলস্ফটিকের হারছড়া, সোনার চুনিখচিত লকেট, পরনে সাটিন আর কিংখাবের পোশাকে— শরৎচন্দ্র লিখছেন— লাচামকে কোনো রোমান্সের নায়িকা কিংবা দেবীর মতোই দেখাচ্ছিল।

ক্রমশ বসতভূমি ছাড়িয়ে বিজন প্রান্তরে এসে পড়ল ওরা। মাথার ওপর বিশাল সুনীল ঢাকনার মতো আকাশ, দূর পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন মঠের ধ্বংসাবশেষ, নীচে

BanglaBook.org

মালভূমিতে চমর-চমরি চরছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে গোপালক দোকপাদের পাথরের ছাউনি। তেমনই একটি ছাউনিতে থামা হল টিফিন* করার জন্য।

—ডুলির চল নেই এদেশে? শরৎ জিজ্ঞেস করে। দীর্ঘ পথ ঘোড়ায় চেপে চলার থেকে ডুলিতে চলা কিন্তু অনেক আরামের, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে।

—ডুলি মানে যা মানুষ কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় তো? লাচাম শুধোয়।

—হ্যাঁ, চার বা তার বেশিজন মানুষের কাঁধে। অনেকটা সেদান চেয়ারের মতো।

সামান্য হেসে লাচাম বলে:

—কিন্তু মানুষকে ভারবাহী পশুর মতো ব্যবহার করাটা কি ঠিক? তিব্বতে কেবল দুজন মানুষ ছাড়া আর কারোর অমন পরিবহনে অধিকার নেই— তাঁরা হলেন দলাই লামা আর পাঞ্চেন লামা।

একটি নীচু গিরিপথ পার হবার পর উপত্যকার গা বেয়ে পেঁচিয়ে নেমেছে পথ। অনেকগুলো ছোটো ছোটো বরফগলা জলের ধারা গিয়ে মিশেছে দূরে একটি সবুজ লেকে। সন্ধ্যা নামার আগেই লেকের ধারে এক গ্রামে পৌঁছনো গেল। মৎস্যজীবীদের গ্রাম, ঘরগুলো ঘাসে বোনা, চামড়ায় মোড়া বড়ো বড়ো ঝুড়ির আকারের নৌকো ঘরের গায়ে সারি দিয়ে উলটোনো রয়েছে। সাম্বা আর টাটকা মাখন কেনা হল এখানে। ভালো টাটকা মাছ পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু মহামারীর কারণে মৎস্যভক্ষণে বিরত থাকাই সাব্যস্ত হল।

লেক ছাড়িয়ে খানিক দূরে একটি নদী। পরদিন সকালবেলায় সেই নদীর ওপর বেশ শক্তপোক্ত কাঠের সাঁকো পার হয়ে যাত্রা শুরু হল। কিছুক্ষণ চলার পর পথ নদীকে ছেড়ে উঠে গিয়েছে কারো-লা নামে একটি উঁচু মালভূমির ওপর। চড়াই পথে খানিকদূর ওঠার পর উত্তরপশ্চিমে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা গেল। মালভূমির পিঠের ওপর বিস্তীর্ণ ঘাসজমি, চমরির দল চরছে, ছোটো ছোটো জলের ধারা এঁকেবেঁকে বয়ে পরস্পরে মিশে নদী হয়ে যাচ্ছে। কারো-লা পার হয়ে মাইল ছয়েক উপত্যকা দিয়ে নেমে যাবার পর ছোট্ট গ্রাম শরিং-লা। নদী এখানে উত্তরে বাঁক নিয়ে ইয়ামদোর সঙ্গে মিশতে চলেছে। এখান থেকেই শুরু নাঙ্গাৎসের সমভূমি, দূরে অস্পষ্ট সামদিঙের গোম্ফা দেখা যায়। পথের দুধারে শুরু হয় ফসলের মাঠ, মেয়েরা আগাছা নিড়োচ্ছে যবের খেতে, অচেনা পথিক দেখে এগিয়ে এসে যবের কচি শাক উপহার দিয়ে যায়। কোথাও বা একদল মেয়ে

---

* শরৎচন্দ্র লিখছেন Tiffin। একদা ব্রিটিশ ভারতে জনপ্রিয় শব্দটি এসেছে ইংরেজি tiffing থেকে— অর্থাৎ ছোট্ট চুমুক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গোড়ার দিকে, যখন এদেশে রাজ্যপাট চালানোর ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প হয়ে ওঠেনি, বেশ একটা পিকনিকের মেজাজ ছিল, রাজপুরুষেরা কাজকর্মের ফাঁকে মাঝেমধ্যেই টিফিং করতেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের ওপর তার কুপ্রভাব অচিরেই মালুম হয়, এবং এই রেওয়াজ প্রায় উঠে গিয়ে চালু হয় সন্ধ্যার পর পেগ মেপে সূর্যডুবকি, অর্থাৎ সানডাউনার। তবে টিফিন শব্দটি ভারতীয় ইংরেজিতে থেকে যায়, থেকে যায় এই শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নবীন ঔপনিবেশিক রোমান্সও। শরৎচন্দ্র দাসের লেখায় টিফিন কথাটি সেই অর্থে যথার্থ: হিমালয়ের নিঃসীম প্রকৃতির মাঝে নির্জন দোকপা ছাউনিতে এক ইঙ্গবঙ্গীয় যুবক ও এক তিব্বতি রাজকুমারীর মাখন-চা টিফিং করার মধ্যে রয়েছে সেই রোমান্সের ছোঁয়া।

BanglaBook.org

ইট বানাচ্ছে, গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলেছে ভাটায়। মাটির পাত্র তৈরি হচ্ছে কাঠের ছাঁচে ঘুরিয়ে, চাকের ব্যবহার নেই।

এখান থেকে কিছুদূর যেতে পড়ে লাচামের শ্বশুরের জমিদারির মধ্যে একটি গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে ধাপকাটা ফসলের খেত দেখা যায়। ওপরদিকে জোং, অর্থাৎ স্থানীয় প্রধানের দুর্গপ্রাসাদ— একসারি ধ্বজা উড়ছে। রাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে।

তার আগে পথের পাশে এক জায়গায় লাল কাপড় দিয়ে চটজলদি ঘেরাটোপ বানিয়ে ফেলল দলের লোকেরা। লাচাম ভেতরে ঢুকে পোশাক বদলে পরে নিল দামি রেশম, মাথায় পরল রত্নখচিত মুকুট বা পাতুগ।

তিব্বতে এক পরিবারে ভাইদের একজন নারীকে বিবাহ করার বিচিত্র সামাজিক রীতি সম্পর্কে জানতে চায় শরৎ।

—আমি শুনেছি ভারতে নাকি একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে? পাল্টা প্রশ্ন করে লাচাম।

—হ্যাঁ, সবাই না করলও সেই রীতি প্রচলিত আছে। শরৎ বলে।

—কী অদ্ভুত! স্বামীর সোহাগ সম্পত্তি সবই তো ভাগ হয়ে যায় তাহলে। লাচাম বিস্ময়ের স্বরে বলে।

—ফিরিঙ্গিরা কিন্তু আবার একজন পুরুষ একজন নারীকেই বিবাহ করে।

—সে তো আরও অদ্ভুত ব্যাপার!

—তা কেন? শরৎ বলে। একজন মানুষ তো একটি সত্তা, বিবাহ তো দুই সত্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। নয় কি?

—কিন্তু এক মায়ের গর্ভে জাত ভাইয়েরা তো আসলে এক, একই রক্ত বইছে তাদের শিরায়। আত্মা যদিও আলাদা।

—তাহলে একাধিক সহোদরা বোন যদি একই পুরুষকে বিবাহ করে, তাতে কোনো সমস্যা নেই তো?

এক মুহূর্ত চুপ করে যায় লাচাম, তারপর বলে:

—কী জানি। কিন্তু আমার মনে হয় ভারতের তুলনায় তিব্বতে নারীরা অনেক সুখী। তাদের জীবন সব অর্থেই অনেক পরিপূর্ণ।

জোং-এর ফটক পার হয়ে উঠোনের মাঝখানে একটি বেদি, নরম কার্পেট পাতা হয়েছে। লাচাম ঘোড়া থেকে সেই বেদির ওপর নামে। দলের আর সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিল ঢোকার আগেই। এমনটাই রীতি। কিন্তু অভ্যর্থনাপর্বের পর জানা গেল প্রধানের ভাই ও এক ভাইপোর গুটি বসন্ত হয়েছে। কোণের একটি ঘরে দুজন লামা ঘণ্টা আর ডুগডুগি বাজিয়ে রোগ তাড়ানোর মন্ত্রপাঠ করে চলেছে তারস্বরে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে প্রবল জ্বর এল শরতের, সঙ্গে বেদম কাশি। পরদিন দিনের শেষেও প্রশমনের কোনো লক্ষণ নেই। এই অবস্থায় লাসায় যাত্রা অসম্ভব। ঠিক হল লাচামের

BanglaBook.org

দল এগিয়ে যাবে। শরতের সঙ্গে তার দুই ভৃত্য ছাড়াও দলের কয়েকজন থেকে যাবে। সুস্থ হবার পর লাসার পথ ধরবে ওরা।

পরের দিন ভোরে বেরিয়ে পড়ার আগে লাচাম এল দেখা করতে, সঙ্গে এক দাসী। রোগশয্যায় শুয়ে শরৎ দেখে: প্রথম আলো এসে পড়েছে লাচামের মুখে, সম্পূর্ণ নিরাভরণ, অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে, মানবী, নরম আলোয় ভঙ্গুর যেন-বা।

শরতের কপালে নিঃসঙ্কোচ হাত রাখে লাচাম।

—সামদিং মঠে একজন আমচি (বৈদ্য) আছেন, সেখানে যাও। সন্ন্যাসিনীদের মঠ। তার প্রধানা দোর্জে ফাগমা আমার আত্মীয়া। আমি চিঠি দিয়ে দেব। তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছে পণ্ডিত। কিন্তু আমি নিরুপায়। বুদ্ধপূর্ণিমার আগেই আমায় লাসায় পৌঁছতে হবে। বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে, দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসবে। লাসায় তোমার জন্য আমার বাড়ি অপেক্ষা করবে।

দোর্জে ফাগমা, অর্থাৎ হীরক শুকরী, পুনর্জন্ম পাওয়া সন্ন্যাসিনী। ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় সামদিং মঠ, পথ গিয়েছে বৃশ্চিকের আকারে একটি সরোবরের পাশ দিয়ে। শরৎকে কম্বল জড়িয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় তুলে দেয় অনুচরেরা। কিছুটা যাবার পর শরীর এলিয়ে আসে, ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় তাকে। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে যেন বরফের ছুরি ঢুকে ফুসফুস ফালাফালা করছে, কালো রোদচশমার ভেতর দিয়ে দেখা যায় লেকের জলে ভাসছে বরফের চাঙড়। এক জায়গায় খাড়া পাথরের ওপর এক ঝাঁক শকুন, জলের ধারে দুজন মানুষ লম্বা কাঠি দিয়ে কী যেন ঠেলছে। পরে জানা যায় ওরা মুদ্দাফরাস, মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এটাই সৎকারের রীতি।

পাহাড়ের গা কেটে খাড়া উঠে গিয়েছে মঠের সিঁড়ি। খানিক ওঠার পর মাথা ঘুরে যায় শরতের। একজন কুলির পিঠে মালের ঝাঁকায় চড়ে মঠের ফটক পর্যন্ত যায়। লাচামের চিঠি নিয়ে ভেতরে যায় একজন। শিকলে বাঁধা একজোড়া ভয়ানকদর্শন ম্যাস্টিফ, ইয়ামদোর কুকুর, শরতকে দেখে হিংস্র গজরায়, মুখ থেকে লালা ঝরে। সর্বাঙ্গে কম্বল জড়ানো, কালো চশমায় মুখ ঢাকা এই কিম্ভূত মনুষ্যমূর্তির ভেতর মৃত্যুর ছায়া দেখতে পায় ওরা।

আমচি অশীতিপর, মঠের কাঠ-পাথরের স্থাপত্যের গলিঘুঁজির ভেতর এক প্রান্তে তাঁর খুপরি। কাঠের মই বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। নস্যি নিতে নিতে, এক হাতে প্রার্থনাচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে শরতের চোখ জিভ পরীক্ষা করেন। রোগীর জন্য ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা হয়, থাকার ব্যবস্থা হয় নীচু অপরিসর একটি ঘরে। ঘরের কোণে একটি চিত্রিত সিন্দুক, ওপরে দীপদান, দেয়াল ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে; ভাড়া দিনপিছু চার আনা। এছাড়া দোর্জে ফাগমার জন্য উপঢৌকন, আশিজন লামার জন্য চা পান, ভিক্ষা ও পাঠের আয়োজন করতে হয় অপদেবতাদের তুষ্টির জন্য।

এসব সত্ত্বেও রোগ উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। অচৈতন্য অবস্থায় দীর্ঘ

BanglaBook.org

প্রহর কাটে শরতের। এর মধ্যেই আমচির নির্দেশে রোগীর একটি কুশপুত্তলিকা তৈরি হতে থাকে ; মৃত্যুকে প্রতারণা করার এক প্রাচীন রীতি। বৃশ্চিক লেকের জলে জ্যান্ত মাছ ফেলার ব্যবস্থা হয়। জ্বরের বিকারে দিনরাত একাকার হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে আসা যাওয়া করে অচেনা লোকজন, তাদের কথাগুলো যেন ভেসে আসে দূর থেকে। কুশপুত্তলিকা তৈরি হয়ে আসে, তাকে পরানো হয় শরতের ব্যবহৃত পোশাক। কেউ এসে ওর ঘোড়াটি ধার চায়, মেছোদের গ্রামে যেতে হবে মাছ কেনার জন্য। দোর্জে ফাগমার কাছ থেকে কাশ্যপ বুদ্ধের দেহাবশেষ মিশ্রিত বটিকা নিয়ে আসে কেউ। মৃত্যু হবে না, তবে খুব কষ্ট পেতে হবে— খবর পাঠিয়েছেন দোর্জে ফাগমা। শীঘ্রই তিনি দেখা করবেন। দিনরাত হাওয়া চলে পাহাড়ের মাথায়, দেয়ালে ধাক্কা মারে, কাঠের গ্রন্থিগুলো গুঙিয়ে ওঠে ঝঞ্ঝাপীড়িত নৌকোর মতো, উঠোনে একঘেয়ে মন্ত্রপাঠের শব্দে মিশে যায়। শরতের চেতনা ছেয়ে থাকে ছেঁড়া ছেঁড়া দুঃস্বপ্ন। একদিন সে দেখে— দোর্জে ফাগমা এক দাঁতাল শুকরী, তার বুকে ব্যাগপাইপের মতো স্তনের সারি, সর্বাঙ্গে হীরকের দ্যুতি ঝলকাচ্ছে। জন্মভূমি থেকে এত দূরে এসে মৃত্যুই ঘটবে শেষকালে ? আচ্ছন্নতার মধ্যেই এক লামাকে ডেকে নিজের উইল লিখিয়ে নেয় শরৎ। অবিরাম হাওয়ার শব্দ চলে, চলতেই থাকে, তাতে মিশে থাকে নানান শব্দ, অট্টহাসি, জান্তব আর্তনাদ। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে যায় সেই ধ্বনি, আবার ফিরে আসে, শিরাধমনিতে ঘা দিয়ে চলে রক্তের দমকে। তারপর একদিন আচমকাই হাওয়া থেমে যায়, মন্ত্রপাঠ বন্ধ হয়ে যায়, চারিদিকে অন্ধকূপের মতো নিস্তব্ধতা। কুশপুত্তলিকা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, চোখে সেই কালো চশমাটা।

বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে আসে শরৎ, শরীর হালকা পালকের মতো। উঠোনে এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় আলো, ছাই উড়ছে, কেউ কোথাও নেই। তিনদিকে মৌচাকের মতো সারি সারি প্রকোষ্ঠ, ঝুলবারান্দা, অসংখ্য সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এদিক সেদিক। সেই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি নীচু প্রশস্ত হলঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, ভেতরে অসংখ্য থামের সারি। ভেতরটা ছায়াচ্ছন্ন, একদিকে দেয়াল জুড়ে অনেকগুলো মুখোশ কালো কাপড়ে ঢাকা। বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটি থামে ধাক্কা লাগতে দুলে ওঠে সেটি। হঠাৎ লক্ষ্য করে, যেগুলোকে থাম ভেবেছিল, সেগুলো আসলে সব ঝুলন্ত ফাগড়া, জীবন্ত দগ্ধ ভেড়ার ধড়। ভাঁড়ারকক্ষে ঢুকে পড়েছে সে !

কিন্তু বেরোতে গিয়ে কিছুতেই পথ খুঁজে পায় না শরৎ। ক্রমশই আরও সেঁধিয়ে যেতে থাকে ফাগড়ার অরণ্যে, আলোআঁধারির ভেতর কক্ষের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে শত শত ভেড়ার জান্তব আর্তধ্বনি ভেসে রয়েছে স্থির কুণ্ডলীকৃত কুয়াশা হয়ে, আর তার ঠিক মাঝখানে ঝুলছে লাচাম, নগ্ন, রক্তশূন্য, চোয়ালের নীচে থেকে ইস্পাতের হুক উঠে গিয়েছে করোটি ফুঁড়ে, কিন্তু চোখের পাতা নড়ছে, ভাবলেশহীন চেয়ে আছে তার দিকেই।

BanglaBook.org

ভাঙা নৌকোর যাত্রী

সামদিং মঠে এগারো দিন অসহনীয় রোগযন্ত্রণার পর শেষপর্যন্ত সুস্থ হয়ে লাসায় যেতে পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। সেখানে লাচামের গৃহে আতিথ্যলাভ করেন এবং তাঁর সূত্রেই পোটালা প্রাসাদে গিয়ে দলাই লামার দর্শন পান। এরপর সাক্য প্রদেশ ও ইয়ার্লুং সাংপো উপত্যকা ঘুরে দেশে ফিরে আসেন, যাত্রা শুরুর এক বছরেরও বেশি পরে। দিনটা ছিল ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮২। দার্জিলিঙে তখন বড়দিনের উৎসব চলছে। তাশিলুম্ফোয় লামা সেংচেনের কাছ থেকে যেসব অমূল্য ধর্মগ্রন্থ পুঁথি থংকা ইত্যাদি উপহার পেয়েছিলেন, এছাড়া আর যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন লাসা ও শিগাৎসের বাজারে, সেসব বয়ে আনতে দুটি চমরি ভাড়া করতে হয়েছিল। সেই পুঁথিপত্রের মধ্যে অনেকগুলো সংস্কৃত রচনা ও কাব্য ছিল, যা ভারতবর্ষ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বহুকাল আগে। তবে এই সবকিছুর মধ্যে অতীব মূল্যবান ছিল একটি দিনলিপি, যার পাতায় পাতায় যাত্রাপথের সম্পূর্ণ বিবরণ, ব্যক্তিগত অনুভব থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সামাজিক ও ধর্মীয় তথ্য অনুপুঙ্খভাবে লিখে রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। দার্জিলিঙে ফিরে এই দিনলিপির ওপর ভিত্তি করে তিনি তৈরি করবেন দুটি রিপোর্ট— *ন্যারেটিভ অফ আ জার্নি টু লাসা* এবং *ন্যারেটিভ অফ আ জার্নি রাউন্ড লেক পালটি (ইয়ামদোক), অ্যান্ড ইন লোখা, ইয়ার্লুং আন্ড সাক্য,* যা সরকারি মহলে প্রকাশিত হবে অত্যন্ত গোপনীয় নথির আকারে। তিব্বত সংক্রান্ত বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধি দলে চিন যাবেন শরৎ দাস, রায়বাহাদুর খেতাব পাবেন, রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মেডেলও। দার্জিলিঙের প্রান্তে তাঁর সুন্দর বাংলো লাসা ভিলা দেশি-বিদেশি তিব্বতপিপাসুর ঠিকানা হয়ে উঠবে। তিব্বতের ভাষা সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখবেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে, গড়ে তুলবেন বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি, একাধিক গ্রন্থরচনার কাজেও হাত দেবেন।

দার্জিলিঙে বসে যখন তিব্বতযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখছেন শরৎচন্দ্র, তখন শিগাৎসে ও লাসা থেকে শুরু করে নানান জায়গায় বিভিন্ন মানুষজন দেশদ্রোহিতার অপরাধে অন্ধকূপে বন্দি। মৃত্যুদণ্ড হয়েছে লামা সেংচেন দোর্জেচেনের। এই সংবাদ নিশ্চয়ই শরতের অজানা ছিল না। তখন কালিম্পং দিয়ে জেলেপ-লা হয়ে দার্জিলিঙের সঙ্গে তিব্বতের নিয়মিত বাণিজ্য চলত, সংবাদের আদানপ্রদানও হতো সেইসঙ্গে।

ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রায় কাউকেই স্বনামে উল্লেখ করেননি শরৎ। ফিরে আসার পর তাঁর যাত্রার পথে যে আতঙ্ক আর মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছিল, গোপন রিপোর্টগুলো সরকারি মহলে প্রকাশিত হবার পর তা ঘনিয়ে উঠবে গোটা তিব্বত জুড়ে। গুপ্তচর হিসেবে তাঁর সংগৃহীত তথ্যে বলীয়ান হয়ে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড সামরিক অভিযান করবেন ১৯০৩ সালে। শরৎচন্দ্র দাস ও তাঁর পূর্বসূরি গুপ্তচর 'পণ্ডিত'দের দিয়ে যে বৃত্ত আঁকা শুরু হয়েছিল, সেটি সম্পূর্ণ হবে। তিব্বত খুলে যাবে রহস্যময় মুক্তোগর্ভ ঝিনুকের মতো। অন্ধকূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে পাণ্ডুবর্ণ কঙ্কালসার মনুষ্যপ্রাণীরা। পাথরের ঘাম আর শ্যাওলা খেয়ে বেঁচেছিল তারা, আলোয় আনতেই মারা যাবে ডিম-ভাঙা ভ্রূণের মতো।

ততদিনে শরৎ ফিরে আসার পর কেটে গিয়েছে দু-দুটো দশক। মধ্যএশিয়ায় রাশিয়া ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রতিযোগিতা চলছিল, যাকে বলা হতো 'গ্রেট গেম', তার অন্তিম পর্যায়। সামরিক শক্তি আর বাণিজ্য বিস্তারের সুবাদে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত আরও মজবুত হয়েছে। দেশের প্রান্তে-প্রান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে রেলপথের জাল। টেলিগ্রাফ ছিলই, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে টেলিফোন। মোটরগাড়ি এসেছে, এসেছে সিনেমা, সময়ের ধারণাটাই বদলে গিয়েছে। কিন্তু তিব্বতে পৌঁছে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড ও তাঁর বাহিনী দেখলেন সময় যেন থমকে আছে, কুড়ি বছর আগে শরৎচন্দ্র দাস যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনই আছে।

রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জার্নালে লেখা একটি প্রবন্ধে পথপ্রদর্শক হিসেবে শরৎচন্দ্রের ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ইয়ংহাজব্যান্ড।[৬] দুঃসাহসী ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের জন্য, ভবিষ্যতের স্বেন হেদিনদের জন্য আরও একটি গন্তব্য কমে গেল দুর্ভাগ্যবশত— লিখছেন ইয়ংহাজব্যান্ড, এভাবে খুব শীঘ্রই সেই অভিযাত্রীরা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মতো হঠে যেতে থাকবে পৃথিবীর বুক থেকে, মেরুতুষারের দেশে অদৃশ্য হয়ে যাবে একদিন। আর স্মরণ করেছেন সেখানকার অবর্ণনীয় নৈসর্গিক শোভা, মাইল মাইল রিক্ত অন্তহীন মালভূমির আশ্চর্য সমাহিত রূপ, ভোররাতে তাঁবুতে বিউগলের শব্দে জেগে উঠে চরাচরময় ফিনফিনে তুহিনের ওপর নক্ষত্রের আলো ও তারপর চোমোলহরীর শীর্ষবিন্দুতে প্রথম রক্তাভা, দিনের পর দিন সূর্যাস্তের সময় স্বচ্ছ অন্তহীন আকাশ জুড়ে পীত ফিরোজা কমলা বেগনি রত্নের বর্ণচ্ছটা। তিব্বত নিয়ে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় যেন এক অতীন্দ্রিয়বাদী কবির মরমিয়া প্রকৃতিপ্রেমের কাহিনি।*

---

* এক অর্থে হয়েও উঠবেন। দক্ষ অফিসাব, দুঃসাহসী ভূপর্যটক, নাইট খেতাবপ্রাপ্ত স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি যেন ছিলেন হিপি প্রজন্মের পূর্বসূরি। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যের মাঝে এক অতীন্দ্রিয় উন্মোচনের কথা লিখে গিয়েছেন। মহাজাগতিক রশ্মির দিব্য শক্তিতে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্বে অলটেয়ার নামে এক সজীব গ্রহে যেখানে স্বচ্ছদেহী প্রাণীরা থাকে, নারীপুরুষের মুক্ত অবারিত প্রেমেও বিশ্বাস করতন। শেষ জীবনে তিব্বত অভিযানের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করেন।

BanglaBook.org

কিন্তু বাস্তবে এই অভিযান ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। অত্যাধুনিক ম্যাক্সিম বন্দুকে সজ্জিত গোর্খা ও শিখ রেজিমেন্টের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আদিম ম্যাচলক রাইফেল নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে হাজার হাজার তিব্বতি সৈন্য প্রাণ হারায়, ব্যাপক লুঠপাট চলে অসংখ্য মঠে গোম্ফায়, দলাই লামা পালিয়ে যান মোঙ্গোলিয়ায়, ব্রিটিশ সামরিক শক্তির চাপে পাহাড়পারের নিষিদ্ধ দেশ খুলে যায় ঝিনুকের মতো।

এই সময় থেকেই সরকারি মহলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন শরৎচন্দ্র দাস। বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যেতে থাকেন তিনি, কলকাতার বিদ্বৎসমাজেও উপেক্ষিত, দার্জিলিঙে লাসা ভিলায় বসে তিব্বতি ভাষাসাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর লেখা বইগুলো নতুন করে ছাপা না হওয়ায় বাজার থেকে হারিয়ে যায়, গোপন সরকারি রিপোর্টগুলো চাপা পড়ে যায় মহাফেজখানার ধুলোর নীচে, শরৎচন্দ্র দাসের নামটাই ঝাপসা হয়ে আসে, ক্বচিৎ হয়তো বা ফিরে আসে অফিসার্স ক্লাবে সানডাউনার-ছোপানো স্মৃতিচারণায়, কিপলিঙের বিখ্যাত *কিম* উপন্যাসে হারি চুন্ডার মুখার্জি নামে গুপ্তচর চরিত্রের আড়ালে থেকে যায় ছায়ার মতো। চাকরিতে অবসর নেবার পরে বকেয়া পাওনাগণ্ডা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলায় জড়িয়ে পড়েন তিনি, তিব্বতি ভাষার অভিধান লেখার কাজ শেষ করেন। ১৯১৭ সালে আটষট্টি বছর বয়সে মারা যান শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর বিপুল পুঁথি ও থংকার সংগ্রহ কিছু কিছু পরিবারের হাত ঘুরে ছড়িয়ে যায়, অধিকাংশই দার্জিলিঙের আর্দ্র আবহাওয়ায় অনাদরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ফরাসি প্রাচ্যবিদ আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীল কিনে নেন সেগুলি। তারপর একসময় লাসা ভিলাও হাতবদল হয়ে যায়।

দার্জিলিঙের দাস স্টুডিয়োয় পুরনো দিনের অসংখ্য ফোটোগ্রাফের মাঝে শরৎচন্দ্র দাসের শেষ বয়সের একটি ছবি দেখেছি আমি— চৌরাস্তার ওপর সেকালের ব্যান্ডস্টান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ— পরনে ওভারকোট, মাথায় টপহ্যাট, হাতে একটি সুদৃশ্য লাঠি। বয়সের ভারে সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন, কিন্তু চোখের চাহনি আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সেই গভীর আত্মপ্রত্যয় যা দোঙ্খিয়া পাসের ওপর চমরির পিঠে আসীন তাঁর ছবিতে দেখেছি। দার্জিলিঙে অবসর জীবনে প্রতিদিন বিকেলবেলায় নিয়ম করে লাসা ভিলা থেকে হেঁটে চৌরাস্তায় ব্যান্ডের বাদ্য শুনতে আসতেন। ম্যালে বিচরণরত সাহেবমেমরা অনেকেই দেখেছে নিখুঁত বিলিত পোশাক-পরা এক নেটিভ জেন্টলম্যানকে— ব্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে সামান্য দূরে ফোয়ারার কাছে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে গড সেভ দ্য কিং-এর সুরে মৃদু দুলছেন, হাতের লাঠিতে জড়ো করা আঙুলে তাল দিচ্ছেন, তারপর একসময় ফিরে যাচ্ছেন দিনশেষের কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি কিংবা সূর্যাস্তের মেহগনি আলোর ভেতর দিয়ে।

এমনই এক কুয়াশামোড়া অপরাহ্নে চৌরাস্তা থেকে ফেরার পথে রেলস্টেশনের কাছাকাছি এসে পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন শরৎচন্দ্র। নির্জন পথ, কুয়াশার

BanglaBook.org

ভেতর দু-হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। সতর্ক হয়ে হাঁটতে থাকেন, পেছনে পায়ের শব্দটা চলতেই থাকে। বেশ কিছুদিন ধরেই এই শব্দটা তিনি শুনছেন, কেউ একজন তাঁকে অনুসরণ করছে।

স্টেশনচত্বর জনহীন, একটা দুই কামরার ভুতুড়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপাশে ছায়ার মতো একসার গরুর গাড়ি, তার পেছনে পাইনের বনে কুয়াশা জড়িয়ে আঁধার হয়ে এসেছে। নীচে বুচারবস্তির ছোটা মসজিদ থেকে পাক খেয়ে উঠছে ক্ষীণ আজানের স্বর। হাঁটতে হাঁটতে খাদের ধার ছেড়ে পাহাড়ের দিকটায় সরে আসেন শরৎ, অনুসরণকারীও দিক বদল করে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেন একবার: বিশ্রস্ত কোট-পাজামা পরা একটি ছায়ামূর্তি, জড়োসড়ো ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে তাঁর দিকেই।

স্প্রিং-টেপা ছুরির মতো একটি স্মৃতির ভাঁজ খোলে শরতের স্নায়ুতে। শিগাৎসের বাজারে ঠিক এমনই ঘন কুয়াশার ভেতর একদিন এক খঞ্জ ভিখারি লাঠি ঠুকে অনুসরণ করেছিল তাঁকে, তারপর একসময় আচমকা সামনে এসে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে পথ আটকে চিৎকার করে উঠেছিল— ফাইলিং! ফাইলিং! বাজারভর্তি লোকের মাঝে ভিনদেশি শরৎকে চিনে ফেলেছিল সে। ভিখারিটির হাতে একটি মুদ্রা গুঁজে দিয়ে কুয়াশার মধ্যে কোনোক্রমে গা ঢাকা দিয়েছিলেন সেদিন।

স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে পাহাড়ের গায়ে দেহ সাঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন শরৎচন্দ্র, ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতেই সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপর। অপ্রস্তুত লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগে ওর গলা খামচে ঠেসে ধরেন পাহাড়ের গায়ে, বাঁ হাতের লাঠির হাতলে খোঁচড় দিয়ে বের করে আনেন ইস্পাতের সাপের মতো গুপ্তি।

—রাস্কেল! মেরা পিছা কিনা গরেকো হঃঃ? চিৎকার করে ওঠেন শরৎ, নিজের স্নায়বিক ক্ষিপ্রতায় নিজেই বিমোহিত হয়ে পড়েন।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিবশ হয়ে পড়ে লোকটিও। ওর সরু কুতকুতে চোখদুটো পুঁজের দলার মতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় লিকলিকে তিব্বতি ছুরিটির দিকে। শরৎ দেখেন, এক ছোটোখাটো চেহারার টিবেটো-মঙ্গোলয়েড প্রৌঢ়, চোখের দুপাশে অসংখ্য বলিরেখার কুঞ্চন, থুতনির ওপর সামান্য একটু দাড়ি, ডান কানে গোঁজা পেনসিলের টুকরো।

—পাণ্ডিব লা! হজুর! মো কিন্টুপ! টেলার কিন্টুপ! লোকটি কাতর স্বরে বলে।

ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উষ্ণ বাষ্প এসে লাগে শরৎচন্দ্রের মুখে। জামার ভেতর থেকে হলুদ হয়ে আসা একটি চিঠি কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে ধরে সে।

তিব্বতি ভাষায় লেখা একটি চিঠি, লাসা থেকে অজ্ঞাতনামা কেউ লিখছে দার্জিলিঙে তাকভরের বাসিন্দা জনৈক নিমা শেরিংকে। শুকরের বছরের বুদ্ধপূর্ণিমার পর থেকে নটি চাঁদের মাস শেষ হলে KP নামধারী এক ব্যক্তি অমাবস্যা থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন

BanglaBook.org

পেমাকো উপত্যকায় একটি গোপন স্থান থেকে সাংপোর স্রোতে পঞ্চাশটি করে কাঠের টুকরো ভাসাবে। নিমা শেরিংকে জানানো হচ্ছে সে যেন পত্রপাঠ এই বার্তা জলাপাহাড়ে সার্ভে অফিসের হার্মান সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়।

শরৎচন্দ্র দাসকে চিঠিটি পড়ানোর জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁকে অনুসরণ করছিল কিন্টুপ।

তিব্বত থেকে শরৎচন্দ্র ফিরেছিলেন ১৮৮২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। বড়দিন আর নববর্ষের উৎসবে তখন সেজে উঠেছে দার্জিলিং। তার মাত্র কিছুদিন আগে কিন্টুপ ফিরেছিল এক অচেনা শহরে। তার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল দুটো দুঃসংবাদ। বুচারবস্তিতে গিয়ে সে জানতে পারল কিছুকাল আগে অজানা জ্বরে মারা গিয়েছে তার স্ত্রী, ছোটো কন্যাসন্তানটি মারা গিয়েছিল তার আগেই। ছেলে দুটিকে সিকিমের নামচে বাজারে নিয়ে গিয়েছে এক আত্মীয়। সেই কাঠের বাসাটিও দখল হয়ে গিয়েছে; এক পড়শির ঘরের দাওয়ায় ঠাঁই হয় তার।

দ্বিতীয় দুঃসংবাদটি সমান হৃদয়বিদারক। ফেরার পরদিন একমাত্র ধোপদুরস্ত পোশাক পরে জলাপাহাড়ে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসে গিয়ে কিন্টুপ জানতে পারল হার্মান সাহেব দেশে ফিরে গিয়েছেন, তাঁর জায়গায় এসেছে নতুন ফিল্ড ডিরেক্টার ট্যানার সাহেব। অফিসে পরিচিত কাউকেই দেখতে পায় না সে। একজন কেরানিবাবুর পেছন পেছন সাহেবের চেম্বারে ঢুকে টেবিলের উলটোদিকে লাল গালপাট্টার সাহেবকে দেখে এক মুহূর্তে চিনতে পারে কিন্টুপ। আগের দিন সকালবেলায় শহরে এসে জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখে আতঙ্কে ছুটতে ছুটতে ঘোড়ায় চড়া এই সাহেবেরই পা জড়িয়ে ধরেছিল সে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে একটি মানচিত্রে নিবিষ্ট হয়েছিলেন সাহেব, হাতে জ্বলন্ত চুরুট। পায়ের শব্দেও চোখ তোলেননি। কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে গলা খাঁকরি দিয়ে মিনমিনে গলায় কেরানিবাবু বলল,

—স্যার, উই হ্যাভ আ ম্যান হিয়ার হু ক্লেমস হি ইজ আ পান্ডিট। হি ইজ সেয়িং দ্যাট কর্নেল হার্মান সাহিব সেন্ট হিম টু টিবেট রিজিয়ন অন আওয়ার সিক্রেট মিশন টু এক্সপ্লোর দ্য কোর্স অব রিভার সাংপো, স্যার। স্যার, হি ইজ সেয়িং হি হ্যাজ রিটার্নড টু বি ডিব্রিফড, স্যার।

টেবিল থেকে মাথা তুলে কিন্টুপের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান কর্নেল এইচ সি ট্যানার। এবং চিনতে পারেন।

—ইউ!

সাহেবের মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। তাঁর বিস্ফারিত চোখে চিকচিক করে ওঠে বিস্ময় আর কৌতুক।

পেমাকো উপত্যকা থেকে পাঠানো কিন্টুপ ওরফে KP-র বার্তা সার্ভে অফিসে এসে পৌঁছয়নি। সরকারি সিল-আঁটা কাঠের টুকরোগুলো সাংপো/ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ভেসে চলে

BanglaBook.org

গিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। লাসায় এক কাপড়ের ব্যবসায়ীকে দিয়ে লিখিয়ে নেম সিংকে যে বার্তা সে পাঠিয়েছিল, সেই নেম সিং ওরফে নিমা শেরিং মারা গিয়েছে তার আগেই। তিব্বতি ভাষায় লেখা সেই চিঠিটি তার বাড়িতে এসে পড়ে আছে, খোলাই হয়নি।

তাকভরে নেম সিঙের বাড়ি থেকে চিঠিটি উদ্ধার করে সার্ভে অফিসে নিয়ে গিয়ে দেখালেও ট্যানারের মুখের অভিব্যক্তিতে বিশেষ পরিবর্তন হয় না। লামা উগেন গ্যাৎসোকে দিয়ে তার অভিযানের বিবরণ নিয়মমাফিক নথিবদ্ধ করে রাখা হয় বটে, কিন্তু কোনোরকম স্বীকৃতি বা পুরস্কার কিছুই জোটে না কিন্টুপের। মাসের পর মাস দুর্গম অরণ্যপাহাড়ে সাংপোর গতিপথের যে জরিপ সে করেছে, তার সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি তার স্মৃতিতে খোদাই হয়ে ছিল, এক টুকরো কাগজও সঙ্গে ছিল না। একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে যে এমন কাজ করা সম্ভব, এটা কর্নেল ট্যানার বিশ্বাস করতেই চাননি। তাছাড়া থঙ্কুক গ্রামে ক্রীতদাস হয়ে পড়া ও তারপর পেমাকোচুং মঠের জীবনে দীর্ঘ চার বছর কেটে যাবার কাহিনি বিশ্বাস করেনি কেউই। এদিকে ঠিক সেই সময়েই ফিরে আসেন বেঙ্গল এডুকেশান সার্ভিসের শরৎচন্দ্র দাস। মধ্য তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরেছেন তিনি, জরিপ করেছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী, পাহাড় ও লেক, নিয়ে এসেছেন অসংখ্য কাচের প্লেট নেগেটিভ, মানচিত্রের খসড়া, তথ্যসংকলিত নোটবই। তাঁর অভিযানের সাফল্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সরকারি মহল, এক নিরক্ষর দর্জির কথা কারোর মনেই থাকে না।

চকবাজারের দর্জিগুমটিতে পুরোনো পেশায় ফিরে যায় কিন্টুপ, চার বছরে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে যাওয়া জীবনটা রিফু করতে শুরু করে। ভুটিয়া বস্তিতে তার খুপরি ঘরটি ফিরে পায়, নামচে থেকে পুত্রদের নিয়ে আসে, আবার একটি বিবাহও করে। সারাদিন দর্জিপাড়ায় সেলাই মেশিনের ঝর্ঝর শব্দের ভেতর থেকে তার স্মৃতিতে কৃচিৎ ভেসে আসে একটা ঝর্ণার তান, একটি রামধনু ফুটে ওঠে সেই ঝর্ণার গায়ে, আঙুলে ছুঁচ ফুটে রক্তপাত হয়। এভাবেই গড়িয়ে যায় দিন, ক্রমশ স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে, আফিমের আচ্ছন্ন নেশায় দেখা স্বপ্নের মতো মনে হয়। নেম সিং-এর বাড়ি থেকে উদ্ধার-করা সেই চিঠিটিও ঝাপসা হয়ে আসে, তাতে কালচে সবুজ ছোপ ছোপ ছত্রাক ধরে। স্যাঁতসেঁতে সেলাইগুমটিতে ক্ষীণ আলোয় কাজ করতে করতে চোখের দৃষ্টি কমে আসে কিন্টুপের, হাতের আঙুলে সন্ধিবাত শুরু হয়, কাজ কমতে থাকে, শুরু হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে বোঝাপড়া।

ইতিমধ্যে ট্যানার সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছেন, জলাপাহাড়ের অফিসে এসেছেন নতুন ডিরেক্টর। কিন্তু আগের সেই অভিজ্ঞতার পর একা সেদিকে পা বাড়াতে আর সাহস হয় না কিন্টুপের। অভিযানে যাবার আগে থেকেই শরৎ দাসকে চিনত সে। তিব্বত থেকে ফিরে আসার পর তিনি বিখ্যাত মানুষ, রায়বাহাদুর খেতাবধারী, উঁচুতলার সাহেবসুবো মহলে অবাধ যাতায়াত। উনি যদি দয়াপরবশ হয়ে একটা

BanglaBook.org

সুপারিশ করে দেন, সরকারবাহাদুরের কাছ থেকে একটা মাসোহারার ব্যবস্থা যদি হয়, নিদেন এককালীন ভাতা— এইসব ভাবনা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করছিল সে। স্টেশন পেরিয়ে তাঁর বিশাল বাড়ির সামনেও গিয়েছে, ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি।

কিন্টুপ জানত না, ইতিমধ্যে সময়ের পট বদলে গিয়েছে। দিনশেষের নির্জন কার্ট রোডের ধারে, যখন পাইনের বনে কুয়াশার ছায়া আর নীচে বুচারবস্তির থেকে ভেসে আসছে আজানের স্বর, অতর্কিত আক্রমণে যে মানুষটির মুখোমুখি হল সে, তিনিও আসলে তারই মতো, ইতিহাসের পরিত্যক্ত ভাঙা নৌকোয় নিঃসঙ্গ সহযাত্রী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বারো

শিকড়ের খোঁজে

কেবলমাত্র একধরনের যাত্রাই সম্ভব— লিখছেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভস্কি ; নিজের ভেতরে যাত্রা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে আমরা বিশেষ কিছুই শিখি না। মানুষ ফিরে আসবে বলে যাত্রা করে, এমন কিছুও আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ কখনোই তার প্রস্থানভূমিতে ফিরে আসতে পারে না, কারণ যাত্রার এই প্রক্রিয়ার ভেতরেই সে বদলে গিয়েছে। আর অবশ্যই আমরা নিজেদের থেকে কখনো বেরিয়ে যেতে পারি না। আমরা আদতে যা, সেটা নিজেদের ভেতরে বহন করে বেড়াই। আমরা আমাদের সত্তার আস্তানা বয়ে নিয়ে চলি, অনেকটা কচ্ছপের মতো। যেখানেই গিয়ে পৌঁছোই না কেন, আসলে কিন্তু নিজের ভেতরের সত্তাকেই খুঁজে চলেছি আমরা।

স্মৃতিময়

স্মৃতির শহরে বেড়াতে যাবার মতো বিলাসিতা আর কিছুতে নেই। দার্জিলিং থেকে বদলি হয়ে চলে আসার পরেও তাই বিভিন্ন সময়ে সেখানে গিয়েছি। প্রতিবারই দেখেছি শহরটা বদলে যাচ্ছে। আমিও বদলেছি, সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হতে একরকমভাবে থিতু হয়েছি। দার্জিলিঙে আমার প্রবাস নিয়ে একটি বই লিখেছি, দু-চারজন মানুষ পড়েছেন সেটি। এরপর যতবার দার্জিলিঙে গিয়েছি, নিজের লেখা সেই বইয়ের ভেতর দিয়ে শহরটাকে দেখতে চেয়েছি আমি, স্বরচিত কুয়াশার ভেতর দিয়ে, আর প্রতিবারই ভগ্নহৃদয়ে ফিরে এসেছি। এ যেন অনেকটা কিশোর বয়সে প্রেমিকাকে নিয়ে কবিতা লেখার মতো: যার হাসি, চাহনি, তর্জনি ঘুরিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরানোর বিশিষ্ট ভঙ্গি, উৎকণ্ঠিত নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরা, গ্রীবার ডৌল দিয়ে বিনিদ্র রাতভর কাগজের ওপর তিলতিল করে তৈরি হয় যে প্রতিমা, দিনের আলোয় সেই রক্তমাংসের মানবীর সামনে এসে বালির মূর্তির মতো ঝুরঝুর করে সেই প্রতিমার ঝরে যাওয়া। বইটা লেখার পর যে দার্জিলিং আমি ভেতরে বয়ে নিয়ে গিয়েছি, যে দার্জিলিঙের সামনে এসে পড়েছি, তাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বেড়েছে।

BanglaBook.org

বছর কুড়ি আগে প্রথমবার এসেও এমনই ঠকে যাওয়ার অনুভূতি হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার এই শহর নিয়ে কোনো স্মৃতি ছিল না। শুধুই কল্পনা ছিল। বার বার এই ফিরে আসা অনেকটা যেন ধূমকেতুর মতো, মহাজাগতিক ধুলো গ্যাস আর বরফকণায় তৈরি স্মৃতির পুচ্ছ নিয়ে আসা। সেই উজ্জ্বল পুচ্ছ ফুটে থাকে চেতনার আকাশে। তার প্রভায় কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দূরের মুঠিভর গ্রাম, ধাপকাটা ফসলের খেত দেখে মনে হয় যেন এক নিঃসঙ্গ মেমসাহেব জলরঙে ছবি আঁকছে, চৌরাস্তায় সুবেশ পুরুষনারী দেখে মনে হয় গোলাকার কাচের ঢাকনির নীচে ঘুরে-চলা পুতুলের দল, চলন্ত টয়ট্রেনের জানলা থেকে অপস্রিয়মাণ শহরটা যেন ফিল্মের সেট। সারাদিন অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতর গুটিয়ে আসা, নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে আসা দার্জিলিং আমায় টানে একটা পুরোনো গানের কলির মতো।

সেই টানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে একটি উপলব্ধি ক্রমশ স্পষ্ট হল আমার ভেতরে। দার্জিলিং নয়, পশ্চিমি শিক্ষায় জারিত বাঙালি মন যেভাবে ব্রিটিশদের পত্তন করা এই শৈলশহরকে দেখেছিল, সেই দেখাটাকেই খুঁজে চলেছি আমি ক্রমাগতঃ দৃষ্টির এক বিশেষ ভঙ্গি, চোখের তারায় সূক্ষ্ম বিস্ফার, এক অতীন্দ্রিয় ঝলকানি। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আমার অশীতিপর দাদু, কোলের ওপর শীত অপরাহ্নের রোদ এসে পড়েছে, স্মৃতি হাতড়ে আউড়ে চলেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে যেতে বাঁক ঘুরে আচমকা যেখানে ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মতো হলুদ বুনো ফুল ফুটে থাকতে দেখেন কবি, যেখানে এসে দাদুর কণ্ঠস্বরে একটা কম্পন লাগত, সেই সূক্ষ্ম কম্পন, সেই ঝলকানি। কিংবা টাইগার হিলে নবদম্পতি, প্রথম আলো মুখে মেখে যুগলে ছবি তোলার জন্য পর্যটকের ভিড়ের ভেতর একজন সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ক্যামেরা, তাদের মুখে এক বিশিষ্ট উচ্ছ্বাস। অথবা বাতাসিয়ায় পথের বাঁক ঘুরতেই দূর পাহাড়ের গায়ে জাদুকরের টুপির ভেতর থেকে পায়রার মতো দার্জিলিং শহরকে ডানা ঝটপটিয়ে উঠতে দেখে জিপবোঝাই পর্যটকের মুখে চকিত বিস্ময়। আসলে দার্জিলিং ছিল একটি নিমিত্তমাত্র, ভাস্করের হাতে পাথরখণ্ড যেমন ; নিরন্তর সেটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটি আকারকে খোঁজা, যা আসলে ওই পাথরে নেই।

এলোমেলো ঘুরে বেড়াই শহরের পথে, ব্যাক ম্যাল থেকে শ্রাবেরি পার্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই লেবঙের দিকে, ফিরে আসি গভর্মেন্ট কলেজের পাশ দিয়ে। কোয়ার্টার্স চত্বরে সেই পুরোনো কটেজগুলো ভেঙে তৈরি হয়েছে কংক্রিটের বহুতল, প্রফেসর নোরবু মারা গিয়েছেন, পরিচিত অনেকেই মারা গিয়েছে, পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা জীবিকার টানে শহর ছেড়েছে, সমতলের সহকর্মীরা সকলেই বদলি হয়ে চলে গিয়েছে। অনেক নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে, অনেক লজ হোটেল রেস্টুরেন্ট, কিছু কিছু পুরোনো বাড়ি পরিত্যক্তও হয়েছে। দার্জিলিঙের ভিজে আবহাওয়ায় ঘরবাড়ি পরিত্যক্ত হলে কিছুদিনের মধ্যেই খুব পোড়ো আর প্রাচীন বলে মনে হয়, দেয়ালে বহুবর্ণ শ্যাওলা আর লাইকেন ছেয়ে আসে, জানলা-দরোজার কাঠ পচে খুলে আসে, টিনের চালে ছড়িয়ে যায় মরচের বাদামি ছায়া।

BanglaBook.org

ওইরকম বহুবর্ণ শ্যাওলা আর লাইকেন পুরোনো গোরস্থানে কবরের পাথরেও দেখা যায়। বর্ষার দুপুরবেলায় জায়গাটা যথারীতি নির্জন পড়ে আছে। কলেজছুট প্রেমিকজুটি নেই, এমনকি পাতাখোরেরাও জোঁকের উৎপাতে অন্যত্র ঠেক বসিয়েছে। ব্যস্ত কার্ট রোড থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে নির্জন গোরস্থানে ছেয়ে আছে এক অদ্ভুত পলকা প্রশান্তি। মাটির নীচে মানুষগুলো ঘুমিয়ে থাকার জন্যেই কি? কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। পাইনের বাকলে জড়ানো টাইগার ফার্নের পাতায় জলের ফোঁটার টুপটাপ শব্দ হচ্ছে, কবরের ভিজে বাসাল্ট পাথরে হিমালয়ান গোল্ডেন ঈগলের পালকের রং ফুটেছে।

তেমন এক ঈগলকে একটা সেনোটাফের ওপর বসে থাকতে দেখেছিলাম একবার। ডানাদুটো সামান্য তুলে মাথা বাঁকিয়ে আগুনের ফোঁটার মতো চোখ মেলে আমার দিকে সরাসরি চেয়েছিল। আরেকবার দেখেছিলাম এক বিদেশিনীকে। তার পরণে ছিল ব্যাকপ্যাকারদের মতোই দিশি সুতির পোশাক, মাথার সোনালি চুল ভিজে লেপ্টে ছিল ঘাড়ে, নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি কবরের সামনে। জুলিয়া গ্রিফিথের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। যে সৌধটির সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটি ছিল কোরোশি চোমার। সম্প্রতি সেটি সংস্কার হয়েছে, নতুন রঙের প্রলেপ পড়েছে। ছয়কোনা সৌধটিকে দেখতে ঠিক যেন ব্রিটিশ আমলের ডাকবাক্সের মতো, পুরোনো শহরগুলোয় রাস্তার পাশে এখনও যেমন দেখা যায়।

হারিয়ে যাওয়া সময়ের ডাকবাক্স। কী চিঠি ফেলব আমি? কী চিঠি ফেলেছিল জুলিয়া গ্রিফিথ?

হিমালয়ের এক পাহাড়ি জনজাতির হারানো জীবনধারার খোঁজে এসেছিল জুলিয়া। হাঙ্গেরি থেকে কোরোসি চোমা এসেছিলেন নিজের জাতির উৎস সন্ধানে। কোরোসির সেই আসার মধ্যে নিজের ভারতে আসার কোনো অনুরণন খুঁজে পেয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু এই আশ্চর্য পর্যটকের কথা প্রথম শুনি ওর মুখেই।

সুদূর অতীতে হাঙ্গেরিয়রা চিন বা মধ্য এশিয়ার কোনো একটি পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছে, এমন একটা প্রবাদ ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন কোরোসি। বড়ো হয়ে তার সত্যতা নির্ণয় করতে বেরিয়ে পড়লেন।

—কল্পনা কর সেই কোন উনিশ শতকের গোড়ায়, জুলিয়া বলেছিল। তখনও সুয়েজ ক্যানাল হয়নি। পালতোলা জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে মধ্যএশিয়া ছিল কয়েক মাসের পথ, স্থলপথ ছিল কঠিন বিপদসঙ্কুল সিল্ক রুট ধরে। কোরোসি এসেছিলেন স্থলপথে। সঙ্গে সামান্য পাথেয়, হাতে লাঠি, কাঁধে ছোট্ট বোঝা। কোথায় চলেছ, কোরোসি? জানতে চেয়েছিল এক প্রতিবেশী কাউন্ট। আমি চলেছি এশিয়ায়, আমার আত্মীয়দের সন্ধানে, জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

যাত্রার প্রস্তুতি অবশ্য চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। পণ্ডিত ও যাজক পরিবারের ছেলে, ইস্কুলে পড়ার সময়েই লাতিন, গ্রিক, হিব্রু, জার্মান, ফরাসি, রুমানিয়ান ও তুর্কির ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে জার্মানির গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে

BanglaBook.org

ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাচ্যবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের পাঠ। এমনকি আরবিও শেখেন, ওই ভাষায় লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি মর্মোদ্ধারের জন্য। এসবই ছিল এক দীর্ঘ অচেনা পথে পাড়ি দেবার প্রস্তুতি, যার লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্টঃ মধ্যযুগে হাঙ্গেরীয় জনজাতির যে আদিপুরুষেরা মধ্য এশিয়ায় বসবাস করত বলে শুনেছিলেন, তাদের সম্পর্কে জানা।

ভেবেছিলেন পূর্ব সাইবেরিয়া দিয়ে গিয়ে দক্ষিণে ঘুরে চিনের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে ঢুকবেন। এজন্য ক্রোয়েশিয়ায় গিয়ে ন-মাস কাটে স্লাভনিক ভাষার চর্চায়। শেষপর্যন্ত ১৮১৯ সালে যখন যাত্রা শুরু করলেন, কোরোসি চোমার বয়স ৩৫ বছর।

—আমার এখন একত্রিশ চলছে, জুলিয়া বলেছিল। কখনো মনে হয় না জীবনটা ঢের দেখা হল। কিন্তু সেই সময়টা একবার ভাবো, পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু তখন কতই বা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একজন মানুষ তার অভীষ্ট জীবন শুরু করছে।

তখন রাশিয়ায় মহামারী লেগেছে, পূর্বপরিকল্পনামাফিক সাইবেরিয়া দিয়ে যেতে পারেননি কোরোসি। ক্রোয়েশিয়া থেকে বুখারেস্ট হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল, সেখান থেকে আলেক্সান্দ্রিয়ার একটি জাহাজে চড়ে বসেন। কিন্তু ততদিনে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে ওই অঞ্চলেও। নিরাপদ বন্দরের খোঁজে তাঁদের জাহাজটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে কিছুকাল ভেসে চলার পর অবশেষে ভিড়ল এসে সিরিয়ায়। বন্দরে নেমে এশিয় পোশাক পরে নিলেন কোরোসি, ছদ্মনাম নিলেন সিকান্দার বেগ।* কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো মালবাহী নৌকোয় চড়ে টাইগ্রিস নদী দিয়ে পৌঁছলেন এসে বাগদাদে, সেখান থেকে কারাভানের দলে সেকালের পারস্যের রাজধানী তেহরান। এখানে ব্রিটিশ দূতাবাসের এক অফিসারের আতিথ্যে চার মাস কাটান তিনি, ফারসি ভাষা শেখেন। তেহরান থেকে একটি চিঠিতে লিখছেন— নিজের ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য এবং দেশের প্রতি প্রেম আর কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিতে আমি এই যাত্রায় বেরিয়েছি ; যত বড়ো বিপদের সম্মুখীন হই না কেন, যত দূরত্ব অতিক্রম করতে হোক না কেন, স্বজাতির উৎসভূমি খুঁজে বের না করা পর্যন্ত থামব না।

১ মার্চ, ১৮২১। তেহরান থেকে বের হলেন কোরেসি, এক আর্মেনীয়র ছদ্মবেশে, সিল্ক রুট ধরে বুখারা, বামিয়ান, কাবুল ছুঁয়ে, কারাকোরাম গিরিপথ পেরিয়ে লাহোরে পৌঁছলেন ঠিক এক বছর পরে। সেখান থেকে কাশ্মীর হয়ে লে উপত্যকা।

—এমন সব দুর্গম রহস্যময় বিপদসংকুল অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিলেন, যা তাঁর আগে কোনো ইউরোপীয় চাক্ষুষ করেনি। অথচ কোনো চিঠিতে কিংবা বইতে সেইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে এক লাইনও লেখেননি। কী অদ্ভুত, না ?

এই কথাগুলো বলার সময় জুলিয়ার চোখের মণি স্বচ্ছ কটাশে থেকে সবুজাভ হয়ে উঠেছিল। আমরা বসেছিলাম হারমিটেজ রোডে নিরভানা কাফে নামে (এখন আর নেই) একটি কাঠের ঝুলন্ত লগক্যাবিনে। শার্সির বাইরে দূরে চা-বাগানের ওপর দিয়ে ছেঁড়া

---

* কোরোসি চোমার পুরো নামটি ছিল আলেক্সান্দার চ্যোমা ডি কোরোস।

ছেঁড়া মেঘ সরে যাচ্ছিল, সরু পায়ে-চলা পথগুলো জীবন্ত সাপের মতো বিভ্রম তৈরি করছিল।

লে-তে পৌঁছে কোরোসির দেখা হল উইলিয়াম মুরক্রফট নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক গোয়েন্দা অফিসার ও পশুবিশেষজ্ঞের সঙ্গে। কোম্পানির ফৌজের জন্য ঘোড়া আর গোপন সামরিক খবরাখবর সংগ্রহ করতে এসেছিলেন মুরক্রফট। পথে এক রাশিয়ান গুপ্তচরের কাছ থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করেন— সেন্ট পিটার্সবার্গের কাউন্ট চিঠিটি লিখছেন পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের রাজা রঞ্জিত সিংহকে। তখন মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিযোগিতা চলছে। এমত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ভারতের এক করদ রাজ্যের রাজাকে রাশিয়ার শাসকের লেখা চিঠির গুরুত্ব অসীম। কোরোসি চোমাকে পেয়ে ওঁকে দিয়ে সেটি রাশিয়ান থেকে অনুবাদ করালেন মুরক্রফট ; রাজার চরের হাতে পড়ার আশঙ্কা থেকে ইংরেজি ও লাতিন দুটি ভাষাতেই অনুবাদ করালেন। আর সেটা করতে গিয়ে তাঁর মাথায় এল কোরোসির বহুভাষী প্রতিভা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে সদ্ব্যবহারের ভাবনা।

ইতিমধ্যে জর্জ বোগল শিগাৎসে গিয়ে পাঞ্চেন লামার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, তিব্বত নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা ছিল তিব্বতি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। বাণিজ্য ও শাসনকার্যের অঙ্গ হিসেবে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করার যে চর্চা চলছিল, এখানে সেটা সম্ভবপর হচ্ছিল না। তিব্বতি ভাষার একমাত্র যে ইউরোপীয় অভিধানটি পাওয়া যেত, সেটিও ছিল পুরোনো এবং অসম্পূর্ণ।* নতুন একটি অভিধান লেখার জন্য কোরোসিকে উৎসাহ দিলেন মুরক্রফট, এজন্য অর্থবরাদ্দের আবেদন জানিয়ে সরকারি ওপর মহলে চিঠিও লিখলেন। ভদ্রলোককে পাঁচমাস খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি— মুরক্রফট লিখছেন সিমলায় কোম্পানির এক কর্তাকে— ওঁর প্রখর বিচারবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচর্চায় নিষ্ঠা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। ওঁর মূল লক্ষ্য যদিও এশিয় ও ইউরোপীয় ইতিহাসের কী এক ধোঁয়াশাময় অঞ্চল, কিন্তু তিব্বতের ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ওই ভাষায় লিপিবদ্ধ সমস্ত জ্ঞান অধিগত না হওয়া পর্যন্ত ওই দেশে গিয়ে থাকতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ। বিভিন্ন দিক থেকেই এটি পাশ্চাত্য জগতে অতীব কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে।

—বুঝতেই পারছ, সরকারি সাহায্য আসতে দেরি হয়নি। আর তার ফলে কোরোসি যাত্রা শুরু করলেন এমন এক নতুন পথে, যা তাঁকে ভারতে বেঁধে রাখবে জীবনের বাকি কুড়িটা বছর। হাঙ্গেরিয় জাতির যে আদিভূমির খোঁজে দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, সেখানে পা রাখা তাঁর আর হবে না। কিন্তু গোটা বিশ্বে কোরোসি চোমা পরিচিত হবেন প্রথম সত্যিকারের ইউরোপীয় তিব্বতবিদ হিসেবে।

---

* ফ্রান্সিসকান ধর্মগোষ্ঠীর পুরোহিত গিয়র্গির লেখা তিব্বতি-লাতিন অভিধান Alphabetum Tibetanum রোমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৬২ সালে।

BanglaBook.org

—এ তো ভারি আজব! আমি বলেছিলাম। স্বজাতির উৎস সন্ধানে বেরিয়ে এত দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে শেষকালে কি-না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের পুতুল হয়ে পড়লেন?

—না দেখ, বিষয়টাকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে, জুলিয়া বলেছিল। দেশ থেকে যে টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন তা ফুরিয়েছিল, একটা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের হয়তো প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া কোরোসি বিশ্বাস করতেন, হাঙ্গেরিয়দের আদি পুরুষেরা মোঙ্গোলিয়ার জনগোষ্ঠীর অংশ। তিব্বতের শুকনো শীতল আবহাওয়ায় অসংখ্য মঠে গোম্ফায় শত শত বছর ধরে সংরক্ষিত হয়েছে জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা আর কোথাও ছিল না। সেইসব পুঁথিপত্রে পাণ্ডুলিপিতে কিছু একটা হদিশ পাবার সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল তাঁর মনে।

ব্রিটিশ সরকারের কাছে মাসিক পঞ্চাশ টাকার বৃত্তি নিয়ে প্রথমে লে উপত্যকায় দুর্গম গোম্ফায় ও তারপর সাটলেজ নদীর ধারে একটি কুঁড়েয় প্রায় পাঁচ বছর তিব্বতি ভাষাসাহিত্যের গভীর অধ্যয়নে কাটান কোরোসি। এই সময় ওই অঞ্চলে গ্রামবাসীদের গুটি বসন্তের প্রতিষেধক টিকা দিতে গিয়েছিলেন জনৈক ব্রিটিশ অফিসার ডক্টর জেরার্ড। তিনি লিখছেন— প্রবল ঠান্ডার মধ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশমি চাদর জড়িয়ে একটি নীচু ডেস্কে বসে সকাল থেকে রাত অব্দি অধ্যয়ন করেন কোরোসি; কোনোরকম বিরতি নেই, আগুন কিংবা আরামের ব্যবস্থা নেই; খাদ্য বলতে একই বৈচিত্র্যহীন থকথকে মাখন-চা, যদিও ওই অঞ্চলে আঙুর আর খোবানির বাগিচা রয়েছে।

এভাবেই তিব্বতি ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে বই লেখার কাজ শুরু করেন। এরপর কলকাতায় এসে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিকের কাজ নেন, চলে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে চর্চা এবং সোসাইটির পত্রিকায় লেখালেখি। কিন্তু তাঁকে হাতছানি দিচ্ছিল তিব্বত। ১৮১৯ সালে হাঙ্গেরি থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন তিনি। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২, এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিকে লেখা চিঠিটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর উইল বলা যেতে পারে। কিছুকালের জন্য মধ্য এশিয়ায় ভ্রমণের কথা লিখছেন, এবং কোনো কারণে পথে মৃত্যু হলে তাঁর ব্যক্তিগত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করে যাবার অঙ্গীকার করছেন।

কোরোসির বয়স ততদিনে ৫৮ ছুঁয়েছে, দীর্ঘকাল কৃচ্ছসাধনে স্বাস্থ্যও তেমন মজবুত নয়। তবু পায়ে হেঁটেই দার্জিলিং গিয়েছিলেন তিনি। ২৪ মার্চ এসে পৌঁছেছিলেন তরাইয়ের ম্যালেরিয়াপ্রবণ মৃত্যু উপত্যকায়। দার্জিলিঙের যাত্রীরা সাধারণত দিনে দিনে যত দ্রুত সম্ভব এই এলাকাটি পার হয়ে যাবার চেষ্টা করত। কিন্তু কোরেসি রাত্রিযাপন করেছিলেন। দার্জিলিঙে পৌঁছে দেখা করলেন হিলস্টেশনের নতুন সুপারিন্টেডেন্ট ডক্টর ক্যাম্পবেলের সঙ্গে।

সিকিমের ভেতর দিয়ে লাসা যাবার পরিকল্পনা ছিল। সেইমতো সিকিমের রাজার কাছে যাত্রার ছাড়পত্র চেয়ে পাঠালেন ক্যাম্পবেল। ততদিনে তিব্বতবিদ হিসেবে

কোরোসির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং ছাড়পত্র পাবার ব্যাপারে কোনো সংশয় ছিল না। স্বভাবতই কোরোসি ছিলেন উচ্ছ্বসিত। যখন লাসায় গিয়ে পৌঁছব, হজসন-টার্নারেরা যেকোনো মূল্যে আমার সঙ্গে স্থান বদল করতে চাইবে!— ক্যাম্পবেলকে বলেছিলেন।* কিন্তু ৬ এপ্রিল দুপুর থেকে জ্বর এল, সঙ্গে কাঁপুনি। তরাইয়ের মারণবীজ বাসা বেঁধেছিল তাঁর শরীরে। তবু আচ্ছন্ন ঘোরের ভেতরে ক্যাম্পবেলকে শুনিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের কথা, বলেছিলেন ইতিহাসের কোন কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে পূর্ব এশিয়া থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা যাত্রা করেছিল সুদূর হাঙ্গেরিতে। লাসা থেকে উত্তরে এবং চিনের পশ্চিমে কোনো একটি অঞ্চলে সেই আদি 'হান' ও 'ইয়োগোর' নামের জনগোষ্ঠী রয়েছে (কোরোসির তত্ত্ব অনুযায়ী এদের মধ্যে থেকে উদ্ভব হয়েছে 'হাঙ্গেরিয়'-দের)। সেই আদি বাসভূমিতে যাবার প্রতীক্ষায় ছিলেন কোরোসি। কিন্তু জ্বরের প্রকোপ বাড়তেই লাগল, বিকারের ঘোরে ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি, বিড়বিড় করে আউড়ে যেতে লাগলেন অচেনা সব অঞ্চল আর দুর্বোধ্য জনগোষ্ঠীর নাম। ১১ এপ্রিল ১৮৪২, ভোর পাঁচটায় মারা গেলেন কোরোসি চোমা। তাঁর সঙ্গে সম্পত্তি বলতে ছিল চারটে বাক্সে বই ও কাগজ, তিনটি চাদর, একটিই নীল পোশাক যা তিনি পরেছিলেন মৃত্যুর সময়ে, আর একটি রান্নার পাত্র।

তাঁর কথা শুনে মনে হতো, সত্য উদ্‌ঘাটনের থেকেও নানান অস্বচ্ছ বিষয় সম্পর্কে কষ্টকল্পনাতেই বেশি মশগুল ছিলেন তিনি— মৃত্যুর আগে কোরোসির শেষ দিনগুলো লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ডক্টর ক্যাম্পবেল।

অনেককাল পরে পেশাদার এথনোগ্রাফারেরা অনুসন্ধান করে দেখবে কোরোসি চোমার অনুমানে গলদ ছিল, জুলিয়া জানাল। হাঙ্গেরিয় জাতির সঙ্গে এশিয়ার কোনো জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক নেই। আসলে একটি মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে এতদূর এসেছিলেন কোরোসি। হয়তো শেষের দিকে সেটা বুঝতেও পেরেছিলেন। তাই বলে কিন্তু তাঁর অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, এ কথা বলা যাবে না। একটা প্রাপ্তিও তো ছিল। এমনই তো হয়।

জুলিয়া এই কথাগুলো বলেছিল শিংলিলার উঁচু জঙ্গলে একটি পোখরির ধারে বসে। আদিম লেপচা বসতির সন্ধানে বেরিয়ে রিম্বিক গুর্দুম হয়ে দুদিনের ট্রেকপথে নেপাল সীমান্তের কাছে সেই জায়গাটায় পৌঁছেছিলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে ছিল কুলি-গাইড আর হেমরাজ ছেত্রী নামে প্রাণীবিদ্যার এক গবেষক। হেমরাজ কাজ করছিল হিমালয়ান সালামান্ডার নামে এক বিরল প্রজাতির সরীসৃপ নিয়ে, এক জীবন্ত ফসিল, যা বিবর্তনের ধারায় থমকে রয়েছে হাজার কোটি বছর। পোখরির জলে সেই সালামান্ডারের একটি উপপ্রজাতি খুঁজে পেয়েছিল হেমরাজ, কিন্তু দুদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোনো লেপচা বসতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তেমন কিছু যে নেই, থাকতে পারে না, তার একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল রিম্বিকেই।

---

* ব্রায়ান হজসন (১৮০১-১৮৯৪) ও জর্জ টার্নার (১৭৯৯-১৮৪৩), বৌদ্ধধর্ম বিশেষজ্ঞ।

BanglaBook.org

পাহাড়ের দাঁড়ার ওপর বড়ো ডোবার মতো পোখরির পাশে এক চিলতে সমতল ঘাসজমিতে তাঁবু ফেলা হয়েছিল। একদিকের ঢালে ঘন রডোডেনড্রনের বন, ফেজেন্ট প্যারটবিল ও আরও নাম-না-জানা পাখির কুজনে মুখরিত, অন্যদিকে খাড়া পরতে পরতে আগ্নেয়শিলার স্তর আঁকড়ে মাথা তুলেছে সিলভার ফার। সন্ধ্যা নামতে আচমকা সামনে থেকে মেঘকুয়াশার যবনিকা সরে গিয়ে দেখা দিল আকাশজোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা। কুলিরা আগুন জ্বেলেছিল। সেই আগুনের ধারে বসে, তারার আলোয় ধকধক করে ফুটে থাকা নীলাভ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে জুলিয়ার চোখেমুখে কোনো ব্যর্থতার গ্লানি ছিল না, একটা উদ্ভাস ছিল। তীব্র ঠান্ডায় হাত-পা জমে অবশ হয়ে আসছিল, কিন্তু সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য ছেড়ে আমরা কেউই ফিরতে পারছিলাম না তাঁবুতে ঘুমথলির ভেতর। রাত বাড়লে ক্রমশ পোখরির জলে বিছিয়ে এল স্বচ্ছ বরফের চাদর। তার ওপরে প্রতিফলিত একমুঠো নক্ষত্র ও হেল-বপ নামের সেই ধূমকেতু।

শ্মশান

দার্জিলিঙের পুরোনো গোরস্থানে কোরোসি চোমার স্মৃতিসৌধ দাঁড়িয়ে থাকে হারানো দিনের ডাকবাক্সের মতো। দু-পাশ থেকে ঘিরে এসেছে বাড়িঘর, বেশ কিছু পাইন গাছ কাটা পড়েছে, নতুন রং আর ফলক চেপেছে কিছু পুরোনো কবরের গায়ে, ফাঁকে ফাঁকে মরশুমি গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্যায়নের প্রয়াস। কার্ট রোড ধরে গাড়ি করে যেতে যেতে জানলায় চকিতে পাহাড়ের গায়ে ধাপকাটা সরকারি পার্ক ভেবে ভ্রম হতে পারে। কুড়ি বছর আগে নিত্যদিন গোরস্থানের ভেতর যে পায়ে-চলা পথ দিয়ে শর্টকাট করতাম দিনের বিভিন্ন প্রহরে, সকালে ইস্কুলমুখো শিশুদের কলকাকলিতে ভরে থাকত যে পথটা, তারপর নির্জন হয়ে পড়ত, একটি মাকড়শা এক মনে জাল বুনে চলত কবরের মাথায় মাথায়, দুপুরবেলায় কলেজছুট প্রেমিপ্রেমিকারা এসে আড়াল খুঁজত শ্যাওলাঢাকা এপিটাফের পেছনে, বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির পর গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ত ঘাসে, পাইনের মোচা নিয়ে খেলা করত কাঠবেড়ালিরা, ঘাসের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজত টিট-ব্যাবলার, সেই গোরস্থানটিকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

গোরস্থান ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলে খাড়া উঠে গিয়েছে হুকার রোড। জোসেফ হুকারের সেই বাংলোটিকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রাস্তার ওপর ঠেসে-আসা কংক্রিটের বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে কয়েক শো ফুট উঠে ম্যলে যাবার রাস্তা। সাপলুডো খেলায় মই বেয়ে যেন এক লহমায় উঠে আসা যায় শহরের ওপরতলায়। বাঁদিকে রাজভবনের টানা পাঁচিল, ডান দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের ঢালে শহরের ব্যাপ্ত দৃশ্য, যা দিনের আলোয় মনে হয় যেন আকাশে কোনো অতিকায় কুড়াদান থেকে ঢেলে দেওয়া টিন-কাঠ-কংক্রিট আবর্জনা, পাতলা কুয়াশার রাতে দেখে মনে হয় আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত

BanglaBook.org

লাভাস্রোত, আবার কখনো, কোনো কোনো মেঘভাঙা পড়ন্ত আলোয়, এক জাতিস্মরের চোখে স্মৃতিনগরীর উদ্ভাস।

সেই দৃশ্যে চোখ রেখে উঠে আসতে আসতে মেফেয়ার হোটেল, জিমখানা ক্লাব, সেন্ট এনড্রুর গির্জা ছাড়িয়ে উইন্ডামিয়ার হোটেলের সামনে এসে পৌঁছতে রাস্তায় একঝাঁক মানুষ। তাদের মাথার ওপর অতিকায় পতঙ্গের ডানার মতো অনেকগুলো রিফ্লেক্টার। একটি উঁচু ক্রেনের মাথায় ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে এক সাহেব, কানে হেডফোন। শুটিং চলছে। জানা গেল, ফরাসি প্রাচ্যবিদ আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীলের জীবন নিয়ে ছবি করতে এসেছে হলিউডের একটি দল। ডেভিড-নীলের সঙ্গে উইন্ডামিয়ার হোটেলের সম্পর্ক অবশ্য জেনেছিলাম পরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্মৃতির রাজপুত্র

বালক বয়সে সিকিমের রাজা সিদকিয়ং টুলকু লামা হিসেবে দীক্ষা নিয়েছিলেন গ্যাংটকের কাছে ফোদং গোম্ফায়। রাজা ও আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীলের সাদাকালো ছবি আর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের একটি ছোটো মিউজিয়াম হয়েছে সেখানে। রিঞ্চেনপং থেকে ফ্রাঁসোয়ারা গিয়েছিল ফোদং, আমরা ফিরে এসেছিলাম। গ্যাংটকে কয়েকদিন থাকার পর কলকাতা হয়ে থাইল্যান্ড যাবার পরিকল্পনা ছিল ফ্রাঁসোয়ার। আমি তখন চন্দননগর সরকারি কলেজে আছি। আমার কর্মস্থলের ঠিকানা শুনে ফ্রাসোঁয়া ভুরু কপালে তুলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিল:

—শ্যাঁদেন্যাগোহ্!

হুগলি নদীর ধারে নিজের দেশের এই ছোট্ট অতীত উপনিবেশের নামটা জানা ছিল তার। কলকাতায় এলে চন্দননগরে ঘুরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমিও। ভাবিনি সত্যিই আসবে, তাও আবার এক মে মাসের দুপুরে, হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে। একাই এসেছিল ফ্রাঁসোয়া, পরনে গান্ধী আশ্রমের ফতুয়া মাথায় খেজুরপাতায় বোনা টুপি, গরমে চামড়ায় ডালিমফুলের মতো রং ধরেছে। জুন আসেনি, গ্যাংটক থেকে সে চলে গিয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে।

ততদিনে কর্মসূত্রে বেশ কয়েক বছর নিত্য আসা-যাওয়া করে চন্দননগরকে একরকমভাবে চিনি। সেদিন ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘিঞ্জি মফস্‌সলের ভেতর তিনশো বছরের পুরোনো ফরাসডাঙার চিহ্নগুলো খুঁজে বের করতে করতে শহরটা নতুনভাবে ধরা দিল আমার চোখে। গঙ্গার ধারে প্রশস্ত পাথরবাঁধানো স্ট্র্যান্ড, তার পাশেই পরপর ফরাসি আমলের হলুদরঙা বাড়িগুলো; বেশিরভাগের খোলনলচে বদলে গিয়েছে, বারোক ও নিওক্ল্যাসিকাল শৈলীর প্রমোদভবনগুলোয় গড়ে উঠেছে থানা আদালত ইস্কুল কলেজ। তুলোর এজেন্টদের পানশালা হয়ে গিয়েছে সরকারি কলেজের স্টাফরুম, দুপ্লে সাহেবের বাগানঘেরা বাড়িটিতে বসেছে মিউজিয়াম। তবে পূর্ব ফ্রান্সের ক্লুনির সন্ন্যাসিনীদের গড়া সেন্ট জোসেফস কনভেন্টটি অপরিবর্তিতই আছে, তার দায়িত্বে আছেন মালাবার উপকূলের সিস্টাররা। সেক্রেড হার্ট গীর্জায় ছায়াচ্ছন্ন প্রার্থনাকক্ষে আখরোটগন্ধী বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে দুশো বছর। ফ্রেঞ্চ ইন্সটিটিউটে কাচের ওধারে হলদে-হয়ে-আসা খবরের কাগজ, দস্তাবেজ, পাইপ, বন্দুক, টুপি, ছড়ি আর ধুলোপড়া আসবাবপত্রগুলো যেন

BanglaBook.org

জাহাজডুবির পর ভেসে আসা ইতিহাসের আবর্জনা। তবে এসবের চেয়ে ফ্রাঁসোয়াকে ঢের বেশি টেনেছিল প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে ঝিমিয়ে আসা শহরটায় রাস্তার আশেপাশে অনাদরে ছড়ানো ছিটানো উপনিবেশের চিহ্নগুলো। বড়বাজারে লা-উয়ি ফাউন্ড্রির ছাপ-মারা ১৭৮৩ সালের একটি কল খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা ; সেটি অকেজো হয়ে ছিল বহুকাল। কিন্তু দাস বেকারিতে সোয়াশো বছরের পুরোনো কয়লার আভেনটি অক্ষত ও সচল ছিল। সেই আভেনে যে ফ্রেঞ্চ লোফ তৈরি হয়, তার প্রস্তুতপ্রণালীও নাকি অবিকৃত আছে। একটুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে ফ্রাঁসোয়া জানিয়েছিল, ফ্রান্সে এইধরনের রুটি আজকাল আর দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, গ্রামের দিকে খামারবাড়িতে তৈরি হয়। ঠা ঠা রোদ্দুরের ভেতর গোরস্থানে ভগ্নপ্রায় কবরের ফলকগুলো খুঁটিয়ে পড়ে অনেক ছোটো ছোটো গল্পের টুকরো খুঁজে পেয়েছিল সে। গোরস্থানে গোরু চরছিল, গথিক সেনোটাফের ছায়ায় ঘুমিয়েছিল এক ভবঘুরে। এরপর আমরা গলা ভেজাতে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি পুরোনো পানশালায় ঢুকেছিলাম।

পানশালাটি ফরাসি আমলের। এককালে এখানে কলা থেকে তৈরি এক ধরনের স্থানীয় মদ পাওয়া যেত। সেই শিল্প হারিয়ে গিয়েছে। রাস্তার ওপারে সূর্য মোদকের দোকানে চন্দননগরের আরেকটি বিখ্যাত উদ্ভাবন টিকে রয়েছে এখনও— জলভরা তালশাঁস সন্দেশ। সেকালে এই রাস্তাটির নাম ছিল রু্য দ্য বেনারস। রাস্তার দুপাশে ছিল আম আর নারকেলের বাগানঘেরা নেগোশিঁয়া-কমিশন্যেয়াদের ভিলা প্যাটার্নের বাড়ি। সেসব আর নেই। পানশালার ভেতরেও সাবেকি মেহগিনির বার কাউন্টারটি ছাড়া পুরোনো দিনের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

শহরের সাবেকি পানাসক্তরাই কেবল আসে, হপ্তার দিনে আসে তেলিনিপাড়া জুটমিলের কর্মীরা। পানীয়ের সঙ্গে ভিজানো ছোলা আর আদার কুচি দেওয়া হয়। কাউন্টারের ওপাশে ধুতিপাঞ্জাবি-পরা ধোপদুরস্ত প্রবীণ মালিকটি মারা গেলে হয়তো বাংলা মদের ঠেক হয়ে যাবে, কিংবা অন্য কোনো সামগ্রীর দোকান।

গরমের ভরদুপুরে অবশ্য জনাকয় উঠতি ছোকরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমরা ভেতর দিকে একটা টেবিলে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে কাউন্টার ছেড়ে মালিক স্বয়ং উঠে এসে ফ্রাঁসোয়ার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন:

—ক্যেস্ কে সে ভ্যু সেয়া, মঁসিয়ে ?

অমমাবস্যা

দাস বেকারির ফ্রেঞ্চ লোফের স্বাদ ফ্রাঁসোয়ার মনে শৈশবস্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল কি ? ফ্রান্সের আল্পস পর্বতমালার নীচে ডিনিয়ে নামে একটি গ্রামে বড়ো হয়েছে সে। ছোটো ছোটো পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম্য কমিউন, চারিপাশে সবুজ উপত্যকা। এখানেই জীবনের শেষ

BanglaBook.org

বছরগুলি কাটিয়েছিলেন আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীল। মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটিতে মিউজিয়াম হয়েছে, সেখানে আছে তাঁর তিব্বতি পুঁথি থংকা জপমালা ইত্যাদির সংগ্রহ। গোটা ফ্রান্স জুড়েই কিংবদন্তীপ্রতিম আলেক্সান্দ্রা, ডিনিয়ের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকার সুবাদে ফ্রাঁসোয়ার মনে রেখাপাত করেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। সেই টানেই ওর ভারতবর্ষে আসা।

—আলেক্সান্দ্রা মারা যান ১৯৬৯ সালে, ফ্রাঁসোয়া বলেছিল। সেই বছরেই আমি জন্মাই। মারা যাবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশো এক বছর। কিন্তু আমার মনে ওঁর যে ছবিটি খোদাই হয়ে আছে সেটি এক সুন্দরী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যুবতীর।

অপেরার নায়িকা হিসেবে জীবন শুরু করেন আলেক্সান্দ্রা ডেভিড-নীল, বিয়েও করেছিলেন টিউনিশিয়ার এক ধনী রেল আধিকারিককে। কিন্তু যশ বিত্ত কিছুই এই সুন্দরী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যুবতীকে বাঁধতে পারেনি, কারণ তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল প্রাচ্য। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে যখন ভারতে এলেন, তখন তাঁর মধ্য বয়স, যৌবনের প্রখর সৌন্দর্যে এসেছে মেদুর প্রভা। বারাণসী ও কলকাতায় কিছুকাল হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করার পর চলে যান সিকিমে। সেখানেই যুবরাজ টুলকুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ভারতে আসার আগে থেকেই অবশ্য আলেক্সান্দ্রার মূল আকর্ষণ ছিল তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম। এজন্য ইংল্যান্ডে গিয়ে দীর্ঘদিন পড়াশোনাও করেছিলেন। টুলকুর সঙ্গে যখন পরিচয় হল, ততদিনে তিনি একজন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ ও ভূপর্যটক। বৌদ্ধধর্মের প্রতি এক ইউরোপীয় নারীর এই প্রবল টান দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন যুবরাজ। তিনি নিজেও একজন প্রশিক্ষিত লামা, ফোদং গোম্ফায় ধর্মশিক্ষা লাভ করেছেন, তারপর পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ডে। জ্ঞানচর্চায় পারস্পরিক আগ্রহের ভেতর দিয়ে দুজনের সখ্য নিবিড় হল। সিকিমে দীর্ঘ ছ-মাস থেকে গেলেন আলেক্সান্দ্রা।

সিদকিয়ং টুলকু তাঁর লেখা চিঠিতে আলেক্সান্দ্রাকে সম্বোধন করছেন প্রিয় ভগিনী বলে। কিন্তু আলেক্সান্দ্রার জীবনীকারদের মতে ওঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছিল।[৯] ওঁর বইতেও যেখানেই টুলকুর কথা লিখেছেন আলেক্সান্দ্রা, সেখানেই এসে পড়েছে এক মুগ্ধ আবেশ। রিঞ্চেনপঙের গোম্ফায় প্রথম দেখা হবার পর এক অপরূপ বিস্ময়ের ভেতর বাঁচার কথা লিখেছেন।

সেই বিস্ময়ের টানে দ্বিতীয়বার সিকিমে এলেন আলেক্সান্দ্রা। সিদকিয়ং টুলকু তখন সদ্য রাজা হয়েছেন, উঁচু পাহাড় আর অনড় সংস্কারে ঘেরা দেশে প্রথম পশ্চিমী শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা। রাজঅতিথি হয়ে থেকে আলেক্সান্দ্রা দেখলেন কি প্রবল উদ্যমে উদার মানবতাবাদী ধাঁচে সমাজ সংস্কার করতে নেমেছেন টুলকু, মদ্যপান নিষিদ্ধ করছেন, লেপচাদের নিজস্ব লোকধর্ম ও আদিম আচার বন্ধ করে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের চেষ্টা করছেন।

সেবার উত্তর সিকিম দিয়ে শিগাৎসে গিয়েছিলেন আলেক্সান্দ্রা। ওঁকে বিদায় জানাতে অনেকটা দূর অবধি সঙ্গে যান রাজা। কয়েকদিনের পথ। সেই যাত্রার কিছু কিছু বর্ণনা রয়েছে আলেক্সান্দ্রার লেখায়; রডোডেনড্রনের পাপড়ি-বিছানো সরু পাহাড়ি পথে

BanglaBook.org

পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যাবার কথা আছে, জনহীন লোনাক উপত্যকায় একটি সরোবরের ধারে তাঁবুতে রাত্রিযাপনের কথা আছে। চব্বিশ হাজার ফুট উঁচুতে জোংসোং পাস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গ্যাংটকে ফিরে যান টুলকু। ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের মতো পোশাক পরেছিলেন তিনি— আলেক্সান্দ্রা লিখছেন ; একটি বোল্ডারের আড়ালে হারিয়ে যাবার আগে পিছনে ফিরে টুপি খুলে নেড়ে আমায় চিৎকার করে বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো! বেশিদিন থেকো না ওখানে!

আর কখনো দেখা হয়নি। মাত্র দশ মাস রাজত্ব করার পর রহস্যজনকভাবে, সম্ভবত বিষক্রিয়ায়, মৃত্যু হয় সিদকিয়ং টুলকুর। আলেক্সান্দ্রা দুর্গম গিরিপথ পেরিয়ে তাশিলুম্ফোয় গিয়ে সাক্ষাৎ করেন নবম পাঞ্চেন লামার সঙ্গে, তারপর উত্তর সিকিমে লাচেন গ্রামের কাছে গোমচেন নামে এক গুহাবাসী সন্ন্যাসীর শিষ্যা হন।

গোমচেন ছিলেন তান্ত্রিক, লোকমুখে প্রচারিত ছিল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনি। গোমচেনের গুহার অদূরে একটি ঝুলন্ত পাথরের নীচে কাঠ আর মাটি দিয়ে মাথা গোঁজার মতো আস্তানা বানিয়ে বরফের রাজ্যে একটানা তিন বছর ধরে তন্ত্রসাধনা করেন আলেক্সান্দ্রা। এই সময়ে বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় শক্তি অর্জনের কথা লিখেছেন তাঁর বইতে। তার মধ্যে একটি ছিল ইচ্ছেমতো নিজের দেহে উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা। পূর্ণিমার রাতে বরফগলা ঝর্ণায় স্নান করে খোলা আকাশের নীচে রাতভর বিবস্ত্র হয়ে প্রার্থনার মতো কঠিন পরীক্ষাও দিতে হয়েছিল।

এদিকে বহির্জগৎ তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ইউরোপে শুরু হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ। তিব্বত সীমান্তের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে এক রহস্যময়ী ফরাসি নারীর উপস্থিতিতে সন্দিহান হয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকার, আলেক্সান্দ্রাকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু আলেক্সান্দ্রাও দমবার পাত্রী ছিলেন না ; তাঁর অভীষ্ট ছিল লাসা। ইতিমধ্যে লাচেনে থাকাকালীন ইয়ংদেন নামে এক চোদ্দ বছরের বালককে দত্তক নিয়েছেন। সেই ইয়ংদেনকে সঙ্গে নিয়ে বর্মা জাপান মোঙ্গোলিয়া কোরিয়া ও চিন হয়ে তিব্বতে পৌঁছোলেন আলেক্সান্দ্রা, লাসায় গিয়ে দেখা করলেন দলাই লামার সঙ্গে।

দীর্ঘ বারো বছর ধরে সেই যাত্রা ছিল বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় ঠাসা। সুবিশাল চিন ভূখণ্ড আড়াআড়িভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম অতিক্রম করার পথে আলেক্সান্দ্রা দেখেছেন এক প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া, দেখেছেন অবর্ণনীয় হিংসার ছবি, কখনো সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে কখনো বা স্থানীয় সামন্তরাজাকে উৎকোচ দিয়ে পার হয়েছেন ঘোর বিপদসংকুল সব অঞ্চল, পথে অসুস্থ হয়েছেন, অনাহারে কাটিয়েছেন, এমনকি চামড়ার জুতো সিদ্ধ করেও খেয়েছেন। গোবি মরুভূমি পার হবার সময় আকাশে দেখেছেন এক উড়ন্ত লামাকে, তুষারঝড়ে পথ হারিয়েছেন, শীতের মাঝামাঝি সময়ে দুর্ভেদ্য গিরিপথ পেরিয়েছেন। শেষপর্যন্ত লাসায় গিয়ে পৌঁছেছেন এক ভিখারিনীর ছদ্মবেশে: পরণে নোংরা ছেঁড়াখোঁড়া কম্বল, দেহত্বক বাদামি রঙে ঢাকা, চুলে বহুকালের জটা। লাসার নগরদ্বারে পাহারাদারেরা চিনতেই পারেনি। সেটা ছিল ডিসেম্বর, ১৯২৪। আলেক্সান্দ্রার বয়স তখন ৫৬।

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার ঝুলি আর ইয়ংদেনকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এসে আল্পসের পাদদেশে ডিনিয়ে গ্রামে থিতু হন আলেক্সান্দ্রা। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র ম্যাজিক ইত্যাদি নিয়ে কুড়িটিরও বেশি বই লিখেছেন। এরপরেও বেরিয়েছেন, চিনে গিয়েছেন জাপানি সাম্রাজ্যবাদের আমলে, সেখান থেকে দীর্ঘ পথ ঘুরে ভারতে এসেছেন। সিকিমে এবং দার্জিলিঙে এসেছেন একাধিকবার। দার্জিলিঙে এলে উইন্ডামিয়ার হোটেলে যে স্যুইটটিতে উঠতেন সেটি তাঁর নামাঙ্কিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ইয়ংদেনের মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, তবু শেষদিন পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬৯ সালে আলেক্সান্দ্রার মৃত্যুর পর তাঁর ও ইয়ংদেনের চিতাভস্ম ভারতে এনে ভাসানো হয় বারাণসীর গঙ্গায়, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তিনি।

—জানো, ডিনিয়ের প্রকৃতি অনেকটা পশ্চিম সিকিমের মতো, ফ্রাঁসোয়া বলে। ঠিক ওইরকম পাহাড় উপত্যকা আর সাবঅ্যালপাইন গাছপালা। আলেক্সান্দ্রার বাড়িটা একটা পাহাড়ের ঢালে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে আমরা নিয়ে যেতাম সেখানে। তিব্বতি সংগ্রহের মধ্যে একশো আটটা নরকরোটির একটা জপমালা ছিল, যেটা ছেলেবেলায় আমায় খুব টানত।

ছেলেবেলার সেই ডিনিয়ে গ্রামে আলেক্সান্দ্রার বাড়ি আর তাকে ঘিরে স্মৃতির টানেই কি ফ্রাঁসোয়ার ভারতে আসা? জিজ্ঞেস করি আমি। সেটা একটা কারণ তো বটেই, ফ্রাঁসোয়া জানায়, তবে তেমন কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের টানে বেরোয় না সে। এর আগে একবার লাতিন আমেরিকায় ও আরেকবার পূর্ব ইউরোপে বেশ কয়েকটি দেশে দীর্ঘ ভ্রমণ করেছে, কোনোবারেই কোনো সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

আঠেরো-উনিশ শতকের বিখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটকদের উত্তরসূরি নয় ফ্রাঁসোয়া, আলেক্সান্দ্রার মতো প্রাচ্যের আলোকসন্ধানীও নয়। ইতিমধ্যে পৃথিবীটা বদলে গিয়েছে। মানচিত্রে আর তেমন কোনো অনাবিষ্কৃত অঞ্চল নেই। উনিশশো পঞ্চাশ-ষাটের দশকের হিপিদের সেই আধ্যাত্মিক মরীচিকাও নেই আর। পায়ের তলায় সর্ষেদানা সম্বল করে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে ফ্রাঁসোয়া। কখনো সঙ্গিনী থাকে, কখনো থাকে না। ওর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। দেশে ফিরে ছোটোখাটো একটা কাজ জোটায়, তারপর যথেষ্ট টাকা জমলে ফের বেরিয়ে পড়ে। কোনোরকম ডায়েরি রাখে না ফ্রাঁসোয়া, ছবিও তোলে না। দীর্ঘ প্রবাসের পর প্রতিবার দেশে ফিরে পুরোনো জীবনছন্দে অভ্যস্ত হতে কিছুদিন লাগে। সেই সময়টায় ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে গিয়ে কাটায়।

আসলে যেসব জায়গায় যাই সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষের বেঁচে থাকার ধরন, সবকিছু এত আলাদা— ফ্রাঁসোয়া বলেছিল। একটা ঘোর-লাগা অবস্থা চলে। এটা অনেকটা জেট ল্যাগের মতো, আ জেট ল্যাগ ইন স্পেস!

গরম কিংবা বিয়ারের কারণে, কিংবা দুইয়ের মিলিত ক্রিয়ায়, ফ্রাঁসোয়ার মেজাজে একটা অলস মগ্নতা এসেছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসেছিলাম চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে।

BanglaBook.org

স্ট্র্যান্ডের বেঞ্চে পিঠ এলিয়ে বসে বহতা গঙ্গার দিকে চুপচাপ চেয়েছিল সে। বেলা পড়ে এসেছিল, তেরছা রোদ নদীর চুরচুর স্রোতের মাথায় জ্বলছিল এক ঝাঁক হিরের প্রজাপতির মতো। তার মাঝে ভেসেছিল একটি জেলে নৌকোর সিল্যুয়েট। ওপারে জলের ধারে ঘন বাবলা আর আকাশমণির বন আড়াল করেছিল জগদ্দলের ঘিঞ্জি শিল্পাঞ্চল, পরিত্যক্ত চটজলের জেটি। একটা আরণ্যক বিভ্রম তৈরি হয়েছিল।

আমি ফ্রাঁসোয়াকে বলেছিলাম সমরেশ বসু নামে এক বাঙালি লেখকের কথা, যিনি ওই জগদ্দলের শ্রমিকজীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। কাহিনির শুরুতে কোম্পানির এক বিদ্রোহী সিপাই ব্রিটিশ কলকাতা থেকে পালিয়ে রাতের অন্ধকারে নদীতে ভেসে ফরাসি চন্দননগরের দিকে আসছে মুক্তির আশায়। ফ্রাঁসোয়া বলেছিল আলেক্সান্দ্রার শেষ ইচ্ছের কথা:

—মৃত্যুর এক বছর আগে, তখন তাঁর বয়স ঠিক একশো বছর, নতুন করে পাসপোর্টের জন্য ফরাসি সরকারের কাছে আবেদন করেন। তিব্বতে যেতে চেয়েছিলেন।

নদীর ওপারে সবুজ মরীচিকার দিকে তাকিয়ে বুঁদ হয়েছিল ফ্রাঁসোয়া। আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিলাম ডিনিয়েতে আলেক্সান্দ্রার সেই বাড়ি, যার জানলা দিয়ে পশ্চিম সিকিমের মতো প্রকৃতি দেখা যেত। কখনো স্মৃতির কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখা যেত এক রাজপুরুষকে: তাঁর কমলা জরিবসানো পোশাক, মুকুটে হিরের নক্ষত্র, ছোট্ট ঘোড়ায় আসীন। পিছনে সারিবদ্ধ অনুচরেরা রামধনুর রঙে সজ্জিত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আরশিনগরের পানশালা

সিমলায় অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে সেই রিফ্রেশার কোর্সে একটি করে প্রোজেক্ট করতে হয়েছিল। এজন্য আমাদের ছোটো ছোটো কয়েকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমি ও রমেশ চৌহান নামে হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক শিক্ষক সিমলার বাজারের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম। সিমলায় রমেশদের তিন পুরুষের বাস, পারিবারিক সূত্রে ব্যবসায়ীমহলে চেনাপরিচয় ছিল। আমরা আপার, মিডল আর লোয়ার বাজারে পুরোনো কিছু দোকান বেছে নিয়ে মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারভিত্তিক সমীক্ষা করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। বেশ কিছু দোকানের সাইনবোর্ডে স্থাপনের যে সালটি লেখা ছিল, খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেটি লাহোর কিংবা করাচিতে আদি দোকানের জন্মসাল। দেশভাগের সময় সেই দোকান তুলে দিয়ে সিমলায় এসে নতুন দোকান দিয়েছেন ছিন্নমূল ব্যবসায়ী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোকানের পণ্যসামগ্রীও বদলে গিয়েছে, কিন্তু নাম এবং স্থাপনের সালটি একই রয়ে গিয়েছে।

ম্যাল রোডে নাথুরাম অ্যান্ড সনস-এর মালিক রাজ মেহরা দেখালেন লাহোরে ইছরা বাজারে তাঁদের সেই দোকানের একটি বিবর্ণ সাদাকালো ফোটোগ্রাফ। পথের ধারে ক্যানভাসের ছাউনি-তোলা সেই থানকাপড়ের গুমটি দোকান বর্তমানে বহুজাতিক ব্র্যান্ডের পোশাকের ঝাঁ-চকচকে শোরুম, শুধু সাইনবোর্ডে স্থাপনের সাল ১৯০৮ অপরিবর্তিতই আছে। ইছরা বাজারে দোকানটি খুলেছিলেন রাজের দাদু নাথুরাম মেহরা। ওঁর বাবা রোশনলাল ফিবছর গ্রীষ্মকালে খচ্চরের পিঠে কাপড়ের গাঁট চাপিয়ে সিমলায় ব্যবসা করতে আসতেন। স্ক্যান্ডাল পয়েন্টের কাছে একটি বিশাল এগজিবিশান হল-এ (এখন যেখানে জিডি খান্নার গৃহসামগ্রীর দোকান) স্টল ভাড়া নিতেন। এখনকার এই দোকানটির জায়গায় বসতেন এক মুসলমান বিক্রেতা। দেশভাগের সময় তিনি দোকানটি ছেড়ে চলে গেলে উঠে আসেন রোশনলাল। এভাবেই ইতিহাসের এক গভীর ছেদকে উপেক্ষা করে বয়ে চলে এক ধারাবাহিকতার বোধ, সিমলার ম্যাল রোডে লোয়ার বাজারে সাইনবোর্ডে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে হারিয়ে যাওয়া লাহোর, করাচি, সিন্ধ, এমনকি কলকাতাও।

সেই প্রোজেক্টের জন্য ঘুরতে ঘুরতে এভাবেই সিমলা শহরটা, বিশেষত তার বাজার এলাকা, পরতে পরতে খুলে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে। এভাবেই রিভোলি রোডে

BanglaBook.org

আবিষ্কার করেছিলাম এক তিব্বতি জনগোষ্ঠী, ১৯৫৯ সালে চিনা আক্রমণে শরণার্থী হয়ে আসার পঞ্চাশ বছর পরেও আর্ত মুঠিতে আঁকড়ে রয়েছে ছিন্নমূল আত্মপরিচয় ; জামা মসজিদের চারপাশে দেখেছিলাম কাশ্মিরী কুলিদের, জীর্ণ ধূসর ভ্যান গখের মডেল যেন, তিনটি শতাব্দী ধরে চলেছে যাদের আসা ; ভারতে টিকে-থাকা ফোটোগ্রাফিক স্টুডিয়োগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বিন্দ্রাস স্টুডিয়োয় (যা কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে) দেখেছিলাম এক অমূল্য পোর্ট্রেটের আর্কাইভ। ম্যল রোড থেকে রিজ হয়ে লক্কড় বাজার, লাদাখি মহল্লা থেকে লোয়ার মিডল আপার বাজারের পিরামিড ছেয়ে সর্পিল গলি আর সিঁড়ির জাল ক্রমশ একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমায়, যতদিন না মারিয়া ব্রাদার্সের শেলফে একটি নীল বাঁধানো নথি মারাত্মক মাদকের মতো ঘায়েল করল।

তবে সামারহিলে যে অতিথিশালায় ছিলাম, সেখানে যে-কোনো ধরনের নেশার দ্রব্য ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভোজনও ছিল বিশুদ্ধ শাকাহারী। আর এই দুটি কারণে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল আমাদের এক গারো সতীর্থ টি পি মারাকের। নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিল সে। রিজের ধারে একটি বার ছিল বটে, কিন্তু সেখানে সারাক্ষণ টুরিস্টের ভিড় লেগে থাকত। তাছাড়া পাঞ্জাবি মশলা দেওয়া আমিষ খাবারে রুচি ছিল না মারাকের। এক সন্ধ্যায় লোয়ার বাজার দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ফেরার সময় সরু গলির বাঁকে চকিতে দেখেছিলাম একটি বাড়ির লাগোয়া পর্দা-ঢাকা ছোট্ট ছিমছাম পানশালা ; সয়া সস আর বাঁশের কোঁড়ের গন্ধ নাকে এসেছিল একঝলক। একদিন ক্লাসের শেষে মারাককে নিয়ে গেলাম সেই ঘরোয়া দোকানটির সন্ধানে।

ততদিনে প্রোজেক্টের সুবাদে সিমলার বাজার এলাকাটা বেশ ভালোই চেনা হয়ে গিয়েছে আমার। ম্যল রোডে দোকানের সারির ফাঁক দিয়ে যে সরু খাড়া সিঁড়িগুলো নেমে গিয়েছে নীচের দিকে, সেগুলো মিডল বাজারের আনুভূমিক পথে মিশে বইখাতার দোকান, কিউরিও আর মিঠাইয়ের দোকান, রেপন শপ আর সেলাইগুমটির পাশ দিয়ে ঘুরে আবার এক প্রস্থ উল্লম্ব গলিতে আর সিঁড়িতে বিভক্ত হয়ে লোয়ার বাজারের ঘিঞ্জি, গায়ে গায়ে হুমড়ি-খাওয়া বাড়িঘরের ঢল চিরে গিয়ে পড়েছে নীচের কার্ট রোডে। ওখানেই একটা গলির বাঁকে সেই পানশালাটি দেখেছিলাম। কিন্তু সেদিন আমি ও মারাক দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই গোলকধাঁধার ভেতর ঘোরাঘুরি করেও সেটি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ক্রমশই সন্দিহান হয়ে পড়ছিল মারাক। আমি কিন্তু ঠিকই দেখেছি: ফিকে বেগনি রঙের দেয়াল, আলোকিত শার্সিতে সাজানো ছিল চিনা সুপের বাটি আর বিয়ারের বোতল, এক দশাসই মোঙ্গোলয়েড মহিলা কাউন্টারে বসেছিল।

ক্রমশ সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে আসছিল, গলির ভেতর তস্য গলির পেটে সেঁধিয়ে যেতে যেতে ঝাপসা অলীক হয়ে আসছিল সেই বেগনি পানশালা, আমরা ঢুকে পড়েছিলাম একশো বছর আগে কিপলিঙের সেই লাইনটির ভেতর— দ্য ক্রাউডেড র‍্যাবিট ওয়ারেন দ্যাট ক্লাইমস আপ ফ্রম দা ভ্যালি টু দা টাউন হল অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গল

BanglaBook.org

অব ফর্টিফাইভ ; আ ম্যান হু নোজ হিজ ওয়ে দেয়ার ক্যান ডিফাই অল দ্য পোলিস...

কিপলিঙের আমলের বাড়ি দেখলাম বেশ কয়েকটি: নীচের তলায় জানলাবিহীন খোঁয়াড়ের মতো ঘরে সারি সারি খাটিয়া পাতা, পাথরের দেয়ালে ঝুলছে কুলিদের মাল বওয়ার দড়িদড়া, ওপরে কাঠের কারুকার্যময় ঝুলবারান্দায় এক গা রুপোর গয়নাপরা এক লাদাখি বৃদ্ধা লম্বা কাঠের পাইপে ধূমপান করছে। মলিন বাল্ব-জ্বলা মুদির দোকানে ক্রেতারা বেচাকেনা থামিয়ে ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে, হল্লা জুড়ে দিল রোমশ গলির কুকুর, আঁধার সিঁড়ির নীচে পৌর কলে জেরিক্যানে জল ভরছে একসার মানুষ, বাতাসে কর্কশ রেডিয়োর শব্দ, সেঁকা রুটি আর কসুরি মেথির গন্ধ। সয়াসস কিংবা বাঁশের কোঁড়ের গন্ধ নেই কোথাও। মোঙ্গোলয়েড চেহারার মানুষও নজরে পড়ে না। পুরুষেরা সকলেই কুমায়ুন বা গাড়োয়ালের— তাদের উঁচু চিবুক আর ঘন ভুরুর ছায়ায় সন্দিগ্ধ চোখগুলো অনুসরণ করে দুই আগন্তুককে।

কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি ওদের। পায়রার পালক আর বিষ্ঠায় ছাওয়া এক চিলতে চবুতরা পেরিয়ে দুটো উঁচু কাটরার মাঝে সরু ফাঁক গলে এসে পড়লাম বাস স্ট্যান্ডের কাছে।

ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাস শুনশান, এক ধারে ভাঙা প্যাকিংবাক্সের কাঠের আগুন ঘিরে জনাকয় কুলির সিল্যুয়েট। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটি শার্টল বাস, ভেতরটা আলোকিত, জানলায় ঝিমোচ্ছে কাজ-ফিরতি ক্লান্ত মানুষ। বাইরে দাঁড়িয়ে কন্ডাক্টর হাঁকছে:

—বালুগঞ্জ টুটু জাতোগ! লাস্ট ট্রিপ!

আচমকা থাপ্পড়ের মতো আমার মনে পড়ে যায়— এই পানশালাটি ছিল দার্জিলিঙে, জজবাজারের ওপরে একটি সিঁড়ির বাঁকে। এক মোটাসোটা তিব্বতি মহিলা চালাতেন, পাশেই ঘরোয়া রান্নাঘরের ফোকর দিয়ে খাবার আসত, কাচের জানলায় সাজানো থাকত শৌখিন চিনেমাটির পাত্র, বিয়ারের বোতল, লাফিং বুদ্ধ।

স্মৃতিবিভ্রমের খেসারত দিতে হয়েছিল সেদিন। মারাককে নিয়ে গিয়েছিলাম একটি দামি হোটেলের রেস্তোরাঁয়। সেখানে নরম আলো, মৃদু লিওনার্ড কোহেন, উষ্ণ চেরিলাল টেবিলঢাকা, পশমিনা আর শিফনের ফাঁকে গজদন্ত বাহু, নিঃশুল্ক সুগন্ধ, পোর্সেলিনে ছুরিচামচের চাপা ধ্বনির মতো সুশ্রাব্য ইংরেজি— লোয়ার বাজার থেকে দেড়শো ফুট ওপরে অন্য এক পৃথিবী।

সত্যজিৎ রায়ের *শতরঞ্জ কে খিলাড়ি* দেখেনি মারাক। ওকে বলেছিলাম দুই দাবাড়ুর গল্প। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, অযোধ্যার নবাবকে গদিচ্যুত করার তোড়জোড় শুরু করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। লখনউয়ের বাতাসে বারুদের গন্ধ, এদিকে বাড়িতেও ঘরোয়া অশান্তি। নিরিবিলির খোঁজে দুই বন্ধু মির্জা সাজ্জাদ আলি আর মীর রোশন আলি দাবার ছক-ঘুঁটি বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়েছে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের ধারে এক প্রাচীন নিরালা মসজিদের হদিশ জানে রোশন আলি। ওরা চলেছে সেখানে।

BanglaBook.org

কিন্তু গোমতি নদী পেরিয়ে সেই গ্রামে গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেও সেটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমন কোনো পুরোনো মসজিদ ওই অঞ্চলে নেই, জানায় গ্রামের এক বালক। আর তখনই মনে পড়ে যায় মীর সাহেবের— সেই মসজিদটি তিনি দেখেছিলেন কানপুরে, ছেলেবেলায়!

এক শহরের ভেতর স্মৃতির মরীচিকা হয়ে ভেসে থাকে অন্য এক শহর, একটি সময়কালের মধ্যে অন্য সময়কালের রেশ যেমন, এক স্থানের ভেতরে ভিন্ন এক স্থান, বার বার লেখা আর মুছে ফেলা পাণ্ডুলিপির মতো, প্যালিম্পসেস্টের মতো, ফুটে থাকে, অপেক্ষা করে এবং হানা দেয় অতর্কিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পনেরো

গিম্‌মি দ্য ওয়াটারফল !

দার্জিলিঙে ফেরার পর সরকারিভাবে কিন্টুপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হতে সময় লেগেছিল আরও চার বছর। এই কাজটা করেছিল লামা উগেন গ্যাৎসো। কিন্তু সেই অভিযানের আসল চাবিকাঠি (বলা উচিত ৫০০টি চাবিকাঠি) হারিয়ে গিয়েছিল, সবার অগোচরে ভেসে গিয়েছিল দিহাং তথা ব্রহ্মপুত্রের উজানে। কিন্টুপের বয়ানের সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না। সার্ভে অফিসের মহাফেজখানায় ঠাঁই হয় সেই রিপোর্টের, ধুলো জমতে থাকে। ইতিমধ্যে তিরিশ বছর কেটে গেছে। কিন্টুপ বৃদ্ধ হয়েছে। চকবাজারে দর্জি গলিতে এখনও সেলাইয়ের কাজ করে সে। দার্জিলিং শহরটাও বড়ো আর ছড়ানো হয়েছে, নতুন নতুন বাংলো আর কটেজ তৈরি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে, বিজলি বাতি এসেছে, তৈরি হয়েছে রিঙ্ক থিয়েটার, ক্লাব, রেসকোর্স। বছরে ছমাস শহর গমগম করে সমতলের দাবদাহ থেকে পালিয়ে আসা সাহেব-মেমে, দেওদার-পাইনের ছায়ার জাজিম বিছানো পাকদণ্ডী পথে দিনভর বেজে চলে টানা রিকশার ঘণ্টাধ্বনি। মহারানি ভিক্টোরিয়ার যুগ শেষ হয়েছে, ব্রিটিশ সমাজে অতিশালীনতার ফাঁস আলগা হয়ে বইছে নতুন যুগের হাওয়া। এমনকি মেমসাহেবদের পোশাকেও এসেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া, বিশেষত সাইকেল জনপ্রিয় হবার পর। দার্জিলিঙের দর্জিপাড়ায় এসেছে সেলাই মেশিন, হালের ফ্যাশান। পুরোনো বয়স্ক দর্জিরা কাজ হারাচ্ছে। ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছেঁড়া ফাটা জামাকাপড়ে রিফুর ফোঁড় তুলে তুলে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে কিন্টুপের। এর ফলে অবশ্য নতুন একটা কাজ জুটেছে তার। মেমসাহেবদের পোশাকের মাপ নিতে সাহেব বাংলোয় ডাক পড়ে আজকাল, আবছায়া ঘরে হ্রস্ব অন্তর্বাসে ঢাকা বুক আর কোমরের নিখুঁত মাপ নেয় সে। নিরক্ষর হলে কি হয়, বৃদ্ধ বয়সেও কিন্টুপের সেই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি অটুট রয়েছে। মাপ নেবার সময় ফিতের ওপর আঙুলের নিশানা দেখে মেমসাহেবরা নিজেরাই সংখ্যা বলে দেয়, আর কিন্টুপ সেগুলি মাথায় নিয়ে ফিরে আসে ওস্তাদ কারিগরের কাছে, যেভাবে সে তিরিশ বছর আগে ফিরে এসেছিল এক দুর্গম নদীপথের মানচিত্র নিয়ে।

দুপুরের পর নির্জন হয়ে আসে দর্জিপাড়া। শহরটা ঝিমিয়ে আসে, অপেক্ষা করে শিলিগুড়ি-ফেরৎ আপ ট্রেনের জন্য। ক্লকটাওয়ারে টং টং করে তিনটে বাজে। গলির ভেতর বিরামহীন সেলাই মেশিনের ঝিরিঝিরি ধ্বনি শুনতে শুনতে কিন্টুপের হাতের

BanglaBook.org

ছুঁচ থেমে যায়, ববিন-চাকা ঘূর্ণনের যান্ত্রিক শব্দ দূরাগত ঝর্ণার ধ্বনি হয়ে কানে বাজে। সেই ঝর্ণা, যা গহীন পাহাড়ের গা চিরে ঝরছে অনেক নীচে শব্দহীন খাদে, ধোঁয়ার মতো জলকণা উঠছে অবিরাম, আর তার ওপর আড়াআড়ি একটি উজ্জ্বল নিটোল রামধনুতে অসংখ্য ছোটো ছোটো পাখি হারিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। চটকা ভেঙে জেগে উঠলে মনে হয় বিগত জন্মের স্মৃতি।

এমনই এক আচ্ছন্ন দুপুরে ভারি বুটের মচমচ শব্দে সচকিত হয়ে উঠল দর্জিপাড়ার গলি। পরনে জলপাই উর্দি, গলায় নীল রেশমি স্কার্ফ, তরুণ ফৌজি অফিসারকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে দেয় সবাই, সেলাম ঠোকে কেউ কেউ। কোনোদিকে না তাকিয়ে সাহেব সটান হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় কিন্টুপের গুমটির সামনে। কিন্টুপ উঠে দাঁড়িয়ে ছুঁচে সুতো পরানোর মতো চোখ সরু করে তাকায়, মুখের বলিরেখা অস্পষ্ট গভীর হয়ে ওঠে। সাহেবের ঠান্ডা নীল চোখ, কোমরে রাখা হাত, বেল্টে রিভলভার। রুক্ষ গলায় বলে—

—কিন্টুপ ! ইউ চিট ! গিম্‌মি দ্য বিগ ওয়াটারফল !

ভয়ে কুঁকড়ে যায় কিন্টুপ, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইতিমধ্যে সাহেবের পেছনে ছোটোখাটো ভিড় জমে গিয়েছে, সেলাইমেশিনগুলো থেমে গিয়ে একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য নেমেছে গলির ভেতর।

—আহ্যাভ ফাউন্ড দ্য রেইনবো, বাট নট দ্য বিগ বিগ ওয়াটারফল ! হোয়্যার ডিড ইউ হাইড ইট ?

ইদানীং সাহেব বাংলোয় যাতায়াতের সুবাদে কিছুটা ইংরেজি রপ্ত হয়েছে কিন্টুপের। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলে,

—আই... সাহিব... নো ওয়াটারফল... আই পুয়োর টেলার, সাহিব...

অফিসারের পুরু গোঁফের নীচে একটি রহস্যময় কৌতুক প্রজাপতির মতো ফরফর করে কয়েক মুহূর্ত, তারপর সেটি ফেটে পড়ে সারা মুখে। উচ্চকিত হেসে উঠে আচমকা কিন্টুপকে তার পেশল বুকে টেনে নেয় সাহেব, ওর মুহ্যমান কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠে,

—সাংপো ইজ ডিহাং ! কিন্টুপ, ইউ হ্যাভ বিন রাইট ! সাংপো ইজ ডিহাং !

ঠিক কী ঘটছে কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু সাহেবকে আলিঙ্গন করতে দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে সকলে।

হাততালিতে যোগ দেয় সাহেব নিজেও। নিজের গলার নীল স্কার্ফটি খুলে খাদার মতো করে কিন্টুপের গলায় পরিয়ে দেয় কর্নেল ফ্রেডরিক মার্শম্যান বেইলি।

কিন্টুপকে সকলেই ভুলে গিয়েছিল, তার আশ্চর্য অভিযানের রিপোর্টও চাপা পড়েছিল সরকারি নথিপত্রের স্তূপে। কিন্তু সেই রিপোর্টে একটি উল্লেখ গুটি-ছেঁড়া রঙিন প্রজাপতির মতো উড়তে শুরু করে সার্ভে দপ্তরের অলিন্দ ছেড়ে বিভিন্ন মহলে। পেমাকো

BanglaBook.org

উপত্যকায় সাংপোর ওপর এক অতিকায় জলপ্রপাতের কথা বলেছিল কিন্টুপ, যার গায়ে উজ্জ্বল সূর্যালোকিত দিনে একটি রামধনু ফুটে থাকে, জলের পর্দার ওপারে দেখা যায় পাথরের গায়ে খোদাই করা বোধিসত্ত্বের মূর্তি। বস্তুত তেমন এক বা একাধিক জলপ্রপাতের জল্পনা ভূগোলবিদদের মধ্যে ছিলই। নতুবা ন-হাজার ফুট উচ্চতা থেকে একটি নদীর মাত্র দুশো মাইলের ভেতর সমতলে নেমে আসার অঙ্ক কিছুতেই মেলানো যায় না। কিন্টুপের রিপোর্ট সেই জল্পনায় দানা বেঁধে তুলল।

ততদিনে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দুর্গমতম অঞ্চলের রহস্য, দীর্ঘতম ঝর্ণা পাহাড় নদী ও গিরিখাত পশ্চিমের চোখে 'আবিষ্কার' হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের দাবি মোতাবেক স্বেন হেদিনরা হয়ে উঠেছে আক্রান্ত প্রজাতি। মাউন্ট এভারেস্টের মতো দুচারটি দুরূহ বিজয় বাকি রয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুর্গম অনাবিষ্কৃত সাংপো গিরিখাতে আরেকটি নায়াগ্রা কিংবা ভিক্টোরিয়ার মতো জলপ্রপাত আবিষ্কারের স্বপ্ন হাতছানি দিচ্ছিল অভিযাত্রীদের। কিন্টুপের সেই আশ্চর্য রঙিন প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছিল তাদের মাথার ভেতরে। ফ্রেডরিক মার্শম্যান ওরফে এরিক বেইলি ছিল তেমনই একজন।

সাংপো উপত্যকায় অভিযান সেরে কিন্টুপ যেবছর দার্জিলিঙ ফিরল, সেই ১৮৮২ সালে লাহোরে আর্মির এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে এরিক বেইলির জন্ম। ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যোগ দিল বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এ। কিছুকাল সিকিমে থাকাকালীন তিব্বতি ভাষা শিখেছিল, সেই সুবাদে ইয়ংহাজব্যান্ডের তিব্বত অভিযানে সামিল হল।

বেইলির বয়স তখন একুশ বছর। ভাষা ছাড়াও গাছপালা, বন্যপ্রাণী এবং বিশেষত প্রজাপতিতে গভীর আগ্রহ রয়েছে। সেটি দলনেতার নজর এড়ায়নি। লাসা দখলের পর পশ্চিম তিব্বতে ভৌগোলিক অনুসন্ধানে অফিসারদের দলে বেইলিকে পাঠালেন ইয়ংহাজব্যান্ড। এইসময় সাংপো-দিহাঙের রহস্য উন্মোচনের একটা পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু ওপরমহল থেকে অনুমতি না আসায় বাতিল হয়ে যায়।

বিশ্বের প্রাচীনতম গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাংপোই যে ভারতবর্ষে ঢুকে দিহাং তথা ব্রহ্মপুত্র হয়েছে, এব্যাপারে একটা সহমত ততদিনে তৈরি হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নদীপথ, বিশেষত গিরিখাতে বয়ে চলা অংশটি, সরেজমিনে জরিপ করার সুযোগ ঘটেনি। ওখানেই রয়েছে চিররহস্যে ঘেরা উপত্যকা বেয়ুল পেমাকো, যা পরবর্তীকালে জন্ম দেবে শাংগ্রিলার কল্পনা। আর রয়েছে এক জলপ্রপাত, যার গায়ে সারাদিন একটি রামধনু ফুটে থাকে। সেই জলপ্রপাতের উল্লেখ কিন্টুপ ওরফে KP-র রিপোর্টে ছিল। যদিও এক নিরক্ষর গুপ্তচরের আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্ত কেউই সেভাবে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু জলপ্রপাতটি ভূবিদ্যার নিয়মেই প্রামাণিক হয়ে ওঠে: ন-হাজার ফুটের মালভূমিতে বয়ে-চলা বিশ্বের সর্বোচ্চ নদীকে মাত্র দুশো মাইলের ভেতর সমতলে নেমে আসতে গেলে ওইরকম জলপ্রপাত থাকতেই হবে। পেমাকো উপত্যকা ছেড়ে সাংপো যেখানে প্রায় অগম্য খাতে হারিয়ে যাচ্ছে, ততদূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিল কিন্টুপ।

BanglaBook.org

হয়তো তারপরেও একাধিক প্রপাত আছে, ভাবা হয়েছিল, গগনচুম্বী গিরিচূড়ার মধ্যবর্তী খাতের জঠরে অপেক্ষা করে আছে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর চোখে 'আবিষ্কৃত' হবার জন্য।

কিন্টুপের রিপোর্ট নিশিডাকের মতো তরুণ বেইলিকে সেনাবাহিনীর থেকে টেনে আনল রাজনৈতিক বিভাগে, পলিটিকাল অফিসার হয়ে তিব্বত সীমান্তে বদলি হয়ে এল সে। সেখানে ঘন অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়ে লড়াকু অবোর জনজাতির বাস, তাদের বশে এনে ওই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করার জন্য সেনা অভিযান চলছে। দক্ষিণপূর্ব হিমালয়ে বহুকাল ধরেই দলাই লামার সরকারের একটা আলগা নিয়ন্ত্রণ ছিল, এদিকে লাসার শাসনব্যবস্থার রাশ থাকত চিনের সম্রাটের হাতে। তখন সদ্য মিং সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, গোটা চিন জুড়ে চলেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। পাহাড়ি নদীর ওপর দিকে ভারি বৃষ্টিপাত হলে যেমন হড়কা বান নামে নীচের দিকে, তেমনই সেই অস্থিরতার ঢেউ এসে পড়েছে এই সীমান্ত এলাকাতেও। এমত পরিস্থিতিতে বেইলি সাংপো নদের রহস্য সন্ধানে অভিযানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করলে তা নামঞ্জুর হয়ে যায়।

কিন্তু ততদিনে এই যুবকের ধমনিতে লেগেছে পৃথিবীর শেষ রহস্যময় নদীর স্রোতোস্বান ছোঁয়া, কানে বেজে চলেছে এক জলপ্রপাতের ধ্বনি, যার গায়ে সারাটা দিন ফুটে থাকে এক নিটোল রামধনু, জলের পর্দার ওপারে জাগরূক বোধিসত্ত্ব, যাঁর দর্শন পেতে কঠিন গিরিবর্ত্ম পরিক্রমা করে আসে তীর্থযাত্রীরা। বিপদসংকুল পথে বেঘোরে মারাও যায় অনেকে। ওপরমহলের অনুমোদন ছাড়াই সেই পথে বেরিয়ে পড়ল এরিক বেইলি। সঙ্গী ক্যাপ্টেন হেনরি মোর্সহেড, সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসার। দিনটা ছিল ১৬ মে, ১৯১৩।

BanglaBook.org

ষোলো

কিন্টুপের পথ

দিহাং নদীর অববাহিকায় মিপি নামের একটি গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে বেইলিরা। তিব্বতিদের বাস মিপিতে, বেশ কিছু বছর আগে স্থানীয় মিশমিদের হঠিয়ে ওখানে থাকতে শুরু করে ওরা। ওদের কাছ থেকেই পথের সন্ধান পাওয়া গেল, অনেক কষ্টে গাইড আর দশজন কুলির ব্যবস্থাও হল। তিব্বতের মালভূমি ধরে নদীর উৎসের দিকে যতদূর সম্ভব যাবার পরিকল্পনা হয়েছিল, রসদ নেওয়া হয়েছিল মাস ছয়েকের মতো।

অববাহিকা ছেড়ে পথ উঠে গিয়েছে দু-দুটি কঠিন গিরিপথ পেরিয়ে, শীতকালে যা বরফে ঢাকা থাকে। বের হবার আগে গ্রামের পুরোহিত গণনা করে নির্মল আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল। কিন্তু কঠিন চড়াই বেয়ে কিছুটা যাবার পরেই শুরু হল প্রবল বৃষ্টি।

—ওপরের দিকে তুষারপাত হবে, গাইড গম্ভীর মুখে জানায়।

হলও তাই! তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় ইয়ংগ্যাপ-লা পাস কোমর পর্যন্ত গভীর বরফে ঢাকা। এদিকে ঘন মেঘের দেশে উঠে গাইড বেচারা পথ হারাল। কোনোক্রমে সেই পাস পার হতে উলটোদিকে প্রাণান্তকর উৎরাই বেয়ে নামা, শক্ত বরফে ফাটলে মরণফাঁদ, চারিদিকে হুড়মুড়িয়ে নামছে তুষারের প্রপাত। এভাবেই দিহাং ছেড়ে পৌঁছনো গেল সাংপোর অববাহিকায়। এর মধ্যে আবার পাঁচ কুলি তুষারে রোদের ঝলকানিতে সাময়িক দৃষ্টিশক্তি হারাল, দুদিন অপেক্ষা করতে হল ওদের জন্য।

ঘন ফার আর জুনিপারের জঙ্গল, বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য ফেজেন্ট রসদ বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। আমরা তিনটি প্রজাতি শিকার করতাম— বেইলি লিখছেন। এদের মধ্যে টকটকে লাল ব্লাড ফেজেন্টগুলো ছিল খুব সাহসী, মানুষ দেখলেও ভয় পেত না। এছাড়া জঙ্গলে মোনাল আর বর্ণময় ট্রাগোপান ছিল। আর ছিল টাকিন নামে এক বিশেষ প্রজাতির পাহাড়ি ছাগল।

যাত্রাপথে দ্বিতীয় পাসটির নাম পুংপুং-লা, চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায়। একটানা বৃষ্টি আর নরম বরফের ভেতর দিয়ে সেটি পার হতে বারো ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর একটি ছোটো লেক, হিমবাহ-গর্জিত গভীর ছায়াচ্ছন্ন খাত, সেটি পেরিয়ে হাজার তিনেক ফুট নেমে এসে তুষার রেখার ওপরে তাঁবু ফেলা হল।

পরদিন তীর্থযাত্রীদের একটি পথের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল। কিছুদূর চলার পর তিনটি মৃতদেহ গোচরে এল। একটি ঝুলন্ত পাথরের নীচে বসে থাকার ভঙ্গিতে বেশ পুরোনো দেহগুলো প্রায় অবিকৃত, শুকনো মমির মতো; গা থেকে পোশাক পচে খুলে

BanglaBook.org

গিয়েছে, প্রসারিত হাতের নীচে পড়ে আছে জপমালার পুঁতি, পাথরে আগুনের কালো দাগ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অপেক্ষা করতে করতে জমে বরফ হয়ে মারা গিয়েছে বলে মনে হয়।

চিমদ্রো নদীর উপত্যকায় সাড়ে ছ হাজার ফুটে অনেকগুলো ছোটো ছোটো বসতি, যব ও ভুট্টার খেত ; একজন জংপন ও কুলপতির অধীনস্থ এলাকা। ওপরদিকটায় ঘন বন। আগাম খবর না দিয়ে গিয়ে পড়ায় একপ্রকার নিমরাজি হয়েই রেশন ও কুলি যোগাতে সম্মত হয় জংপন। এই ধরনের পাহাড়ি অভিযানে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে কুলি বেছে নেওয়াটাই রীতি। এক জনপদ থেকে পরের জনপদ পর্যন্ত যায় ওরা। তিব্বতের অচেনা অঞ্চলে কুলিরাই ছাড়পত্রের কাজ করে, পথে খাবারদাবার সংগ্রহ করতেও সাহায্য করে।

৩ জুন। চিমদ্রোয় দুদিন কাটিয়ে শুরু হল নীচের দিকে নামা। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, কোনো কোনো জায়গায় খাড়া পাথরের গায়ে বাঁশের মই বেঁধে পথ করা হয়েছে। কাপু নামের একটি বসতিতে এসে পৌঁছতে তিন দিন লেগে গেল। এখান থেকে সাংপো উপত্যকার বিস্তার দেখা যায়। সেই প্রথম দর্শনের অভিঘাত বেশ নাটকীয়: ঘন পাহাড়ের ভাঁজ বরাবর নদী ছুটেছে খরস্রোতা, কিছুদূর অন্তর পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেনা হয়ে ভাঙছে। হাজার খানেক ফুট ওপরে জঙ্গলের মাঝে টানা রেখা, কাঁধের মতো জমিতে ছোটো ছোটো বসতি, চাষ হয়েছে।

নদীর পাড়ে নেমে গিয়ে হিপসোমেট্রিকাল পরিমাপ নিল মোর্সহেড। জায়গাটা গড় সমুদ্রতল থেকে ২৬১০ ফুট উঁচুতে। এখান থেকে সাংপোর দুর্ভেদ্য গিরিখাতের মাঝে আর কোথাও নদীতলের উচ্চতা মাপের সুযোগ পাওয়া যাবে না।

চিমদ্রোয় ছিল পোবা আর খাম্বা জনজাতির বাস। ওদের ঘরগুলো মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি আর পাথরে তৈরি, ঘরের চালগুলোও কাঠের। কাপুর বাসিন্দারা প্রায় সকলেই মোনপা, একশো বছর আগে তাওয়াং প্রদেশ থেকে এসেছে। এরা বুদ্ধের উপাসক, তিব্বতি কায়দায় পোশাক পরে, কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ঘর বানায় উঁচু মাচার ওপর। এখান থেকে চার দিনের হাঁটা পথে রিঞ্চেনপং নামে একটি মঠ, সাংপো থেকে চার হাজার ফুট ওপরে জঙ্গলের মাঝে ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ের খাঁজে। তিরিশ বছর আগে এই মঠে এসেছিল কিন্টুপ।

৩ মামাগ্রহ

দার্জিলিঙের এক সামান্য দর্জি সাংপোর খাত ধরে যে পথ দিয়ে এসেছিল, তিরিশ বছর পরে সেই পথের চিহ্ন ধরে যাত্রায় ক্যাপ্টেন এরিক বেইলির মনে ছেয়েছিল বিশ্বের দুর্গমতম গিরিখাতের জঠরে অজানা জলপ্রপাত আবিষ্কারের উত্তেজনা। কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ভূপ্রকৃতির ওপর দিয়ে একটি অদৃশ্য রেখা টেনে চলেছিল ওরা, পরবর্তীকালে যেটি হয়ে উঠবে ম্যাকমাহন লাইন। বেইলি ফিরে আসার কিছুকালের

BanglaBook.org

মধ্যেই বিদেশ সচিব স্যার হেনরি ম্যাকমাহনের নেতৃত্বে সিমলায় তিব্বত, চিন ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে বেইলি ও মোর্সহেডের করা জরিপের ওপর ভিত্তি করে আঁকা হবে ভারত-তিব্বত সীমান্তরেখা।

ওই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাক পড়বে কিন্টুপের। এজন্য তাকে খুঁজে বের করা হবে দার্জিলিঙের বাজারে দর্জিগলি থেকে, বেইলির উদ্যোগেই। তিরিশ বছরের বিস্মৃতির কুয়াশা ঠেলে আরেকবার দুজনে একসঙ্গে যাত্রা করবে সেই পথে, সিমলায় ভাইসরিগ্যাল লজের অতিথিশালায় মুখোমুখি বসে। ফিরে আসার পর কিন্টুপের জবানবন্দি লামা উগেনের হাতে অনুলিখিত হয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ হবার সময় পথের যে চিহ্নগুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল, যে সূর্যাস্তের রং অচেনা পাখির ডাক গুহার ভেতর দূরাগত ঝর্ণার ধ্বনির কথা লেখা হয়নি, সেগুলো ফিরে আসবে সেই বিচিত্র মানসযাত্রায়। সাংপোর খাত থেকে চার হাজার ফুট ওপরে জঙ্গলের মাঝে একটুকরো তৃণভূমির ওপর রিঞ্চেনপং মঠ। বেইলিরা এসে দেখল তিরিশ বছর পরেও সেটি ঠিক একইরকম আছে, যেমন কিন্টুপ দেখেছিল। সারাদিন ধরে লামাদের মন্ত্রোচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনির গায়ে রংবেরঙের সুতোর মতো ফোঁড় তুলে যায় জংলি ফেজেন্টের ডাক; মধ্যরাতে দূরে কোথাও হিমবাহ পতনের সঙ্গে মিশে যায় তুষার চিতার হুঙ্কার, মঠের পাথরবাঁধানো উঠোনে খুরের শব্দ তুলে ছুটে যায় টাকিনের জেরা।

এখানে তিনদিন কাটাবার পর একটি উপলব্ধি হয় বেইলির: কিন্টুপের সেই অনুসন্ধান নিছক ভূপ্রাকৃতিক কৌতূহল ছিল না; তার সঙ্গে মিশেছিল আত্মানুসন্ধান।

—সাহেব, সব মানুষ জীবনে একটা কাজ নিয়ে পৃথিবীতে আসে, কিন্টুপ পরে বলেছিল। কেউ সেটা খুঁজে পায়, কেউ পায় না। কেউ তার আসল কাজটা খুঁজে না পেয়ে ঘুরে মরে কেবল। রিঞ্চেনপঙের মঠে গিয়ে আমি যেন দেখতে পেলাম, প্রভু বুদ্ধ আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরিয়ে নিলেন। এরপর ফিরে গেলাম পেমাকোচুং মঠে, আমায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন মঠের প্রধান লামা।

সিমলায় ভাইসরিগ্যাল লজের অতিথিশালায় কিন্টুপের কথাগুলো শুনতে শুনতে বেইলির মনে পড়েছিল ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের কথা। লাসা অভিযানের সময় প্রতিদিন অপরাহ্নের পর সমস্ত দরকারি কাজ ফেলে সেনাছাউনির থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনো উঁচু জায়গায় চলে যেতেন তিনি। ফিরে আসতেন অন্ধকার নেমে আসার পর।

হিমালয়ের নিঃসীম ব্যাপ্ত চরাচরের মাঝে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা ধরা আছে ইয়ংহাজব্যান্ডের লেখায়। এই প্রত্যন্ত হিমবাহ অঞ্চল আমাদের এমন এক বিশুদ্ধতার ধারণা দেয়, রঙের বৈচিত্র্য এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেলবতায় ধরা দেয়, যেমনটি আর কোথাওই পাওয়া যায় না— লিখছেন তিনি। কিন্তু সেই রঙের গভীরতা, তার ব্যাপ্তি, তার ঔজ্জ্বল্য পুরোপুরি পাবার জন্য আমাদের সেখানকার সূর্যাস্ত চাক্ষুষ করতে হবে— সেইসব সুউচ্চ মরুপ্রদেশের সূর্যাস্ত, যেখানে দৃশ্য ব্যাপ্ততম, আবহাওয়া স্বচ্ছতম। অনেক অনন্যোপম সূর্যাস্ত আমি দেখেছি গোবি, ইজিপ্ট ও আরবের

BanglaBook.org

মরুভূমিতে, দেখেছি অ্যারিজোনায়। কিন্তু এমন সূর্যাস্ত আর কোথাও দেখিনি। সমুদ্রতল থেকে ১৫ হাজার ফুট উঁচু পৃথিবীর ছাতের ওপর আবহাওয়া আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ, বাতাস নির্মল, দৃষ্টি বাধা পাবার মতো একটিও বাড়িঘর বা গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। সূর্যাস্তের প্রহরে যে বর্ণচ্ছটা এখানে দেখা যায়, তা কেবল প্রত্যক্ষ করা যায় মূল্যবান রত্নপাথরে, শিল্পীর ক্যানভাসে কখনোই নয়। চুনির লাল, নীলকান্তমণির নীল— রঙগুলো যেন আকাশের গায়ে চাপানো নেই, যেন আকাশের ভেতর থেকে নিংড়ে বেরিয়ে আসছে, আমরা যেন সেই রঙের অন্তঃকরণ দেখতে পাই। আর কী দ্রুততায় একে অপরের মধ্যে মিশতে থাকে, গলতে থাকে! চিত্রকলার মতো স্থির মাধ্যমে সেটা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। একজন দেব্যুসি কিংবা একজন টার্নার কীভাবে দেখতে হবে তার একটা ধারণা দিতে পারেন বড়জোর ?°

ক্ষমাপ্রার্থী

রিঞ্চেনপং থেকে পথ চলেছে সাংপোকে ছেড়ে। কঠিন ক্ষান্তিহীন চড়াই, প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঠে গিয়েছে ৪৫ ডিগ্রি কোণে। ওপর দিকে উঠতে আবহাওয়া ক্রমশ শুষ্ক হয়ে আসে, ঘন ক্রান্তীয় গাছপালা কমে গিয়ে কেবলই পাইনের বন, আরও ওপরে ন্যাড়া পাথরের গায়ে এদিক-ওদিক খর্বাকৃতি জুনিপার। দূরে দূরে একটি-দুটি বসতি। পাঙ্গো নামের এক জায়গায় নরম পাথরের খাদান, থালাবাটি কুঁদে তুলছে একদল নারীপুরুষ। হতশ্রী সাংরাং গ্রামে দেখা গেল একদল লোপা পাথরে একধরনের কাঠ থেঁতো করছে। কাঠের মণ্ড সিদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে থাকে ওরা।

২৫ জুন, ১৯১৩। পো সাংপোর ধারে একটি বড়ো মাপের গ্রাম শোইয়ায় এসে পৌঁছল বেইলিদের দলটা। সাংপোর উপনদী পো সাংপো— খরস্রোতা, ৮০ গজ চওড়া, দুপাশে জলা জমিতে বড়ো বড়ো ঘাস আর অ্যালপাইন ফুল ফুটে আছে। উচ্চতা ৮৫২০ ফুট। এককালে পো-মে উপত্যকার প্রধান জনপদ ছিল শোইয়া। বছর দুয়েক আগে চিনারা এসে ধ্বংস করে দেয়; লামাদের মঠ পুড়িয়ে দেয়, জংপনকে হত্যা করে তার দুই স্ত্রীকে লাসায় বন্দি করে নিয়ে যায়। নদীর দুপাড়ে প্রায় চল্লিশটির মতো খামারবাড়িতে ছড়িয়ে আছে সেই ধ্বংসের চিহ্ন। নদীর ওপর একটি ঝুলন্ত সেতু, সেটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তীরে ধাপকাটা যব আর মটরশুঁটির খেত, কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া, পাশে সার দিয়ে পীচ ফলের গাছ। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া, ঘুঘু আর দাঁড়কাক— একদল বালক হইচই করে তাড়াচ্ছে। উড়ন্ত পাখির ছায়া আর চিৎকারের ধ্বনি ঘুরপাক খায় পোড়া ধ্বংসস্তূপের ওপর। বেইলিদের চিনা ভেবে সন্দেহ করে বসতির মানুষ।

শোইয়া থেকে ফার গাছে ছাওয়া উপত্যকা দিয়ে দু দিন ধরে নেমে একটি প্রাকৃতিক

BanglaBook.org

বাঁধ ও জলাশয়, নদীর পাড় ভেঙে তৈরি হয়েছে। বছর কয়েক আগে এই বাঁধ ভেঙে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল দিহাং উপত্যকায়। গাছের গুঁড়িতে চামড়া-জড়ানো নৌকোয় চেপে নদী পার হল। লেকের জলে অসংখ্য পানকৌড়ি, ওপারে কামারদের বসতি ট্রুলুং। এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্টুপ।

কিন্টুপকে যে গ্রামে বিক্রি করে সটকে পড়েছিল সেই চিনা লামা, সেই গ্রামটির নাম থংকুক (বা জংজুক)। মাস কয়েক এখানে গাঁওবুড়ার ক্রীতদাস হয়ে কাটানোর পর পালিয়েছিল কিন্টুপ। পালানোর সময় স্বাভাবিকভাবেই পথের জরিপে কিছু গরমিল হয়, এই অংশের বিবরণ তাই অস্পষ্ট। কিন্তু যে নদী পাহাড় বসতি সেতু ঝর্ণার অনুপুঙ্খ ছবি সে মাথায় গেঁথে নিয়ে ফিরে এসেছিল, তা ছিল আশ্চর্যরকমের নির্ভুল। প্রায় দেড়শোটির মতো গ্রাম ও ছোটো বসতির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্টুপের রিপোর্টে। তিরিশ বছর পরে বেইলিরা যাবার সময় তার অনেকগুলিই হারিয়ে গিয়েছে। আবার বেশ কিছু নতুন বসতিও গজিয়ে উঠেছে। হিমালয়ের দুর্গম জনবিরল অঞ্চলে ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর নিরন্তর ঠাঁইনাড়া হবার, নতুন বাসভূমি খোঁজার যে কাহিনি লেখা হয়ে চলেছে শত শত বছর ধরে, তার একটা আভাস পাওয়া যায় বেইলিদের অভিযানে।

চামড়ার ডোঙায় চেপে ট্রুলুঙের সরোবর পার হবার সময় চারিপাশ আশ্চর্য শান্ত—জলের ওপর জেগে-থাকা মরা গাছের ডালে বসে ডানা শুকোচ্ছে পানকৌড়ির দল, পাড়ের কোনো কুটির থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দ ক্ষীণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নদীর ওপারে উপত্যকায়। কিন্টুপ যখন এসেছিল, তখন ছিল শীতকাল। ওপরদিকে জঙ্গলে পাতা ঝরে গিয়েছে, সরোবর আশ্চর্য সজীব হয়ে ছিল ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী হাঁসে। হিমালয়ের ওপরের দিক থেকে বরফের পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছিল ওরা।

বনে কাঠ কাটতে যাবার অছিলায় পালিয়ে গিয়ে পাঁচ দিন পাঁচ রাত জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্টুপ। ঠাঁই মিলেছিল এক বুড়ো কামারের ঘরে চালার নীচে খুপরিতে। দিনরাত হাঁসেদের ডানা ঝাপটানির ভেতর তার কানে যেন ভেসে আসছিল ঝরাপাতার জঙ্গলে মানুষের পায়ের শব্দ। থংকুক থেকে গাঁওবুড়ার লোকেরা তাকে অনুসরণ করছে, সেটা টের পেয়েছিল আগেই। পাঁচ দিন ধরে একটানা পালিয়ে আসার সময় ঘন বনের মাথায় দেখা যেত ধোঁয়ার ফিতে, নদীপাড়ে নরম বালিতে মানুষের পায়ের ছাপ, আঁধার জঙ্গলে গাছের গায়ে লাইকেন চেয়ে থাকত নিষ্পলক চোখের মতো, বাকলে সদ্য কুঠারের ক্ষত থেকে রস ঝরত। ট্রুলুং-এ কদিন কাটানোর পর পো সাংপোর উজান ধরে সাংপোর দিকে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্টুপ।

পো সাংপো ছেড়ে রংচু উপত্যকা ধরে উঠে যায় বেইলিদের দল। এখানে পাইনের বন, এছাড়া কিছু গগনচুম্বী সাইপ্রেস রয়েছে। একটি মেপে দেখা গেল ১৮০ ফুট! জঙ্গলে নানা ধরনের ফুল, বিভিন্ন প্রজাতির প্রিমুলা ও আইরিশ, বিষাক্ত অ্যাকোনাইটের ঝোপ আর পথের খাদ্য বুনো জাম। নানা জাতের পশুপাখিতে অরণ্য আমোদিত। টাকিন ও

BanglaBook.org

কস্তুরি হরিণ তো আছেই, এছাড়া খাড়া পাথরের খাঁজে ভোরাল, নীচের দিকে বনে তিব্বতি হরিণ। জঙ্গলের ভেতর কোথাও কোথাও আর্দ্র ঘাসজমি, গাড়োয়ালে যাকে বলে বুগিয়াল। একটি জায়গায় এসে দেখা গেল আশ্চর্য নীল ফুলের সমারোহ— ঠিক যেন একঝাঁক নীল প্রজাপতি ঝিকমিক করছে। কৌতূহলবশে একটি গাছ ফুলসমেত তুলে নিয়ে নোটবইয়ের পাতায় চেপে রাখল এরিক বেইলি।*

এই রংচু উপত্যকা থেকে শুরু হচ্ছে কংবো প্রদেশ। সুন্দর দৃশ্যাবলির ভেতর দিয়ে পথ যত ওপরের দিকে ওঠে, বাড়িঘরের আকার বদলে যায়— ঢালু কাঠের চালের বদলে সমতল মাটির ছাত। বোঝাই যায় জলবায়ু শুষ্ক, বৃষ্টিপাত তেমন হয় না এখানে। বন্য পোবাদের দেশ ছেড়ে আমরা অপেক্ষাকৃত সভ্য তিব্বতি এলাকায় প্রবেশ করলাম— লিখছেন বেইলি। পোবাদের মতো এরা খোলা চুল রাখে না, মেয়েরাও মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁশের টুকরো গুঁজে রাখে না ; দুটি লম্বা সরু বিনুনি মাথার পিছনদিক থেকে আড়াআড়ি ওপরদিকে তুলে গিঁট বাঁধে। অনেকে চমরির লোমের টুপি পরে ক্রিশ্চান যাজকদের মতো। এদের ভাষাও মূল তিব্বতির মতোই। খেতের ধারে আখরোট আর আপেলের গাছ, কাঠের খোঁদলে মৌমাছির চাষ হয়েছে। গ্রামের নাম লুনাং।

লুনাং থেকে দুদিনের পথে নিম-লা গিরিপথ পেরিয়ে আবার সাংপো উপত্যকায় এসে পৌঁছতে প্রকৃতি বদলে গেল আচমকা: গাছপালা ভিন্ন গোত্রের, প্রকৃতি উষর, বসতির ধারে ছোটো ছোটো খেতগুলোয় যব গম ও সর্ষে— তিব্বতি ফসল।

সাংপো এখানে বইছে মন্থর গতিতে। বিস্তার ৬০০ গজ, উচ্চতা ৯৬৮০ ফুট।

এর আগে মোনপাদের গ্রাম কাপুর নীচে সাংপোর উচ্চতা মাপা হয়েছিল ২৬১০ ফুট। মাঝের যে অংশটিতে সাংপো নেমেছে প্রায় সাত হাজার ফুট, সেটি এড়িয়ে ঘুরপথে ফের সাংপোয় এল বেইলিরা।

কিন্তু মধ্যবর্তী ওই অংশেই রয়েছে দুর্ভেদ্য, বিশ্বের গহীনতম গিরিখাত। কিন্টুপের সেই রামধনু-আঁকা জলপ্রপাতও রয়েছে সেখানেই।

এখন যে সমস্যাটি আমাদের সামনে দেখা দিল— বেইলি লিখেছেন— তা হল নদীর গতিপথ ধরে ২৬১০ ফুটে সেই স্থান পর্যন্ত যাওয়া, যেখানে শেষ পরিমাপ নেওয়া হয়েছিল।

বাইশ মাইল দূরে সাংপোর তীরে বেশ বড়োসড়ো গ্রাম গেয়ালা থেকে সেই কঠিন যাত্রার রসদ সংগ্রহ করা হল। এখান থেকে নদীর পাড় বরাবর ক্রমশ উঁচু আর সংকীর্ণ হতে থাকা গিরিখাতের গা কামড়ে চারদিনের পথ পেমাকোচুং, যেখানে কিন্টুপ এসেছিল।

---

* কিছুকালের মধ্যেই এই ফুল বিখ্যাত হবে হিমালয়ান নীল পপি নামে, সাড়া ফেলে দেবে ব্রিটেনের উদ্যানপ্রেমীদের মধ্যে। বেইলির 'আবিষ্কার' স্মরণে রেখে এই ফুলের নামকরণ হবে Meconopsis baileyi। এছাড়া এই যাত্রায় একটি নতুন প্রজাতির গুরাল দেখা যাবে, সেটির নামকরণ হবে Nemorhaedus baileyi।

BanglaBook.org

সতেরো

গুপ্তভূমির দরজা

উনিশশো নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় আমি যখন দার্জিলিঙের সরকারি কলেজে চাকরি করতে গেলাম, সেখানে তখন রাজনৈতিক অশান্তির আগুন সবে নিভেছে। যে ছাত্রযুবকেরা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে কপালে সবুজ ফেট্টি বেঁধে পথে নেমেছিল, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে টক্কর দিয়েছিল, তারা একে একে কলেজের চৌহদ্দিতে ফিরতে শুরু করেছে। দাবানল নিভেছে, কিন্তু ধিকিধিকি আগুনের শিরাউপশিরাগুলি রয়ে গিয়েছে। যেকোনো একটি সুযোগে ফুলকি ফনফনিয়ে ওঠে, তারপর জ্বলে ওঠে দপ করে। এভাবেই ছিয়াশি সালে সরকারি কলেজে সমতলের এক বাঙালি শিক্ষকের অসতর্ক মন্তব্য সলতের কাজ করেছিল, শুরু হয়ে গিয়েছিল রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। সেই আগুন ফের লাগল পাহাড়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একশো শতাংশ সংরক্ষণের দাবিকে ঘিরে।

প্রথমে শুরু হল কলেজ গেটের বাইরে অনশন। তার দিন তিনেক পর একদিন বিকেল নাগাদ আচমকাই হিংসায় ফেটে পড়ল ক্যাম্পাস। বাইরে থেকে জিপ বোঝাই করে একদল যুবক লোহার রড আর হকি স্টিক নিয়ে এসে শুরু করে দিল ভাঙচুর। তাদের রোষের মুখে পড়ে একজন শিক্ষক প্রহৃত হলেন। অধ্যক্ষ অ্যান্টিরুমে লুকিয়ে পড়ে কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচলেন। তাঁর চেম্বারে এমনকি আগুন লাগানোর চেষ্টাও হল। শহরে শুরু হয়ে গেল অঘোষিত বন্‌ধ। এদিকে কলকাতা থেকে নির্দেশ এল অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেবার, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যেন শিক্ষকেরা কর্মস্থল ছেড়ে নেমে না আসেন।

আমাদের অবস্থা তখন অনেকটা দীপাবলির রাতে দিশেহারা রাস্তার কুকুরের মতো। মহাকরণ থেকে জেলা প্রশাসন কেউই সেভাবে পাশে নেই, স্থানীয় মানুষের চোখেও রাতারাতি যেন অপরাধী হয়ে পড়েছি। এমত অবস্থায় একদিন জেলাশাসকের অফিসে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিটিং সেরে ফিরছি আমরা কয়েকজন। কলেজের কাছাকাছি আসতে গোটা এলাকা শুনশান, ঝিঁঝি ডাকছে। রাস্তায় ছড়ানো ভাঙা কাচ, ছেঁড়া পোস্টার। কুকুরগুলোও যেন উধাও হয়ে গিয়েছে এলাকা ছেড়ে। কোয়ার্টার্সের সামনে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ, মাথায় টুপি, হাতে লম্বা পাকানো ছাতা: লোবসাং নোরবু!

আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডেকে ওঠেন,

—ভট্টাচারিয়া, আই হ্যাভ আ সারপ্রাইজ ফর ইউ!

BanglaBook.org

রাস্তা পেরিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি, মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। গত কয়েকদিন ধরে যে আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা রয়েছি তার ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও।

—তোমার হাতে কি দুমিনিট সময় হবে? একটা জিনিস দেখাতে চাই। নোরবু বলেন।

দার্জিলিং কলেজে যখনই কোনো অশান্তি হয়েছে, প্রতিবারই দেখেছি প্রায় সব স্থানীয় শিক্ষকেরা এক রহস্যময় অবস্থান নিয়েছেন। এবারেও অন্যান্যদের মতোই নোরবুর টিকি দেখা যায়নি বেশ কিছুদিন।

গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কী না জানতে চাই আমি, সামান্য বিরক্তির সুরেই। নোরবু মাথা নেড়ে জানান তিনি জানেন, বিরক্তিটা ধরতে পারেন কি না বোঝা যায় না।

—বেশিক্ষণ তোমার সময় নেব না। কয়েক মিনিট।

আমি ইতস্তত করি। সহকর্মীরা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। হাত নেড়ে ওদের এগিয়ে যেতে বলি।

সেই বসার ঘর, সোফায় তিব্বতি কার্পেটের আসন পাতা, কুলুঙ্গিতে পিতলের বুদ্ধমূর্তির গায়ে জ্বলন্ত আঙিঠির প্রতিফলিত আভা। গোলাপি ফুলপাতা আঁকা ফ্লাস্ক থেকে দুটি কাপে চা ঢালেন নোরবু। কোয়ার্টারটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ, দ্বিতীয় কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

সাবেকি ব্যুরো টেবিলের দেরাজ খুলে একটি মোটা পাকানো কাগজ বের করে আনেন, টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে মেলে ধরেন তার নীচে। মোটা, হাতে-তৈরি তুলোট কাগজ, তার ওপরে ঘন সবুজ আর সোনালি রঙে মানচিত্রের মতো নকশা আর তিব্বতি ভাষায় লেখা। কাগজটি বহু পুরোনো, জীর্ণ, সোনালি রং কালচে হয়ে গিয়েছে।

—কী এটা? অমসৃণ কাগজের ওপর আলতো আঙুল ছুঁইয়ে জানতে চাই আমি।

—এ হল টার্মা, বেয়ুলের পথনির্দেশ।

আমার বিহ্বল চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, টেবিলল্যাম্পের প্রতিফলিত আলোয় ওঁর মুখটা মোমের তৈরি মনে হয়। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

—শত শত বছর ধরে গোপন স্বর্গভূমির দরজা ছুঁয়ে আছ তুমি।

রহস্যময় হাসেন নোরবু, ওঁর সোনার দাঁতটি চিকচিক করে ওঠে।

বেয়ুল মানে হল গুপ্ত উপত্যকা, অবিরাম তুষার ঝড় আর নিশ্ছিদ্র কুয়াশার আড়ালে যা লুকিয়ে থাকে, তুষার চিতার দল পাহারা দেয় তার প্রবেশপথ। বিভিন্ন তিব্বতি ধর্মগ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। যুদ্ধ, হানাহানি, মহামারী কিংবা আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এই বিশ্ব যখন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, যখন ধর্মাচরণ প্রতিকূল হয়ে পড়বে, তখনই বেরিয়ে পড়তে হবে বেয়ুলের সন্ধানে— বলে গিয়েছেন গুরু রিনপোচে,

BanglaBook.org

যিনি তিব্বতে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। গিরিপথের খাঁজে, দুর্গম মঠের দেয়ালে, ঘন জঙ্গলে চোর্তেনের চোরা কুলুঙ্গিতে লুকোনো থাকে এই গুপ্ত উপত্যকার পথনির্দেশ। এগুলিই হল টার্মা। লোককাহিনির ভেতর, গূঢ় কাব্যের ধাঁধায়, সান্ধ্যভাষায় আর সাংকেতিক চিহ্নে রয়েছে বেয়ুলের বর্ণনা। তার মানচিত্র রয়েছে রাশি রাশি পুঁথিপত্রের ভেতর কোনো একটি পাতায়, যা লেখা হতো লামাদের অস্থিচূর্ণের সঙ্গে সোনার জল মিশিয়ে।

পেমাকো

সাংপোর গহীন দুর্ভেদ্য গিরিখাত শুরু হচ্ছে যে উপত্যকা থেকে, তার নাম বেয়ুল পেমাকো— অর্থাৎ, সেই গুপ্তভূমি যেখানে পদ্ম পাপড়ি মেলেছে।

কামারদের বসতি ট্রুলুং থেকে পালিয়ে সাংপোর খাত বরাবর বনাচ্ছাদিত পাহাড়ের গা বেয়ে বুনো জাম আর ছত্রাক খেয়ে কোনোক্রমে প্রাণধারণ করে একদিন কাকভোরে কিন্টুপ এসে পৌঁছল পেমাকো উপত্যকায়। তখন সবে দিনের আলো ফুটছে, চরাচর ছেয়ে আছে অপার্থিব নীলাভ আলোয়। অনেক নীচে নদীর পাড়ে একটি ঘুমন্ত জনপদ হালকা কুয়াশায় ঢাকা। তার ভেতর থেকে ভেসে আসছে মোরগের ডাক, চমরির ঘণ্টার শব্দ। আকাশের গায়ে আঁকা আবছা গোলাপি স্ফটিকের শৃঙ্গ নামচে বারোয়া। তার নীচে পরপর তুলির টানের মতো পাহাড়ের রেখার শেষে খাড়া পাথরের গায়ে ঝুলে আছে, অবিকল যেন পদ্মপাপড়ির মতো ফুটে আছে, পেমাকোচং গোম্ফা।

এই দৃশ্য দেখে এক অপূর্ব শান্তিতে ভরে ওঠে কিন্টুপের মন, যাবতীয় দুশ্চিন্তার গ্লানি খসে যায়।

গ্রামের প্রান্ত থেকে পাথরে ধাপ কেটে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে গোম্ফায়। পাশ দিয়ে নামছে ঝর্ণা, জল যাচ্ছে চাষের খেতে। দেহের অবসাদ ভুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় কিন্টুপ। প্রথম সূর্যের রশ্মিতে ঝিকমিক করে নামচে বারোয়ার চুড়ো, নীচে সবুজ তৃণভূমিতে অতিকায় চমরিগুলো যেন জীবন্ত কষ্টিপাথরের স্তূপ। কাঠের বালতি হাতে নিয়ে শিসধ্বনি দিতে দিতে উঠে আসছে গ্রাম্য মেয়েরা।

অনেকটা পথ ওঠার পর একটা বাঁধানো উঠোন, পাথরের খাঁজে বেগনি ফুল ফুটে আছে। পরপর কয়েকটি চোর্তেন, একসার প্রার্থনার চাকা। মূল মন্দিরটি বহু প্রাচীন, কাঠ আর পাথরে তৈরি। ভেতরে আবছায়ায় অতিকায় বুদ্ধের নিমীলিত চোখে প্রতিফলিত প্রভা— ধ্যানমগ্ন, জাগরূক। পায়ের কাছে বসে চোখ বুজে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন এক অতি বৃদ্ধ লামা। মেঝেয় হাঁটুমুড়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছে তিনজন, তিন গ্রামবাসী— তাদের মলিন বেশভূষা, ক্ষতবিক্ষত পায়ের পাতায় রক্ত শুকিয়ে আছে, কোমরে খাপে গোঁজা ছুরি।

BanglaBook.org

অনাহারক্লিষ্ট দেহে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পরেও প্রভুর সামনে এসে সব ক্লান্তি চলে যায় কিন্টুপের, শরীরটা হালকা পালকের মতো মনে হয়। হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে মাথা ছোঁয়ায় সে। ওর বন্ধ চোখের ভেতর ভাসে ওই পায়ের পাতাগুলো, একটা আবছা শঙ্কায় দুলে ওঠে মন, আর পরমুহূর্তে দুদিক থেকে ক্ষিপ্র হাত এসে মাটিতে চেপে ধরে। কাঠের মেঝেয় ধ্বস্তাধস্তির শব্দে লামা চোখ খুলে তাকান একবার, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ থামে না।

পেমাকোচুং

তিরিশ বছর পরে এরিক বেইলি যখন পেমাকোচুং গোম্ফায় গেল, ততদিনে সেই বৃদ্ধ লামা মারা গিয়েছেন। সেই সময়ের কেউই আর মঠে নেই। তবে ভারতবর্ষ থেকে আসা এক ধর্মপ্রাণ পর্যটকের ক্রীতদাস হয়ে পড়ার কাহিনি অনেকেই জানত। কিন্টুপের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে থংকুকের লোকেদের থেকে ওকে কিনে নিয়েছিলেন প্রধান লামা। এই তথ্য জানার পর ব্রিটিশ সরকারের তরফে পঞ্চাশটি টাকা মঠের কোষাগারে দান করা হল।

তিরিশ বছর পরে অবশ্য পঞ্চাশ টাকার মূল্য কমে গিয়েছে অনেকটাই। তিরিশ বছরে পৃথিবীটাই বদলে গিয়েছে। দুর্গম বাণিজ্যপথে সেই বদলে যাওয়া পৃথিবীর কিছু কিছু সামগ্রী এসে ঢুকছে প্রত্যন্ত তিব্বতেও— মিলের কাপড়, চিনি, কৃত্রিম রং, কাঁসার পাত্র। কিন্তু সেই বেয়ুল পেমাকো একই রয়েছে, যেমনটি কিন্টুপ দেখেছিল: উষর বরফাবৃত পাহাড়শ্রেণির খাঁজে লুকোনো পিরিচের মতো উপত্যকাভূমি, যার বুক চিরে বয়ে চলেছে সাংপো। চারিপাশে প্রাচীরের মতো পাহাড়শ্রেণি থাকায় শীতল ক্ষুরধার বাতাস বয় না এখানে। হিমবাহ গলে নামা অসংখ্য ঝর্ণায় পুষ্ট সবুজ বনানী, সেখানে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাখি জীবজন্তু বংশবিস্তার করে চলে। নদীর পাড় বরাবর যব আর গমের খেত, ছোটো জনপদ, সেখানে জীবন বয়ে চলে মন্থর ছন্দে। ওপরে পাহাড়ের খাঁজে একটা গোম্ফা। তারও ওপরে আকাশের পটে বরফের পিরামিড নামচে বারোয়া। সব মিলিয়ে যেন এক কল্পছবি, দার্জিলিঙের এক বৃদ্ধ দর্জির স্মৃতিপটে আঁকা, সেলাই মেশিনের শব্দের ভেতর ফুটে থাকে ঝিঁঝির ডাক আর ঝর্ণার ধ্বনি হয়ে, অম্লান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ গাঢ় মেদুর হয়ে আসে।

এরিক বেইলির বর্ণনায় অবশ্য তেমন কোনো কল্পনার উপাদান নেই। ভূগোলবিদের স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টি লিপিবদ্ধ হয়েছে নির্ভার গদ্যে।[১] ঘন জঙ্গল দেখে বোঝা যায় এখানে বৃষ্টিপাত হয় বেশি— লিখছেন। গেয়ালা গ্রামের কাছে কিছুদূর শান্ত ছন্দে চলার পর সাংপো প্রায় পুরো পথটাই ছুটেছে খরস্রোতে, ফেনায়িত র‍্যাপিডে ভাঙতে ভাঙতে। পেমাকোচুং মঠের এক মাইল আগে নদীর খাতে নেমে গিয়েছে একটি পথ। কিন্টুপের

BanglaBook.org

রিপোর্টে যে জলপ্রপাতের উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি রয়েছে এখানে। মাত্র পঞ্চাশ গজ চওড়া একটি খাতের ভেতর দিয়ে বইছে, এতটাই তীব্র তার বেগ যে প্রপাতটি ঠিক উল্লম্ব নয়। কিন্তু উচ্চতা কোনোমতেই তিরিশ ফুটের বেশি হবে না। সরু খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবল গর্জনে আছাড়িপিছাড়ি খেতে খেতে নামছে ফেনায়িত জল, ওপরে ধোঁয়ার মতো ভাসমান জলকণা। সেই জলকণার গায়ে আলোর প্রতিসরণে ফুটে আছে একটি নিখুঁত রামধনু।

এটি একটি তীর্থস্থান। শীতকালে যখন জল কম থাকে, দূরদূরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ বহু বাধা পেরিয়ে এখানে আসে। জলের পর্দার আড়ালে পাথরে খোদাই দেবতা শিংচে চোগিয়ে, পরণে বর্ণময় উত্তরীয়ের মতো রামধনু। পাথরের খাঁজে একটি প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়ে দেবতার কাছে যাওয়া যায়, মাখনের দীপ জ্বালা হয়। কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে সুড়ঙ্গের মুখ জলে ভরে থাকায় সেখানে যাওয়া গেল না।

নায়াগ্রা কিংবা ভিক্টোরিয়ার মতো একটি জলপ্রপাত আবিষ্কারের স্বপ্ন মাথায় নিয়ে এসে যেকোনো অভিযাত্রীই হতাশ হয়ে পড়বে পেমাকোচুঙের ঝর্ণা দেখে। কিন্টুপের রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়া ছিল এরিক বেইলির, এছাড়া হিমালয় ও বিশেষত সাংপো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। অভিযানের আগে কিন্টুপ ছিল নিছকই সার্ভে অব ইন্ডিয়ার নথির পাতায় একটি ভারতীয় নাম। সেই নামধারী ব্যক্তি জীবিত আছে কী না সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার ভাবনা বেইলির মাথায় আসেনি। কিন্তু সাংপোর উজানপথে চলতে চলতে, কঠিন গিরিপথ বন আর গোপন উপত্যকা পার হবার সময় এক অজানা নেটিভ গুপ্তচর ক্রমশ একজন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠছিল। গাইড কুলি তাঁবু খচ্চর বন্দুক ও নানাবিধ সরঞ্জাম নিয়ে যে পথে চলছিল তাদের দলটা, তিরিশ বছর আগে এই পথে গিয়েছে দার্জিলিঙের এক দর্জি, কপর্দকহীন, কখনো পলায়মান, বিজন গহীন অরণ্যপাহাড়ের মাঝে সম্পূর্ণ একা একটা মানুষ, জপমালায় পথের দূরত্ব মাপতে মাপতে চলেছে, অক্ষরজ্ঞানহীন, যাত্রাপথের টপোগ্রাফি অবিশ্বাস্য অনুপুঙ্খতায় স্মৃতিতে খোদাই করে নিয়ে চলেছে। এই ব্যাপারটা ক্রমশ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, ততই বিস্ময়ে অধীর হয়ে পড়ল তরুণ বেইলি।

পেমাকোচুঙের জলপ্রপাতটি দেখার পরেও সেই বিস্ময়ে চিড় ধরেনি। আর তাই অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর কিন্টুপকে সে খুঁজে বের করল দার্জিলিঙের দর্জিগলিতে।

ততদিনে কিন্টুপ বৃদ্ধ হয়েছে। ছায়াচ্ছন্ন গুমটির মেঝেয় পা দুটো ছড়িয়ে ঝুঁকে বসে একটি জীর্ণ কোট রিফু করছিল সে। বাইরে ফৌজি উর্দি-পরা সাহেব দেখে উঠে দাঁড়াল, মুখে ফুটল আতঙ্কের রেখা।

—ইউ চিট! গিম্‌মি দ্য বিগ ওয়াটারফল! কপট গম্ভীর গলায় গর্জে উঠল ফৌজি সাহেব।

কিন্টুপ কাঁদতে কাঁদতে বলল, আই পুয়োর টেলার সাহিব!

সেইসময় হেনরি ম্যাকমাহনের উদ্যোগে সিমলায় ভারত তিব্বত ও চিনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শুরু হচ্ছে। এরিক বেইলি ও হেনরি মোর্সহেডের করা জরিপের ওপর ভিত্তি করে সীমান্তরেখা টানার তোড়জোড় চলছিল। অশীতিপর কিন্টুপকে দার্জিলিং থেকে নিয়ে আসা হল সিমলায়। সেখানে তিব্বত ফ্রন্টিয়ার কমিশনের সামনে আবার স্মৃতি হাতড়ে তিরিশ বছর আগের সেই যাত্রাপথের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিল কিন্টুপ। তখনই স্পষ্ট হল, পেমাকোচুং জলপ্রপাতের উচ্চতা নির্ধারণে ভুল করেনি সে। প্রথমবার রিপোর্টটি অনুলিখন হবার সময় দু-দুটি ভাষায় হাতফেরতা হতে গিয়ে তথ্যবিকৃতি ঘটেছিল।

সিমলা থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায় কিন্টুপ।

কিন্টুপ ফলস ছাড়িয়ে নদীর পথ ধরে কিছুদূর এগোলে একটি চওড়া জলধারা পাথরের গা বেয়ে নেমে এসে মিশেছে সাংপোয়, পার হওয়া অসম্ভব। অগত্যা খাড়া পাথর বেয়ে জলের উৎস পর্যন্ত উঠে গেল বেইলিদের দল, ন-হাজার ফুট উচ্চতায়, যেখানে পশুকরোটির আদলে বরফের গুহা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে জলরাশি। ওপরদিকে গুঁড়ো পাথর মেশা বরফ পার হয়ে ফের নদীর কাছে নেমে আসা গেল। কিন্তু তারপরেই দেখা দিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধাঃ পাহাড়ের গা থেকে ক্ষুরধার পাঁচিলের মতো উঁচু শৈলশিরা সটান নেমে এসেছে নদীবক্ষে। সেদিনের মতো তাঁবু ফেলা হল তার পায়ের কাছে।

পরদিন প্রায় সারাদিন কেটে গেল শৈলশিরার গায়ে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে চলার মতো একটি পথ কেটে তুলতে। বেশ অনেকটা ওপরে একটি পথের রেখা দেখা যাচ্ছিল, গহীন জঙ্গল চিরে চলে গিয়েছে কোনো অনির্দেশের পথে। কিন্তু পেমাকোচুং থেকে নেওয়া স্থানীয় গোপালক গাইডটি ওই পথের ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না।

পরদিন সকাল হতে সেই খাড়া শিরা আঁকড়ে চলা, অনেক নীচে পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সাংপো। মাথার ওপরে নীল আকাশ, ঈগল উড়ছে। জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে আসছে। ক্রান্তীয় মহীরুহের বন, আর্দ্র, লতাজালে জড়ানো, সাংপোর কলধ্বনিতে সপ্রাণ হয়ে আছে। আর কোনো শব্দ নেই, পাখির কাকলি নেই।

ঘন বন আর খাড়া পাহাড়ের গা, বিকেলের আগেই সূর্য চলে গেল আড়ালে। অন্ধকার নেমে এল। অনেকটা নীচে সরু খাতে খরস্রোতা নদী যেন টগবগ করে ফুটন্ত রুপো। তাঁবু খাটানোর মতো এক চিলতে সমতল জমি নেই ; গাছের ডালে মাচা বেঁধে রাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। পরদিন ফের বন কেটে পথ বানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলা। বেঁটে রডোডেনড্রনের জঙ্গল দিয়ে একবেলা চলার পর একটি স্পার, হিমবাহ-গলা জলধারা নেমেছে। এখান থেকে সাংপো আচমকা দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে চুলের কাঁটার মতো, বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু আর এগোনোর পথ নেই। রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অতএব ফিরে যাওয়া সাব্যস্ত হল।

খাদ্যদ্রব্য কিনতে দুজন কুলিকে পাঠানো হয়েছিল পেমাকোচুং-এ। তারা ফিরে এসে

BanglaBook.org

জানাল বনের মধ্যে মধুসংগ্রহকারী মউলের একটি দলের দেখা মিলেছে। ওরা জাতিতে মোনপা, সাংপোর নীচের দিকে একটি বসতি থেকে এতদূর এসেছে। এই খবর পাবার পর ওদের আসার পথ ধরে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল বেইলি। কিন্তু সামনের পথ অত্যন্ত দুর্গম, দুর্ভেদ্যপ্রায়। স্থির হল, দুজন কুলি ও নামমাত্র রসদ সঙ্গে নিয়ে বেইলি একাই এগিয়ে যাবে, মোর্সহেডরা ফিরে যাবে গেয়ালায়।

নিশ্ছিদ্র বনের ভেতর ধাপ কেটে, কখনো দড়িতে ঝুলে নীচের দিকে নেমে এসে পরদিন দুপুরের আগে মউলেদের সেই দলের দেখা পাওয়া গেল। বালক থেকে মাঝবয়সী পুরুষ, সাতজন, সকলে একই পরিবারভুক্ত। গহীন গিরিখাতের ভেতর একটি পরিবার নিয়েই গ্রাম। সাংপোর ধারে উঁচু বার্চের বনে মধু সংগ্রহ করছিল ওরা। বেইলিকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হল।

ওদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সামনে তেমন কোনো বড়ো জলপ্রপাত নেই। তবে গোটা পথে সাংপো এমনই খরস্রোতা, খাতও এমনই সরু আর গভীর, তীব্র বেগে নেমে গিয়েছে অবিরাম বোল্ডারের সিঁড়ি ভেঙে। ওদের নির্দেশমতো নদীর পাড় ধরে কয়েক মাইল এগিয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় তাঁবু ফেলা হল। সাংপোর বেক থেকে প্রায় দুশো ফুট ওপরে একটা গুহা, তার ওপরে খাড়া বনাকীর্ণ পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে। খাতের দুপাশ থেকে এমনভাবে ঠেসে এসেছে যে ওপর দিকে তাকালে মনে হয় বুঝি শ্বাসরোধ হয়ে যাবে। আলো মরে আসার পর জলের ওপর কুয়াশা ঘিতিয়ে জমাট বেঁধে এসে লটকে গেল পাহাড়ের গায়ে, শিকার-হওয়া পশুর মতো।

মোনপারা মধু সংগ্রহের পর তাঁবুতে আসার কথা ছিল। কিন্তু দিনের শেষে ওদের দেখা পাওয়া গেল না।

পেমাকোচুং-এর মঠ থেকে তীর্থযাত্রার নাম করে বেরিয়ে খুব সম্ভব এখানেই এসেছিল কিন্টুপ। তখন শীতের শুরু। জঙ্গলের কাঠ কেটে পাঁচশোটি টুকরো লুকিয়ে রেখেছিল ওই গুহার ভেতরে। তারপর এখান থেকে সে চলে যায় লাসায়, এক ব্যাপারির মারফৎ বার্তা পাঠায় নিমা শেরিংকে।

থংকুক থেকে পেমাকোচুঙের মঠ, ক্রীতদাস হিসেবে কিন্টুপের মালিকানা বদল হয়েছিল। প্রায় একবছর মঠে থাকাকালীন লামাদের ফাইফরমাশ খাটা, ঝর্ণার জল টেনে আনা, নীচের গ্রাম থেকে মোট বয়ে আনা কিংবা গোম্ফার মেঝে সাফাইয়ের কাজে মধ্যে একটিবারের জন্যেও সে তার দায়িত্ব বিস্মৃত হয়নি। খাড়া পাহাড়ের খাঁজে ঝুলন্ত গোম্ফা, দূর আকাশে স্ফটিকস্বচ্ছ তুষারমৌলি, নীচে চিকচিক করে বইছে সাংপো। গিরিখাত ধরে জলের সামান্য ওপর দিয়ে উড়ে আসছে হাঁসের ঝাঁক, মঠের চাতাল থেকে দেখে মনে হয় যেন এক কালচে বাদামি পালকের নদী শত শত ডানায় তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে।

শীত এসে পড়ল আবার।

আবার তীর্থযাত্রার জন্য ছুটি প্রার্থনা করল কিন্টুপ। আজ্ঞা মঞ্জুর হতে ফের গিয়ে পৌঁছল সাংপোর সেই বাঁকে, সেই গুহায়। কাঠের টুকরোগুলোয় সেঁটে দিল ফুটো

BanglaBook.org

পয়সার আকারে পেতলের চাকতি, সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সিল। এতকাল ধরে সে সিলগুলো মালার মতো করে পোশাকের ভেতর কোমরে পরেছিল, এত বিপর্যয়ের মধ্যেও কাছছাড়া করেনি। সারাদিন, এমনকি ঘুমের ভেতরেও পাশ ফিরলে কোমরে অনুভব হতো ঠান্ডা ধাতুর স্পর্শ। এতকাল পরে ভারমুক্ত হল কিন্টুপ। অমাবস্যা থেকে চাঁদ পূর্ণ হয়ে ওঠার দশদিন সাংপোর স্রোতে ভাসিয়ে দিল পাঁচশো কাঠের টুকরো।

পরদিন সকালেও সেই মোনপাদের দেখা নেই। সারাদিন ধরে অগম্য গিরিখাতের গায়ে কোনোরকম পথের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে বনের ভেতর ক্যামেরাটি হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটি আর পাওয়া গেল না। রাতটা আবার সেই গুহার নীচে তাঁবুতেই কাটাতে হল।

সারারাত প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দে ঘুম আসেনি বেইলির। মাথার ওপর কালো গগনচুম্বী গিরিখাত যেন এক বিকট জন্তুর হাঁ-মুখের ভেতর দিয়ে দেখা নক্ষত্রখচিত আকাশ। দিনের আলো ফুটতে হাজির সেই মউলের দল।

শীত পড়লে হরিণের দল গিরিখাতের গা বেয়ে যে পথে পাহাড় টপকে নীচের উপত্যকায় যায়, সেই পথ ব্যবহার করে দুঃসাহসী মোনপারা। স্থানে স্থানে বাঁশ আর বুনো লতা বেঁধে মই তৈরি করেছে। কোনো কোনো জায়গায় এতটাই খাড়া আর সরু যে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। একশো ফুট উঠতে এক ঘণ্টা লেগে যায়, দেহের পেশি অবসাদে অসাড় হয়ে আসে। সঙ্গে সামান্য যা মালপত্র ছিল, মোনপাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। এভাবে হাজার খানেক ফুট উঠে আসার পর পায়ের নীচে নদীটা হারিয়ে গেল, কিন্তু বনের গাছপাতার ভেতর ঝড়ের মতো একটা শব্দ বেড়ে চলল ক্রমশ। আরও কিছুদূর যাবার পর সামনে একটি কঠিন গ্রানাইটের শিরা, এতটাই খাড়া আর মসৃণ যে কোনো উদ্ভিদ জন্মায়নি। নীচে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ।

জুতো পায়ে আর এগোনো যাবে না, মোনপারা জানায়। তাছাড়া সঙ্গে যথেষ্ট দড়িও নেই ওদের। সামনের পথ অত্যন্ত কঠিন আর বিপজ্জনক। বেইলিকে এবার ফিরে যেতে বলে ওরা।

কিন্তু বেইলি নাছোড়, এভাবে যতখানি পথ এগোনো যায়। সেই বহুপ্রতীক্ষিত, জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যময় সময়ের মুখোমুখি হয়ে মাথার ভেতরে একটা নেশার মতো আবেশ। শিরাধমনিতে বাজছে সাংপোর কলোচ্ছ্বাস, বুকের ভেতর ঘা মারছে হাতুড়ির মতো।

শাখামৃগের মতো চার হাতেপায়ে গ্রানাইটের স্পারটা কোনোক্রমে পার হয়ে আর দেখা যায় না ওদের। মালপত্রগুলো পড়ে আছে, অন্ধকার নিশ্ছিদ্র রডোডেনড্রনের বনে মানুষগুলো মিলিয়ে গিয়েছে। কিররর কিররররর শব্দে ঝিঁঝি ডাকছে, মাথার ওপর প্রহরীর মতো ঝুঁকে আছে নামচে বারোয়া আর গেয়ালা পেরির শৃঙ্গ। অনেক নীচে মাথা-ঘোরানো খাদে ছুটে চলেছে, টগবগ করে ফুটে চলেছে এক অসম্ভব নদীর স্বপ্ন, জলকণার ধোঁয়ায় ঢাকা, দুপাশের গিরিখাত থেকে অগণন শৈলশিরা পাঁজরের মতো নেমে এসেছে তার বুকে।

BanglaBook.org

আঠেরো

বেইলি ট্রেল

সাংপোর দুর্ভেদ্য গিরিখাতে যতদূর যেতে পেরেছিল কিন্টুপ, তারপরে আরও বারো মাইল এগিয়েছিল ক্যাপ্টেন এরিক বেইলির দল। আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ মাইল সাংপোর পথ অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল সেই অংশটি দশ মাইলের বেশি নয়, তার কারণ প্রায় সেই সময়ে সাংপোর উজান পথে অনুসন্ধান করেছিল অন্য একটি দল। কোনো গুপ্ত জলপ্রপাতের সন্ধান অবশ্য পাওয়া যায়নি।

মিপি থেকে বেইলিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৪ মে, ১৯১৩। শেষ হয় ১৫ নভেম্বর। এই ছ-মাসে ১৬৮০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন তাঁরা, বেশিরভাগটাই পায়ে হেঁটে। এমন সব অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে তার আগে কোনো বহিরাগতের পদচিহ্ন পড়েনি। এই অভিযানে একাধিক নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ ও পশুপাখি শনাক্তকরণ হয়। তিব্বত সীমান্তে ৩৮০ মাইল অঞ্চল নিখুঁত জরিপ হয় ও মানচিত্র আঁকা হয়। এক বছর পরে এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই টানা হবে ম্যাকমাহন লাইন, মানচিত্রের ওপর ফেল্টের নিব দিয়ে লাল কালিতে আঁকা একটি রেখা। যে বৃত্ত আঁকা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সেইসব গুপ্তচর পণ্ডিতদের হাতে, যে বৃত্তের পথ ধরে সেনা অভিযানে গিয়েছিলেন ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড, সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। ভারত উপমহাদেশের শেষ অগম্য ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল বাঁধা পড়বে অক্ষ আর নিরক্ষরেখার জালে।

পেমাকোচুং থেকে চেতাং হয়ে টুলুং-লা পাস পেরিয়ে ব্রিটিশ ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন বেইলিরা। পরবর্তীকালে সরকারিভাবে এই অঞ্চলটির নামকরণ হবে নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এরিয়া, সংক্ষেপে নেফা। ওই পথটি পরিচিত হবে বেইলি ট্রেল নামে।

টুলুং-লা গিরিপথের দক্ষিণে ছোটো ছোটো বসতি মাগো, লাপ, পোটা ও পোশিং-লা হয়ে থেমবাং এসে পৌঁছল এরিক বেইলির দল। পো-মে উপত্যকায় শোইয়ার পর এই প্রথম একটি বড়ো জনপদে পা রাখলেন তাঁরা। শোইয়া আক্রান্ত হয়েছিল চিনাদের হাতে, পোড়ো ঘরবাড়ি আর মানুষের চোখেমুখে ছিল ধ্বংসের ছায়া। কিন্তু নভেম্বরের এক স্বচ্ছ ঝলমলে সকালবেলায় থেমবাং-এ এসে দেখা গেল স্পন্দিত জীবন।

দুহাজার বছরের পুরোনো গ্রাম থেমবাং, এককালে মোনপা জনজাতির শাসনকেন্দ্র

BanglaBook.org

ছিল। পাহাড়ের মাথায় উঁচু পাঁচিলঘেরা দুর্গের ঘেরাটোপে কুলপতিদের কাঠ আর পাথরে তৈরি সুদৃশ্য বাড়িগুলো; জানলায় রঙীন চিনা রেশমের পর্দা, ফটকদ্বারে রক্ষীরা। তাদের মাথায় পালকের সাজ, হাতে বল্লম, কাঁধে তিরধনুক। নীচের দিকে ধাপকাটা মকাই আর যবের খেত। ঝর্ণা থেকে জলের ভিস্তি পিঠে নিয়ে চলেছে ব্রোকপা ক্রীতদাসের দল। পায়রা উড়ছে, ভুট্টাদানা শুকোচ্ছে ঘরের চালে, মেয়েরা ঝুলবারান্দায় বসে কার্পেট বুনছে। সব মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ বসতির ছবি।

থেমবাং

একশো বছর পরে আমরা যখন গেলাম, ততদিনে থেমবাং নিতান্তই হতশ্রী একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রাম, গাড়ির রাস্তায় শেষ জনপদ। ততদিনে নেফাও হয়ে গিয়েছে অরুণাচল প্রদেশ। জায়গাটা পশ্চিম কামেং জেলায়।

থেমবাং-এ বসতিটা গুটিয়ে এসেছে পিচরাস্তার দুধারে, বেশিরভাগ বাড়িই সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত টিনের তৈরি। পাহাড়ের মাথায় পাথরে তৈরি প্রাচীন দুর্গটির জীর্ণদশা। একদিকে উঁচু ফটক আর দেয়ালের খানিকটা অংশ টিকে রয়েছে কেবল। একশো বছর আগে বেইলিরা যেমন দেখেছিলেন, সেই পালকের টুপি-পরা বল্লম তিরধনুকধারী প্রহরীরা নেই। পাহারা দেবার মতোও কিছু নেই আর। দুর্গের ভেতর বাড়িগুলো প্রায় ভেঙে পড়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে বাস করছে হতশ্রী দুর্দশাগ্রস্ত কয়েকটি পরিবার, এককালের সেই কুলপতিদের বংশধরেরা।

সদ্য মকাই উঠেছে। পাথরের চাতালে পা ছড়িয়ে বসে মকাই ছাড়াচ্ছে একদল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ঘরের চাল ছাইছে কয়েকজন পুরুষ, মলিন শতচ্ছিন্ন কম্বল রোদে মেলে দিচ্ছে কেউ। পর্যটক দেখে তারা স্বাগত জানায় না, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে গেলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এমনকি সেঁধিয়ে যায় ছায়াচ্ছন্ন ঘরের ভেতর। বাড়িঘরগুলোয় এককালের জৌলুসের চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গিয়েছে কারুকার্যময় দরজার চৌকাঠে, ঝুলবারান্দায়। তার ওপর টিন আর দরমার কুশ্রী তাপ্পি পড়েছে; ভেঙে পড়া সিঁড়ির স্থান নিয়েছে ধাপকাটা গাছের গুঁড়ি। পোড়ো পরিত্যক্ত কাঠপাথরের স্তূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোরগ আর শুয়োর, দেয়ালে ব্রোঞ্জরঙা ফার্ন হয়ে আছে। গোটা জায়গাটা কেমন আঁধারময় আর স্যাঁতসেঁতে। মানুষগুলোর চোখেমুখেও সেই আর্দ্র ছায়া। দুহাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের কোনো চিহ্নই নেই আর।

আমাদের তাঁবু পড়েছিল রাস্তা থেকে ফুট তিরিশেক নীচে সমতল ভূমিতে। জানা গেল, বহুকাল আগে এই জমিতে লোপাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছিল মোনপাদের, তার পরেও ১৯৬২ সালে চিন ও ভারতের সৈন্যদলের। সন্ধ্যার আগে একটি লজঝড়ে রাজদূত বাইক চেপে এল স্থানীয় জিবি, অর্থাৎ গাঁওবুড়া— জিনস আর চামড়ার জ্যাকেট

BanglaBook.org

পরা এক তরুণ।* কুলি ও খচ্চরের বন্দোবস্ত করতে এসেছিল সে। পরদিন সকালে আমরা বেইলি ট্রেল ধরে হাঁটা শুরু করব।

শাম্ভালা

ভারতবর্ষে আসার পর তিব্বতি ভাষা আয়ত্ত করতে লে উপত্যকায় এক দুর্গম গোম্ফায় দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন কোরোসি চোমা। সেখানে ২২৪টি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আবিষ্কার করেন তিনি ; মোট ৭৬,৪০৯টি পৃষ্ঠা জুড়ে গূঢ় ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যা। তার মধ্যে ১৮টি পৃষ্ঠায় অতীব সাংকেতিক ভাষায় শাম্ভালা নামে এক গোপন, রহস্যাবৃত অঞ্চলের পথনির্দেশ ছিল।

শাম্ভালা এক অনাবিল শান্তির দেশ। বিশেষ কর্মফল অর্জন করার পরেই কেবল মানুষ যেতে পারে সেখানে। কালচক্র তন্ত্রের কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথিতেও এর উল্লেখ রয়েছে: এক পবিত্রভূমি, বিশ দিন ধরে অন্তহীন সাদা বালির মরুভূমি পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। এই শাম্ভালা আসলে হাঙ্গেরিয়দের পূর্বজ ইয়োগোরদের আদিভূমি, এমনটাই অনুমান করেছিলেন কোরোসি। সেই আদিভূমির সন্ধানে এতগুলি মহাদেশ ডিঙিয়ে ভারতে এসেছিলেন। ন-বছর ধরে নিবিড় গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। এক আশ্চর্য ভূমি— কোরোসি লিখেছেন, ৪৫ থেকে ৫০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার মাঝে অবস্থিত।

পরবর্তীকালে ভূগোলবিদেরা হিসেব করে দেখিয়েছে, উত্তরে এই অক্ষাংশে রয়েছে পূর্ব কাজাখস্তান— সবুজ অরণ্যে-ছাওয়া নীচু পাহাড়, নদী আর হ্রদ। সাদা বালির মরুভূমি নেই, বরফে ঢাকা পাহাড়ের দেশে গোপন গহীন উপত্যকাও নেই।

তাঁর অনুমানে যে কোথাও একটা ফাঁক ছিল, সেটা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন কোরোসি। সেজন্য শাম্ভালার হদিশ পাবার পরেও দীর্ঘকাল তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার কোনো উদ্যম দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। অবশেষে তিব্বতযাত্রার জন্য কলকাতা থেকে দার্জিলিঙের পথে রওনা দিলেন যখন, তখন তাঁর বয়স হয়েছে ৫৮ বছর, ভগ্নস্বাস্থ্য, কঠিন অভিযানের জন্য দেহ আর সক্ষম নয়। পথে তরাইয়ের জঙ্গলে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হল, দার্জিলিঙে পৌঁছে মারা গেলেন।

শাম্ভালার মরীচিকা দেখে যেতে হয়নি কোরোসিকে, কিন্তু এক পবিত্রভূমির রূপকল্প পাশ্চাত্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হল জেমস হিল্টনের *দ্য লস্ট হরাইজন*— সাহিত্যের গুণবিচারে নিতান্তই সাধারণ মানের একটি উপন্যাস, কিন্তু

---

* গাঁওবুড়া কথাটা এসেছে গ্রামবড়ো থেকে, অর্থাৎ গ্রামের প্রধান। এটি একটি বংশানুক্রমিক পদ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত এবং পঞ্চায়েত প্রধানের সমান্তরাল, অরুণাচলের পঞ্চম তফশিলভুক্ত আদিবাসী অঞ্চলে সরকারিভাবে স্বীকৃত।

BanglaBook.org

প্রকাশমাত্রেই সাড়া ফেলে দেয়। ছিনতাই-হওয়া একটি বিমানে ছয় ইউরোপীয় এসে পড়ল গভীর তুষারাচ্ছাদিত তিব্বতে লুকোনো এক চিরবসন্তের উপত্যকায়। সেখানে কুলকুল করে বয়ে চলে স্বচ্ছ জীবন্ত এক নদী, জীবন বয়ে চলে নদীর ছন্দে, দুপাড়ে সবুজ উর্বর বাগিচা বরফগলা ঝর্ণায় বিধৌত, তার ছায়ায় বিছিয়ে থাকে একটি শান্ত জনপদের নকশি কাঁথা। সেখানে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে রয়েছে একটি মঠ, ঠিক যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম— তার ধর্ম আর শান্তির বাণী পুষ্পরেণুর মতো বাতাসে বয়ে এসে ছড়িয়ে যায় জনপদের ওপর। এই হল শাংগ্রিলা।

তখনও ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত শুকোয়নি, এদিকে ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে আসন্ন আরেকটি যুদ্ধের ছায়া। যন্ত্রজব্দ যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমের মানুষ প্রাচ্য সাহিত্যে দর্শনে আঁতিপাতি করে খুঁজছে ভিন্ন একটি জীবনবোধ। শাংগ্রিলা হয়ে উঠল সেই বোধের ঠিকানা।

হিল্টনের উপন্যাস নিয়ে হলিউডে সিনেমা তৈরি হল, মার্কিন দেশে হিপি সংস্কৃতি জনপ্রিয় হল, শাংগ্রিলা নামটি ক্রমশ হয়ে পড়ল প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার ব্র্যান্ড নেম। কুহকী রোমান্টিকতারও ; হোটেল রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে মাসাজের তেল, স্পা রিসর্ট থেকে যৌনশক্তিবর্দ্ধক টনিক, সুগন্ধী ইত্যাদি। ১৯৫৯ সালে চিন তিব্বত দখল করার পর শাংগ্রিলা হারিয়ে গিয়েছিল লৌহপর্দার আড়ালে। বছর তিরিশেক পরে বিশ্ব জুড়ে বাজার অর্থনীতির হাওয়ায় চিনের দরজা খুলল, ইয়ুনান প্রদেশে একটি কাউন্টির নাম সরকারিভাবে বদলে রাখা হল শাংগ্রিলা।

শাংগ্রিলা, ওরফে শাম্ভালা: তিব্বতি তন্ত্রে মন্ত্রে লুকোনো কল্পভূমি হাঙ্গেরিয় প্রাচ্যবিদ থেকে ব্রিটিশ উপন্যাস ও হলিউডের হাত ঘুরে, পশ্চিম বিপণি আর দক্ষিণ এশিয় পর্যটনের বাজার হয়ে আত্মপ্রকাশ করল চিনের মানচিত্রে, বিশ শতকের শেষে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনশিল্পের দেশে।

ম ম ম ম ম

এরিক বেইলি ফিরে আসার একশো বছর পরে আমরা যখন তাঁর পথের রেখা ধরে যাবার চেষ্টা করলাম, ততদিনে সেটি হিমালয়ে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকদের মুখে মুখে বেইলি ট্রেল নামে পরিচিত হয়েছে। গাড়োয়াল বা কুমায়ুনের বিখ্যাত ট্রেকপথগুলির মতো জনপ্রিয় না হলেও আকর্ষণীয় তার ইতিহাসের কারণে। এই একশো বছরে সেই ইতিহাসের ওপর নতুন নতুন পরত চেপেছে— ম্যাকমাহন লাইন টানা হয়েছে, তিব্বত চলে গিয়েছে চিনের দখলে, চিন-ভারত যুদ্ধও হয়ে গিয়েছে এই অঞ্চলেই।

ভূগোলটা একই রয়েছে গিয়েছে যদিও। থেমবাং থেকে গভীর ক্রান্তীয় অরণ্যের ভেতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ গিয়েছে মোনপাদের ছোটো ছোটো গ্রাম ছুঁয়ে চড়াই পথে। দশ হাজার ফুটের ওপর ক্রমশ উদ্ভিদরেখা ছেড়ে অ্যালপাইন তৃণভূমি, তারপর

BanglaBook.org

পোশিং-লা আর ছে-লা (সে-লা নয়) গিরিপথ টপকে রিক্ত পাহাড়ের মাঝে বিচ্ছিন্ন ছোটো ছোটো চমরিপালকদের বসতি— পোটা, লাপ, মাগো ইত্যাদি। এরিক বেইলির লেখায় এই বসতিগুলোর উল্লেখ রয়েছে। সব মিলিয়ে দিন আটেকের হাঁটা, চোদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত চড়াই উৎরাই ধরে, পথে তাঁবুতে রাত্রিবাস। গোটা পথ জুড়েই অঢেল কুমারী অরণ্য প্রকৃতি, দেখা যায় নানান দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির পাখি আর প্রজাপতি।

আর দেখা যায় গোরিচেন, কাংতো, নাগি-খাংসাং... পূর্ব হিমালয়ের বিখ্যাত জমকালো সব শৃঙ্গ। তবে তার জন্য একটু সৌভাগ্যের প্রয়োজন ; বছরে আট মাস এই অঞ্চলে আবহাওয়া খারাপ থাকে। সেটা বিবেচনা করে আমরা পাঁচজনের একটি দল যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম অক্টোবরের শেষে। বমডিলার একটি পর্যটন সংস্থার মারফৎ তাঁবু রসদ কুলি গাইড খচ্চর ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল।

২৬ অক্টোবর, ২০১০। কলকাতা হয়ে এসেছিলাম তিনজন, দিল্লি থেকে দলের বাকি দুজন এসে যোগ দিলেন গুয়াহাটিতে। সরকারি পারমিটের জন্য দুদিন অপেক্ষা করতে হল আমাদের। গুয়াহাটির আকাশরেখায় অস্পষ্ট সরাইঘাটের পাহাড়, গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে অতিকায় ব্রহ্মপুত্র, শাসন করছে শহরের ভূপ্রকৃতি। সাজানো স্ট্র্যান্ড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেই বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে উনিশ শতকের এক গুপ্তচরের ভাসানো কাঠের টুকরো উদ্ধার হবার স্বপ্ন কল্পনাও করতে পারিনা আমি। কিন্তু পকে মনে রাখেনি ব্রহ্মপুত্র। যে অবিশ্বাস্য গিরিখাতের জঠর দিয়ে অসংখ্য প্রপাতে ভাঙতে ভাঙতে এতদূর এসেছে, মনে রাখেনি সেসবও। ঢেউয়ের ছাঁদে, স্রোতের ঘূর্ণিতে ইতিমধ্যেই তার মিলনের ইশারা শুরু হয়ে গিয়েছে সুদূর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে।

গুয়াহাটি ছাড়াতেই বিস্তীর্ণ ধানখেত, কচিৎ একটি দুটি শরের দেয়ালে মাটি লেপা কুঁড়ে, হিমালয়ের পলিবাহী নদী ; ক্রমশ দূর আকাশে নীলচে ধোঁয়ার মতো ফুটে উঠতে থাকে হিমালয়। আমার মনে পড়ে যায় পথের পাঁচালির অপুর বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাবার সেই অনুভূতি। ওই মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য ? অপু ভাবছে। শ্যাম-লঙ্কার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায় ? ওধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

নদীর নাম ধানসিড়ি। সেটি পার হতেই ওই নামে একটি ধাবা, পেট্রোল পাম্প, সারাই গ্যারেজ... কর্কশ শব্দে ব্রেক কষে গাড়ি থেমে যায়। সামনে সারি দিয়ে বাস ট্রাক জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় ভাঙা কাচ ছাড়ানো, টায়ার পোড়া গন্ধ বাতাসে। জানা গেল, বোড়ো জঙ্গিরা গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এই রাস্তায় এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, চালক আশ্বস্ত করে আমাদের। অবরোধ এখনই উঠে যাবে।

হয়ও তাই। গাড়ির কনভয় এসকর্ট করে নিয়ে চলে পুলিশের একটি সাঁজোয়া ট্রাক। দুপাশে নীচু মুসলমানদের গ্রাম, মাজার, নিমগাছ, মুর্গি ছুটোছুটি করছে, শঙ্কু আকৃতির বাঁশের জাল নিয়ে চলেছে লুঙ্গি-পরা মোঙ্গোলয়েড চেহারার পুরুষ। পান্নাসবুজ চা বাগানে বাবলার ফাঁক দিয়ে আসা ঝিরিঝিরি রোদ, পাতা তুলছে আদিবাসী রমণীর দল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা জনজাতির মানুষ এসে বাস করছে এই অঞ্চলে। উদার আকাশ আর বিস্তীর্ণ প্রকৃতির মাঝে শর-টিনের ঘরগুলো দেখে মনে হয় যেন সদ্য গজিয়ে উঠেছে, দুদিন বাদেই আবার মিলিয়ে যাবে। সহাবস্থানের এই পলকা ভাসা ভাসা চরিত্র থেকেই বোধহয় জন্ম নিচ্ছে অশান্তি।

ভালুকপঙের কাছাকাছি এসে স্পষ্ট হল পাহাড়শ্রেণি... ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে। চেকপোস্ট পেরিয়ে এরপর আমরা অরুণাচলে ঢুকব।

২৯ অক্টোবর। বেইলি ট্রেল দেখতে যাবার পেছনে একটা বক্তিগত কারণ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের যে কুশীলবদের অনুসরণ করে চলেছি আমি, তার একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করার ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে ছিল সুদূর সীমান্তের হাতছানি। নেফার দুর্গম অঞ্চলে অপরূপ বৈচিত্র্যে ভরা রহস্যময় অরণ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। পরে ভেরিয়ার এলুইন থেকে শুরু করে নানান মানুষের লেখা আর ওই অঞ্চলে নিত্যনতুন পাখপাখালি এমনকি ভাষা আবিষ্কারের সংবাদ সেই রহস্য ঘনিয়ে তুলেছে আরও। বলা যেতে পারে একান্ত নিজস্ব এক শাংগ্রিলার খোঁজে চলেছিলাম আমি, দুশো বছর ধরে লেখা হয়ে চলা একটি আখ্যানের শেষ অনুচ্ছেদের খোঁজে।

কিন্তু ভালুকপং ছাড়িয়ে যতই এগোতে লাগলাম অরুণাচলের ভেতর, ক্রমশ সেই শাংগ্রিলায় চিড় ধরতে লাগল, কল্পনার আখ্যান হারিয়ে গেল ভিন্ন এক আখ্যানের নীচে।

এ হল ভারত রাষ্ট্রের আখ্যান, যা লেখা হচ্ছে গ্রানাইট, ইস্পাত, ঢেউ-খেলানো টিন, কাঁটাতার, আর আলকাতরায় স্টেনসিল-কাটা অক্ষরে। বোড়ো জঙ্গি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আসাম রাইফেলস-এর যে সাঁজোয়া জিপটি আমাদের গাড়িগুলোকে এসকর্ট করে ভালুকপং পর্যন্ত এগিয়ে দিল, তার গায়ে লেখা ছিল Access to Justice For All। অরুণাচলে ঢোকার পর রাস্তা জুড়ে কেবলই আর্মির কনভয়, যেদিকে চোখ যায় শুধু সেনাপাহারা, বিভিন্ন রেজিমেন্টের ব্যারাক— ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে বিস্তৃত শ্যান্টিটাউন যেন, জলপাই রঙের টিন আর কাঁটাতারে তৈরি, ভেতরে দেখা যায় দীর্ঘদেহী শ্মশ্রুগুম্ফধারী উত্তরভারতের পুরুষ। চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে দেখা যায় কেয়ারি-করা লন, বাস্কেটবল কোর্ট, মন্দির। শত শত বছর ধরে যেখানে কামেং নদীর কলধ্বনি আর ঝিঁঝির তানে মিশত গোম্ফায় শিঙার নাদ, সেখানে এখন পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে লাউডস্পিকারে গায়ত্রী মন্ত্র আর ভজনের সুর। রাস্তার পাশে তৈরি হয়েছে এক ভিন্ন ধরনের মন্দির— বাষট্টির যুদ্ধে শহিদ সৈনিকদের স্মারক: মসৃণ

BanglaBook.org

গ্রানাইটে খোদাই করা নিহতদের নাম, আবেগদীপ্ত এপিটাফ। জুতো খুলে পরিপাটি ছাঁটা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে কল্পনা করাই মুশকিল পঞ্চাশ বছর আগে কেমন ছিল জায়গাটা, কীভাবে সঠিক তথ্য, উপযুক্ত অস্ত্র আর শীতের পোশাক ছাড়া নিরীহ জওয়ানেরা মরেছিল পতঙ্গের মতো। সেসব কথা অবশ্য লেখা নেই। কেবল পাথরে খোদাই হরফের ছাঁদে, ভারি আলঙ্কারিক ইংরেজিতে ফুটে আছে গলার শির-ফোলানো কুচকাওয়াজের আদেশের স্বর, দেশবাসীর উদ্দেশে: স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের এক মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক অধ্যায়ের সোচ্চার স্মারক।

আ নেশান ইজ আ ন্যারেশান। কে যেন বলেছিল কথাটা? পুরো পথটাই ছেয়ে আছে সরকারি নোটিশ স্লোগান আর সতর্কবাণীতে। রাস্তার প্রতিটি বাঁকে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশানের বাসি বাক-চটুলতা— Drive on horse power, not on rum power; কিংবা Let your insurance policy mature before you; কয়েকটি শালীনতার গা-ঘেঁষা— Darling, I like you but not so fast! অথবা, Be gentle on my curves; তবে রসবোধের শিরোপা পেতে পারে এইটি— Peep peep, Don't sleep! পাশেই রাস্তা জুড়ে অতন্দ্র অতিকায় আর্থমুভার।

রাস্তা চওড়া হচ্ছে। পাহাড় ফাটিয়ে, হাজার বছরের অরণ্যের আচ্ছাদন খুলে বেরিয়ে এসেছে ভঙ্গুর পাথরমাটির মাংস, ছিঁড়ে গিয়েছে ঝর্ণার শিরা, বাতাস ছেয়ে আছে ধুলোয়। দূরাগত পাথর ভাঙা যন্ত্রের শব্দে পাহাড়ি ঝিঁঝির করুণ প্যারোডি, তার সঙ্গে মেশে আকাশে সেনা হেলিকপ্টারের পাখার শব্দ। মাঝে মাঝে পথের ধারে একটি-দুটি অসহায় বিধ্বস্ত গ্রাম, ধূলিধূসর নারী ও শিশুরা জল টেনে আনছে অনেক দূরের ঝোরা থেকে; পাশের ঝর্ণাটি শুকিয়ে গিয়েছে। চেনা পাহাড়ি দৃশ্য, কিন্তু এখানে যেন প্রকৃতি আর মানুষের জীবন ভেতর থেকে উপড়ে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, দিনের আলোয় খুলে এসেছে সময়ের তন্তুজাল, নদীর বুকে ডিমের মতো নুড়িপাথরে বন্দি জীবাশ্মের স্তর ফেটে পড়ছে অবিরাম হাতুড়ির ঘায়ে।

ছেঁড়া মলিন পোশাক-জড়ানো শ্রমিক নারীপুরুষেরা এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে, পথের পাশে পিচের ড্রামের টিন দিয়ে তৈরি তাদের খুপরি ঘর, বিজন পাহাড়ের মাঝে খোলা আকাশের নীচে সংসার। জঙ্গলের গাছ কেটে পিচ গলিয়ে পাথর গরম করে আদিম পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে পাকা সড়ক। মাঝে মাঝে পথের বাঁকে কালভার্টের ধারে আর্মির আদলে সেনোটাফ: রাস্তা নির্মাণের সময় বর্ডার রোডসের কোনো জওয়ান কিংবা হাবিলদার মারা গিয়েছেন, তাঁর স্মারক। নামগোত্রহীন এই ঠিকা শ্রমিকেরা মারা গেলে অবশ্য কোনো স্মারক বসে না। এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে বড়ো ফলকে লেখা— In 2008 a fighter jet will land on this stretch of road! দু বছর ঘুরে গিয়েছে, কোনো যুদ্ধবিমান নামেনি, ধ্বস্ত পথ ঝোরার জলে ভেসে দইয়ের মতো পাতলা কাদার প্রবাহ। তার ওপর দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে পিছলে পার হতে হতে আমাদের গাড়ি বমডিলা পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। পরদিন থেমবাং।

থেমবাং-এ বেইলির বর্ণনার সেই গ্রাম খুঁজে পাইনি আমি, ডজন খানেক টিন আর কাঠের অনুল্লেখনীয় বসতি আর পাহাড়ের মাথায় দুর্গের ভগ্নস্তূপ দেখে মনে হয়নি এক রোমাঞ্চকর পথের শুরু। গত দুদিন ধরে পাহাড়ের অরণ্যপ্রকৃতি রাষ্ট্রের পরিকাঠামো নির্মাণে বলি হতে দেখে দেখে থেমবাঙে এসে মনে হল এক মজা খালের শেষ— সমতল থেকে ভেসে এসে জমেছে নাগরিক আবর্জনা: পুরোনো লজঝড়ে মোটরবাইক, বাতিল জিপ, এমপি-থ্রি প্লেয়ারে হিন্দি গান, সস্তা প্লাস্টিকসামগ্রী। রাস্তার পাশে বহু প্রাচীন মেন্ডং অনাদরে ভগ্নদশা: বাসাল্টে খোদাই ওম-মণি-পদ্মে-হুম অক্ষরের রং ফিকে হয়ে এসেছে, মাকড়শার জাল জড়িয়েছে, কুলুঙ্গির দীপাধারে কবেকার শুকনো বুনো ফুল— যেন শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

ওই চাহনি দেখেছি বমডিলার বাজারে একদল সুবেশ কর্মহীন যুবকের চোখে— সম্ভবত সরকারি প্রকল্পজীবী রাজনীতিক-কন্ট্রাক্টরদের সন্তান। একটি পানশালার বারান্দায় রেলিঙে পা তুলে বসেছিল ওরা, পায়ে দামি ব্র্যান্ডের জুতো, অলস তাকিয়েছিল রাস্তার চলমান দৃশ্যে। ভেতরে একটি আলোকিত পুল টেবিল ঘিরে আরও কয়েকজন, অন্ধকারের ভেতর তাদের ভাবলেশহীন মুখগুলো ভেসে আছে কেবল। কাঠের বলে ঠোকাঠুকির শব্দ হচ্ছিল।

৩০ অক্টোবর। আজ সেমনাক হয়ে লাগাম, ন হাজার ফুট।

সম্ভবত উচ্চতার জন্যই, রাতে তাঁবুতে শুয়ে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে উঠেছে বমডিলায় আসার পথে দেখা টুকরো টুকরো ছবি। কালভার্টের ধারে এক তরুণ শিখ জওয়ানকে দেখেছিলাম, হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, নির্নিমেষ প্রহরায় তাকিয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে। পাতা ঝরছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। আরেকটি ছবি: নির্জন পথের বাঁকে রাস্তা তৈরির ঠিকাশ্রমিকের ছাউনিতে শিশু কাঁখে নিয়ে সম্পূর্ণ একা এক নারী, আমাদের গাড়ির দিকে তাকাতে চোখাচোখি হয়েছিল এক ঝলক। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছিল, সামনে হিমশীতল রাত। মেয়েটির অতল ছমছমে চাহনি আমার আচ্ছন্নতা ফর্দাফাঁই করেছে সারারাত।

সকালবেলায় গাইড নিমদেন এসে জানাল, সেও নাকি রাতে ঘুমোতে পারেনি। হয়তো কেউ পেঁয়াজের খোসা কিংবা প্লাস্টিক পুড়িয়েছিল ; জঙ্গলের ভেতর কটু পোড়া গন্ধের টানে অপদেবতারা আসে। সারারাত ধরে তাঁবুর খুঁটি নাড়িয়েছে তারা।

প্রাণোচ্ছল যুবক নিমদেন মোনপা জনজাতির। চারটি ভাষা জানে। ভারতীয় সেনা অফিসার থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ট্রেকারদের নিয়ে একাধিক কঠিন অভিযান করেছে সে, আলাপের পরে সবিস্তারে জানিয়েছে সেকথা। ওকে দেখে আমার কেবল ফুরচুঙের কথা মনে পড়ে যায়।

গাড়ির পাকা রাস্তা শেষ হয়েছে থেমবাঙে। তারপরেও একটা চওড়া মাটির পথ গুনথুং ও পাংমা নামে ছোটো ছোটো গ্রাম ছুঁয়ে গিয়েছে। মেষপালকদের গ্রাম, জঙ্গলের

BanglaBook.org

ধারে সামান্য জমিতে চাষ হয়েছে। ঘরের চালে উজ্জ্বল বর্ণের লঙ্কা শুকোচ্ছে। এছাড়া অ্যানিসিডের মতো একধরনের বুনো পাঁচশিরা ফল, শুকোলে আপনা থেকেই শব্দ করে ফেটে যায়। একটি কুঁড়ের উঠোনে দড়িতে মেলা নুডলের মতো সরু মাংসের ফালি শুকোতে দেখলাম। মেয়েদের নাকে কানে ভারি পেতলের গয়না, মাথায় উঁচু করে জড়ানো কাপড়। পুরুষদের লম্বা ঝুঁটি-বাঁধা চুল, কোমরে কাঠের খাপে গোঁজা সরু ভোজালি। সকলেই মোনপা। পর্যটকদের প্রতি উদাসীন, যে যার মতো কাজ করে যায় তারা— ভুট্টাদানা ছাড়ায়, কাঠের হামানদিস্তায় কোটে, বাঁশের লম্বা ফালি দিয়ে দরমার দেয়াল বোনে। চারটি করে ফালির পর একটি করে টানা দেওয়া বুননের নকশাটা চেনা, বাংলার গ্রামে দেখেছি।

একটি ছোট্ট প্রাইমারি ইস্কুল রয়েছে পাংমায়। সেমনাক-এ একটি প্রাচীন কাঠের গোম্ফা, তারপরেই পথ উঠেছে চড়াই বেয়ে। গ্রামের শেষে ঘন জঙ্গলের নীচে একটেরে পাতায়-ছাওয়া কুঁড়ে উঁচু বাঁশের পায়ে খাড়া, অনেকটা পাখির বাসার মতো। গাছের গুঁড়িতে খাঁজকাটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। নীচে শুয়োরের খোঁয়াড়, ওপরে ঝুলবারান্দায় শুয়ে আছে কালো ভাল্লুকের মতো এক তিব্বতি ম্যাস্টিফ। সামনে এক চিলতে বন কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে সদ্য, ডালপালাগুলো সরানো হয়নি। আমাদের পায়ের শব্দে কুকুরটা চাপা গররর গররর শব্দ করতে থাকে, ঝাঁকড়া লোমের নীচে চোখ দেখা যায় না। সেই শব্দে বেরিয়ে আসে এক স্বাস্থ্যবতী নারী, কাঁধে পঞ্চের মতো এক টুকরো লাল কাপড়, পা দুটি উরুর নীচে অনাবৃত। অদ্ভুত আয়ত চোখে তাকায় আমাদের দিকে।

অবিকল এই দৃশ্য কোথায় যেন দেখেছি? এই মুহূর্তের ভেতর কোথায় যেন বেঁচেছি?

আচমকা মেঘ-ছেঁড়া আলোর মতো মনে পড়ে যায়! ঠিক এমনই এক দৃশ্যের বর্ণনা পড়েছি জর্জ বোগলের লেখায়। কুচবিহার থেকে ভুটান রাজ্যে প্রবেশের পর ঠিক এমনই এক কুঁড়েয় রাতের আশ্রয় নিয়েছিলেন, মোড়লের ঘরে। সেখানে ছিল এক ব্যাপারী নারী ; তার পরণে একটিমাত্র পশমি চাদর কাঁধে রুপোর পিন দিয়ে আঁটা, সুগঠিত দাঁত, চোখদুটো রুবেন্সের স্ত্রীর মতো— বোগল লিখেছেন।

ইংল্যান্ডের কোনো গ্রামে সিন্দুকের ভেতর ধূলিধূসর কাগজপত্রের ভিড়ে হারিয়েছিল এই ছবি, অক্ষরচিহ্নে আঁকা। একশো বছর পরে সেটি ভেসে উঠেছে এক বাঙালি যুবকের কল্পনায়। তারও একশো বছর পরে আবার জীবন্ত হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। ভারতবর্ষের অচেনা প্রত্যন্ত প্রান্তে আসার অনুভূতিটা সরে যায়, মনে হয় যেন চেতনার এক অজানা কেন্দ্রে এসে পৌঁছলাম।

৩১ অক্টোবর। সাড়ে দশ হাজার ফুটে চমরিপালকদের গ্রাম ঠুংরি লাগাম থেকে একদিনের পথ। ছোট্ট বসতিটা ছাড়িয়ে এগোতে পাথরে ঘেরা ছোটো ছোটো ঝুম চাষের জমি, রাতপাহারার মাচা, তারপরেই শুরু হচ্ছে বার্চ জাতীয় মহীরুহের ঘন জঙ্গল— আর্দ্র,

BanglaBook.org

আদিম। এক অদ্ভুত বনগন্ধী ছায়া গিলে নেয় আমাদের। উঁচু ফার্নের পাতায় জমা শিশির টুপটাপ ঝরে মাথার ওপর, পায়ের নীচে বহু ঋতু ধরে ঝরে পড়া পচা পাতায় কালো সারমাটিতে গোড়ালি ডুবে যায়। পায়ের শব্দ নেই, কেবল নিজের শ্বাসাঘাতের শব্দ আর এক অদ্ভুত ধাতব পতঙ্গের স্বর। পাখি নেই।

—এখন পাখির সিজন নয়, নিমদেন জানায়। বনের ভেতর যেখানে সূর্যের আলো ঢোকে সেখানে প্রজাপতি দেখা যাবে।

ওপর দিকে ওঠার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। খুব ভোরে আমরা তৈরি হয়ে ওঠার আগেই তাঁবু আর মালপত্র খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে রওয়ানা দিয়েছিল কুলিদের দল। তাদের পায়ের ছাপ আর টাটকা খচ্চরবিষ্ঠার চিহ্ন ধরে এগোতে থাকি। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর দেখা মেলেঃ নিঃশব্দে, সামনে ঝুঁকে চলেছে কুলিরা, তাদের পিঠের বোঝায় বাঁধা চওড়া ফিতে কপালে হুডের মতো হয়েছে। পাতার ফাঁক দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লমের মতো সূর্যালোক এসে ঢুকছে ঘন সবুজের ভেতর, গিঁথে যাচ্ছে খচ্চরদের বাদামি ঘাড়ে। প্রাণীদুটির নাকমুখ দিয়ে শ্বাসবাষ্প বেরোচ্ছে, অস্থির লেজের নীচে উরুতে জোঁকের কামড় থেকে রক্ত ঝরছে। যেন কোনো রেনেসাঁস শিল্পীর আঁকা সঘন তৈলচিত্র মনে হয়।

গাড়োয়াল কুমায়ুনের ট্রেকপথে গ্রামগুলো বেশিরভাগ হয় পাহাড়ের কোলে কিংবা কাঁধের দিকে। সেইমত পথও পাহাড়ের গা কেটে এঁকেবেঁকে চলে। এখানে তেমন নয়। বেইলি ট্রেল চলেছে পাহাড়ের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে ওঠা নামা করতে করতে। গ্রামগুলোও সব ওপরের দিকে।

ক্রমশ বৃষ্টিস্নাত বন ছেড়ে আমরা ওপরের দিকে উঠে এলাম। বারো হাজার ফুটের ওপর বিস্তীর্ণ ঢেউখেলানো ঘাসজমি। স্থানীয় ভাষায় এগুলি হল চৌরিখাং, অর্থাৎ চমরি চরাবার স্থান। মাঝে মাঝে দুটো একটা বড়ো গাছ, বাজপড়া কিংবা ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। আকাশে চক্রাকারে উড়ছে ঈগল, নীচে গভীর খাত ঢেকে আছে কালো জঙ্গলে। গিরিশিরার বাঁকে চুড়ো করে সাজানো পাথর, দূর থেকে দেখে মনে হয় ধর্মীয় স্মারক।

—ওগুলো কেআর্ন, পাশাং জানাল। এই এলাকা দিয়ে যাবার সময় বেইলি সাহেবরা এভাবে পাহাড় দাগিয়ে রেখেছিল। সেই থেকেই আছে। আর্মি পেট্রল ওই কেআর্নগুলো দেখে দিক ঠিক করে। এখান থেকে বর্ডার খুব দূরে নয়, আকাশ পরিষ্কার থাকলে তিব্বতের পাহাড় দেখা যায়।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার নয়। বেলা বাড়ার পর থেকে খাদের গর্ভ থেকে মেঘ উঠে ঢেকে গিয়েছে দূরের পাহাড়শ্রেণি, সেইসঙ্গে আবিল কুয়াশা। ঠুংরির কাছাকাছি পৌঁছতে আলো কমে এসে মনে হল দিন ফুরিয়ে আসছে, যদিও ঘড়িতে বাজে আড়াইটে। দেশের পূর্বপ্রান্তে ঘড়ির সময়ের কথা মাথায় রেখেও হিসেব মেলানো যায় না। ধূসর জমাট লাভাস্তরের মতো মেঘ জমতে থাকে স্তরে স্তরে। মরা আলোয় ন্যাড়া পাহাড়ের কোলে ঠুংরি গ্রামটা আরও বিজন আর বিষণ্ণ দেখায়।

BanglaBook.org

শরতের শেষ, শীত আসছে। পাথরের নীচু কুঁড়েঘরে চালের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠছে, নীচের বন থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে এনে উঠোনে ডাঁই করছে পুরুষেরা। পশমের ভারি গাউনের মতো পোশাকপরা তিন নারী, সম্ভবত একই পরিবারের, চৌরিখাঙে এসে ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপড়ে বিচিত্র উলুধ্বনির মতো শব্দ করে চমরিগুলোকে ডাকছে।

১ নভেম্বর। কাল বিকেলের আকাশ দেখে ছায়া ঘনিয়েছিল নিমদেনের মুখে। কারণটা বোঝা গেল দুপুরের কিছু আগেই। থকথকে লাভার মতো আকাশ গলতে শুরু করল যেন, সেই সঙ্গে তীব্র হাওয়ার দাপট। আমার মনে পড়ে যায় বোগতো-লার চড়াই পার হবার সময় শরৎচন্দ্র দাসের বর্ণনা: আকাশে মেঘের পাল ছুটেছে বুনো চমরির মতো, এত নীচু দিয়ে বুঝি হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে। তারপরে শুরু হল তুষারপাত।

ঠুংরি থেকে কঠিন চড়াই বেয়ে দু হাজার ফুট উঠে চাংলা। উদ্ভিদরেখা শেষ হয়েছে এখানে। চারিদিকে ন্যাড়া পাথর, গোছা গোছা হলুদ ঘাস আর দু'একটা খর্বাকৃতি জুনিপার। পথে গুহা কিংবা ঝুলন্ত চাঙড়ের আড়াল নেই কোথাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে মৃত পাখির পালকের মতো ঝরে পড়া বরফে সাদা হয়ে গেল চারদিক। আমরা একটা পরিত্যক্ত আর্মি বাঙ্কারে আশ্রয় নিলাম।

তুষারপাত নিয়ে সাধারণভাবে যে রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস মনে জড়িয়ে থাকে, তার সঙ্গে চোদ্দো হাজার ফুট উঁচুতে আশ্রয়হীন, উপযুক্ত সরঞ্জামহীন আটকে পড়ার অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই। নীচের বন ছেড়ে ক্রমশ ওপর দিকে ওঠার সময়ই দেখা যাচ্ছিল, পাহাড়ের খাঁজে পাথরে নির্মিত লম্বাটে গর্তের মতো বাঙ্কার। বাষট্টির চিন-ভারত যুদ্ধের সময় তড়িঘড়ি বানানো হয়েছিল। ভেতরে হাঁটু ভাঁজ করে শরীর বাঁকিয়ে বসতে হয়, বুকের কাছে বন্দুক গলাবার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। মেঝেয় ভেড়ার নাদি, গুটখার প্যাকেট, আগুন জ্বালার চিহ্ন রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ জমে ঘুলঘুলিগুলো ঢেকে এল।

এরই মধ্যে সামনের পাহাড়ে চমরিপালকদের ছাউনি থেকে দুঃসংবাদ বয়ে আনল নিমদেন। গত তিনদিনে ভারি তুষারপাতে কোমর সমান বরফ জমেছে পোশিং-লায়। এদিকে পোশিং-লা পাস ডিঙিয়ে পোটা লাপ মাগো হয়ে বেইলি ট্রেল গিয়েছে ম্যাকমাহন লাইনের দিকে।

নভেম্বরের শুরু, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শীতের আবহাওয়া শুরু হয়নি এখনও। এই তুষারপাত বিচ্ছিন্ন দুর্যোগ হতে পারে, এই অঞ্চলে প্রায়ই যেমন হয়। হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। কিন্তু যদি না হয়? যদি এবার শীত শুরু হয়ে যায় আগেই? বরফে চলার মতো জুতো, কুঠার কিছুই আমাদের সঙ্গে নেই। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে রসদেও টান পড়বে। কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না নিমদেন দোর্জি ও থেমবাঙের কুলি সর্দার। অথচ আমাদের এতদূরে আসার উদ্দেশ্যই হল বেইলি ট্রেল ধরে

BanglaBook.org

যাত্রাসূচি সম্পূর্ণ করা। একদিকে ওরা, অন্যদিকে আমাদের দলে পাঁচজন, জল্পনা গড়িয়ে চলে বাদানুবাদে। নিজেদের ভাষায় ওরা কীসব সংবাদ বিনিময় করে বুঝতে পারি না। বমডিলায় পর্যটন সংস্থার মালিকের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু সিগন্যাল পাওয়া যায় না। চিন সীমান্তের এত কাছে সে আশাও নেই।

এসবের মধ্যেই পোর্টারদের মধ্যে থেকে একজন বাঙ্কারের এক কোণে প্রাইমাস স্টোভ জ্বেলে সসপ্যানে বরফের ফলা ভেঙে এনে বসিয়ে দিল, তার মধ্যে উপুড় করে দিল স্যুপের প্যাকেট। চমরিপালকদের বসতি থেকে টাটকা নরম চিজ এনেছিল নিমদেন।

ইতিমধ্যে তুষারপাত থেমে গিয়েছে। আকাশে মেঘের স্তর চুঁইয়ে একটা পলকা গোলাপি আলো এসে পড়েছে বরফে ঢাকা চরাচরে। অদ্ভুত রূপ খুলেছে পাহাড়ের। হাওয়া থেমে যাওয়ায় শীতের কামড় অনুভব হচ্ছে না তেমন। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসে দেখি খাড়া ঝুলন্ত একটি পাথরের নীচে পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে রয়েছে খচ্চর দুটো, আর দড়ি ধরে তাদের মাঝে উবু হয়ে বসে আছে এক কুলি। লোকটার মুখে অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় না বালক নাকি জড়বুদ্ধি— পরনে একটি হাতবদল শতচ্ছিন্ন জ্যাকেট, পায়ে নীল প্লাস্টিকের জুতো, বরফের গুঁড়ো লেগে রয়েছে ওর ঝাঁকড়া চুলে আর ভুরুতে। খচ্চরগুলোর পিছনের পায়ের কাছে শরীরটা সেঁধিয়ে বসে আছে লোকটা, সম্ভবত একটু উত্তাপের আশায়। বাধ্য প্রাণীদুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো, পিঠে মালের বোঝা, পায়ের নীচে সোনালি ধূমায়িত তরলে বরফ গলে দিনশেষের আলো পড়ে চিকচিক করছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উনিশ

পৃথিবীর শেষ দশ মাইল

নামচে বারোয়া আর গ্যালা পেরি শৃঙ্গের মাঝে গিরিখাত দিয়ে বয়ে চলে সাংপোই যে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় আর ছিল না। তবু বেইলিরা ফিরে আসার পরে অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছিল দশ মাইল এলাকা: খাড়া গহীন পাথরের খাত, আদিম সরীসৃপের আঁশের মতো, আঁধার নিশ্ছিদ্র বন আর অপার বিক্রমে আছড়ে নামা, ফুঁসে ওঠা ধূমায়িত জলরাশি। কোনো মনুষ্য বসতি নেই সেখানে, কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। পৃথিবীর শেষ অজানা দশ মাইল।

ইতিমধ্যে নীল নদের উৎস থেকে শুরু করে দুই মেরু অঞ্চলে কোথাও তেমন কোনো বড়ো অভিযান বাকি নেই আর। একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তারুণ্যের উদ্দীপনা হারিয়েছে। এরই মধ্যে একদিন জর্জ ম্যালরি এক সঙ্গীকে নিয়ে এভারেস্টের শিখরের দিকে হাঁটা দিলেন। আর ফিরলেন না।

দিনটা ছিল ৮ জুন, ১৯২৪।

সেই বছর এরিক বেইলিদের ছেড়ে আসা সাংপো গিরিখাতের শেষ দশ মাইলের টানে এলেন এক ইংরেজ শিকারি। বন্দুক নয়, মাইক্রোস্কোপ পার্চমেন্ট ও নানা ধরনের বাক্স বয়ামে সজ্জিত এক ভিন্ন জাতের শিকারি— যাদের বলে প্ল্যান্ট হান্টার। নাম তাঁর ফ্র্যাঙ্ক কিংডন ওয়ার্ড। ৩৯ বছর বয়সী ছোটোখাটো চেহারার মানুষটি ততদিনে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত উদ্ভিদ সংগ্রহকারী। হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি নিয়ে আসেন অচিন সব ফুলের গাছ— নানান জাতের রডোডেনড্রন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির প্রিমুলা লিলি ইত্যাদি, সাজিয়ে তোলেন ইংল্যান্ডের বাগিচা। এইসব অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর সঙ্গী বলতে এক বিশ্বস্ত বর্মী ভৃত্য ও একটি তিব্বতি কুকুর। নাম তার আহ-পোহ। দুর্গম পথে পাহাড়ি বসতিতে আহার্য যেমন জোটে খান, কৃচিৎ শিকার করেন বনের পাখপাখালি।

জীবন্ত গাছ যেহেতু সুদূর বিলেতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে একটি সমস্যা হল, যখন ফুলের মরশুম, তখন বীজ থাকে না। বীজ আসে তার পরে। দার্জিলিঙের সেই কিন্টুপের মতো কিংডন ওয়ার্ডের ছিল এক আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। বনেজঙ্গলে অজানা ফুলের গাছ প্রথম দর্শনে স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যেত তাঁর, বীজের মরশুমে সেগুলিকে ঠিক খুঁজে বের করতেন, কখনো কয়েক

BanglaBook.org

ফুট বরফের নীচে থেকে। এজন্য দুর্গম অরণ্য পাহাড়ে তাঁকে কাটাতে হতো মাসের পর মাস। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন: হিংস্র জনজাতির কবলে পড়ে বাঁশের বল্লমে বিদ্ধ হয়েছেন, গভীর খাদে পা পিছলে পড়ে গাছের শিকড় আঁকড়ে বেঁচেছেন, বনের মধ্যে পথ হারিয়ে তিনদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে প্রাণে বেঁচেছেন, এমনকি ১৯৫০ সালে বিধ্বংসী আসাম ভূমিকম্পের কবলেও পড়েছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক উপন্যাসের সেই যুগলপ্রসাদ নামের চরিত্রটির কথা মনে পড়তে পারে। সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে বনে বনে ঘুরে ফুলের গাছ সংগ্রহ করত সেই অদ্ভুত রোম্যান্টিক মানুষটি। কিন্তু কিংডন ওয়ার্ড ছিলেন আপাদমস্তক এক পেশাদার উদ্ভিদবিদ। বিশ শতকের গোড়ায় এই অ্যাডভেঞ্চারটিরও বাণিজ্যকরণ হয়েছে। তাঁর এইসব অভিযানে আর্থিক সহায়তা যোগাত ইংল্যান্ড ও আমেরিকার কয়েকটি বিখ্যাত নার্সারি। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটেনের অভিজাতরা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯২৪ সালে সাংপো গিরিখাতের রহস্যে ঘেরা শেষ দশ মাইল অনুসন্ধান করতে এলেন যখন, ততদিনে পূর্ব হিমালয়ের গাছপালা ও ভূপ্রকৃতি তাঁর করতলগত আমলকী। এরপরেও এইসব অঞ্চলে অসংখ্য অভিযান করবেন তিনি (সব মিলিয়ে ২৪টি), ব্রিটিশ সরকারের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করবেন তিব্বত অঞ্চলে, বই লিখবেন ১৫টি, সারা জীবনে ২৩ হাজার অজানা দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির উদ্ভিদ সংগ্রহ করবেন।

এই অভিযানে নিশিডাকের মতো তাঁকে হাতছানি দিল, কোনো নতুন ফুলের গাছ নয়, এক রহস্যনদীর শেষ অজানা দশ মাইল। এবং একটি প্রবাদপ্রতিম ঝর্ণা।

পেমাকো উপত্যকায় কিন্টুপের দেখা সেই জলপ্রপাতের বর্ণনা ভাষান্তরের সময় যে বিকৃতি ঘটেছিল, বেইলিরা ফিরে আসার পর তার নিরসন হয়। কিন্তু পূর্ব হিমালয়ে উদ্ভিদ সংগ্রহে গিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ি বসতিতে সাংপো গিরিখাতে এক লুকোনো প্রপাতের কথা শুনেছিলেন কিংডন ওয়ার্ড। তিব্বতি ও লোপা লোককাহিনির ভেতর দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রবহমান এক জলধারার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই টানে ফিরলেন আবার।

সবুজ প্রশান্ত বন, মৃদু তরঙ্গায়িত জলরাশি, দূর সমতলে মসৃণ পর্বতমালার ঢেউ দেখে আনন্দে কখনো প্রায় কেঁদে উঠেছি আমি— লিখছেন কিংডন ওয়ার্ড— এখন ফের সেই আনন্দ বুকে নিয়ে আমি বরফাবৃত পর্বত আর ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যকে স্বাগত জানালাম।[২]

কিন্তু সাংপো গিরিখাত তাঁকে ফিরিয়ে দিল। অন্তিম দশ মাইলে বেশ কয়েকটি দুরূহ র‍্যাপিড আর ঝর্ণা পার হয়েও শেষপর্যন্ত হার মানলেন কিংডন ওয়ার্ড। লোককাহিনির জলপ্রপাত অধরাই রয়ে গেল।

তবু এই অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল বলা যাবে না। রংচু উপত্যকায় যে অচেনা ফুলের সমারোহ দেখে এরিক বেইলির মনে হয়েছিল ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির পাখার কাঁপন, তার বীজ সংগ্রহ হবে। সেই নভোনীল রেশমি পাপড়ির ফুল,

BanglaBook.org

meconopsis baileyi, প্রবল জনপ্রিয় হবে বিলিত উদ্যানপ্রেমীদের মধ্যে। একটি ফুলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে যাবে এক ব্রিটিশ আর্মি অফিসারের নাম।

তবে সেইসময় এরিক বেইলির উজ্জ্বল কীর্তি হয়ে উঠেছিল একটি সীমান্তরেখা— ম্যাকমাহন লাইন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য তখন মাঝ আকাশে, দুই গোলার্ধে ছড়িয়ে আছে তার আলো। সীমান্ত শব্দটির মধ্যে যে একটি ছেদের ধারণা আছে, ফ্রন্টিয়ার শব্দে তার বদলে রয়েছে সম্মুখের হাতছানি। এই সম্মুখগামিতার প্রতিশ্রুতির ওপরেই দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প।

একশো বছর পরে সেই প্রকল্পের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার হাড়গোড় দিয়ে তৈরি হয়েছে যে নতুন রাষ্ট্র, তার গায়ে ফাটল ধরেছে, জীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্টুপ কিংবা শরৎ দাসের মতো এরিক বেইলিও চেপে বসেছেন ইতিহাসের পরিত্যক্ত নৌকোয়।

সমাপ্ত

পোশিং-লায় নতুন করে আর তুষারপাত হয়নি। কিন্তু আমাদের যাত্রাসূচি মাঝপথে বাতিল করে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত হল। একটি পরিত্যক্ত সেনাটহলের পথ ধরে ভোরবেলা হাঁটা শুরু করে সন্ধ্যার আগে ১৮ কিলোমিটার দূরে চান্দের গ্রামে এসে পৌঁছলাম। বেইলি ট্রেল ঢাকা পড়েছিল বিস্মৃতির মতো বরফে, আদিগন্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাদা আর ধূসরের মাঝে আলাদা করে চেনা যায় না। রাতে অপরিসর বাঙ্কারের ভেতর গুটিসুটি অবস্থায় ঘুম হয়নি কারোরই, কিন্তু সেজন্য কোনো ক্লান্তি ছিল না ; হয়তো পদে পদে বিপদের আশঙ্কা ছিল বলেই। এমনিতে টাটকা নরম বরফে গোড়ালি পর্যন্ত গিঁথে চলায় তেমন অসুবিধা নেই, কিন্তু যেখানে বরফ গলে শক্ত হয়ে গিয়েছে সেখানেই রাবার সোলের জুতোয় হড়কে যাবার ভয়। পুরো পথটা ক্রমাগত উৎরাই বেয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। পা ফসকালে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ, উদ্ভিদরেখার ওপরে খামচে ধরার মতোও কিছু নেই।

বরফের ভেতর লাঠি গিঁথে আমাদের পথ দেখিয়ে চলছিল নিমদেন। এদিকে প্লাস্টিকের পাতলা গামবুটের মতো জুতো পরে পিঠে ভারি মাল নিয়ে কুলিরা নেমে যাচ্ছিল দ্রুত পদে, এক অনায়াস দক্ষতায় যা রক্তের ভেতরে প্রবাহিত। খচ্চর দুটিও যাকে বলে সিওর-ফুটেড, বিচিত্র ভঙ্গিতে সামনের পায়ে বরফ সরিয়ে ঠিক সেই জায়গায় পেছনের পা ফেলে এঁকেবেঁকে নামছিল।

উঁচু পাহাড়ের ঢালে বড়ো বড়ো কয়েকটি চৌরিখাং, গাড়োয়াল অঞ্চলে যাকে বলে বুগিয়াল— চওড়া তৃণভূমির ওপর ছড়ানো ছোটোবড়ো বোল্ডার, সবই বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে প্রাচীন গাছের গুঁড়ি শলাকার মতো জেগে আছে। হয়তো কোনো কালে অরণ্য ছিল।

BanglaBook.org

—বাষট্টিতে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় জবরদস্ত লড়াই হয়েছিল এই জায়গায়, নিমদেন জানাল। চান্দেরের জিবি এক্স-আর্মিম্যান, ওর কাছে সেই সময়ের গল্প শুনতে পাবে।

বিস্তৃত সাদা হিম তুষার, অনাবৃত গ্রানাইট, কালো কাঠকয়লার মতো গাছের কাণ্ডে প্রাচীন বৃক্ষের আঁশ, ফাঁকে ফাঁকে শক্ত কাঁটাঝোপ। আচমকা মনে পড়ে যায় তাওয়াং-বমডিলার পথে সেনাবাহিনীর সৌধগুলো, তাদের গায়ে খোদাই করা এপিটাফ। মানুষের জীবন যে কত পলকা আর অকিঞ্চিৎকর, এই রিক্ত হিম অসীমের মাঝে মৃত্যু তাকে প্রমাণ করেছে। সে কথা লিখে রাখার মতো কোনো ভাষা রাষ্ট্রের নেই অবশ্য।

দশ হাজার ফুটে নেমে আসার পর ক্রমশ বেঁটে গাছ আর ঝোপঝাড়, একটি নিষ্পত্র ফারের ডালে গুঁড়ো তুহিন জমে জমে হাওয়ার ভাস্কর্য— ঠিক যেন অসংখ্য তুষারের পতাকা স্থির হয়ে আছে।

মাঝপথে সফর বাতিল হওয়ায় স্বভাবতই মন ভারি হয়েছিল আমাদের। সেটা আঁচ করেই বোধহয় নিমদেন ওর জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনাচ্ছিল চলার পথে। মোনপাদের মধ্যে মৃত্যুর পর এক অদ্ভুত লোকাচারের কথা জানা গেল। এমনিতে বৌদ্ধ হলেও কিছু কিছু প্রাচীন আচার ওদের সমাজে রয়ে গিয়েছে আজও। মৃতদের সাধারণভাবে কবর দেওয়া হয়, কিন্তু কখনো কখনো শবদেহ কেটে ১০৮ টি খণ্ড করে নদীতে ভাসিয়ে দেবার রীতি প্রচলিত আছে। তিথিনক্ষত্র দেখে সেটা ঠিক করে গ্রামের পুরোহিত। দেহ সৎকারের এই কাজ করার লোক আছে ওদের সমাজে। একবার নিমদেনের গ্রামে ওর এক বাল্যবন্ধু মারা যাবার পর পুরোহিত সলিল সমাধির নিদান দিল। এদিকে শবদেহ যে কাটে সেই লোকটি কী এক কাজে গিয়েছে শহরে। পাহাড়ের খাঁজে বিচ্ছিন্ন গ্রাম, শহর দুদিনের পথ। মৃতদেহে পচন ধরতে শুরু হল। অগত্যা নিমদেন এগিয়ে আসে। ছেলেবেলা থেকে অনেকবার দেখেছে সে, কাজটা এমন কিছু কঠিন মনে হয়নি। কিন্তু তারপর থেকে খিদে-ঘুম চলে গিয়েছিল তার, উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল, পরিচিত মানুষ দেখলে তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করত। এভাবে প্রায় একবছর কাটে।

ন হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের একটি শিরার প্রান্তে চান্দের গ্রাম। আর্মির ট্রাক চলার উপযোগী একটি কাঁচা রাস্তা এসে শেষ হয়েছে এখানে। তিনদিকে ঘাসে ছাওয়া চৌরিখাং ঢেউয়ের মতো নেমে গিয়েছে উপত্যকায়, ঘন বন নীচের দিকে, দূরে পাহাড়শ্রেণি— গোরিচেন, কাংতো, নাগিখাংসাং ও অন্যান্য খ্যাত-অখ্যাত তুষারশৃঙ্গ। আবহাওয়ার কারণে আমরা অবশ্য তাদের দেখতে পাইনি, মনে হচ্ছিল কুয়াশার দেশে শূন্যে ঝুলে আছি। কিন্তু স্বচ্ছ দিনে তিনদিকের দিগন্ত জুড়ে দৃশ্যটা কেমন হবে, তার একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল।

—সমতল থেকে অনেকটাই দূরে তাই রক্ষে, না হলে এখানেও সাহেবরা একটা দার্জিলিং বা শিলং বানিয়ে তুলত। এক বন্ধু বললেন।

BanglaBook.org

খান বিশেক ঘর নিয়ে তিব্বতি মোনপাদের গ্রাম চান্দের। সকলেই পশুপালনে যুক্ত। বাড়িগুলো কাঠ আর বাঁশের। দুটি দোতলা বাড়ির চালে আর ঝুলবারান্দায় কাঠের কারুকাজে প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন রয়েছে। পাহাড়টা সরু হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটি সাদা চোর্তেন। গ্রামের প্রান্তে রয়েছে সরকারি ইয়াক ব্রিডিং ফার্ম— দেখে মনে হয় যেন পরিত্যক্ত। একপাশে একটি ডানাভাঙা উইন্ডমিল— বিকল্প বিদ্যুতের পরিকল্পনা হয়েছিল কখনো। একটি পাকা ইস্কুলবাড়ি রয়েছে, সেটিও ব্যবহার হয় না বহুদিন। কাঠের জানলা-দরোজা পচে খুলে এসেছে।

ইস্কুলের সামনে সমতল চাতালে আমাদের তাঁবু টাঙানো হচ্ছিল। কুলিদের কাজে তদারকি করছিলেন একজন বয়স্ক মানুষ, পরনে বহু পুরোনো জলপাই-রঙা ওভারকোট, ভেড়ার চামড়ার কান-ঢাকা টুপি মাথায়। আমাদের আসতে দেখে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন:

—ওয়েলকাম টু আওয়ার ভিলেজ!

জানা গেল ইনিই শাঙ্গে দোরজি, জিবি, যাঁর কথা আমাদের বলেছিল নিমদেন। ওভারকোটে বুকের কাছে আসাম সার্ভিস কোর-এর লোগো, কাঁধ সোজা করে দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর আদবকায়দায় অতীত পরিচয় অটুট রয়েছে। তবু সময় ছাপ ফেলেছে দেহে; চোখের দুপাশে হিজিবিজি বলিরেখা যেন পাখির বাসা, তার মাঝে ডিমের মতো স্ফীত পাতার নীচে খুব সরু দুটি চোখ।

চোখের পাতা কাঁপিয়ে দুঃসংবাদ দিলেন শাঙ্গে দোরজি: গত কয়েকদিন ধরে ভারি তুষারপাত হয়েছে নীচের জঙ্গলে। সব পথ বন্ধ।

ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রেক পথ নেমেছে মাটি উপত্যকায়, সেখান থেকে নদীর পাড় ধরে দিরাঙের রাস্তা। কিন্তু কোমর-জোরা বরফ ঠেলে নীচে নামা অসম্ভব, পথ কবে খুলবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

একে অসম্পূর্ণ সফর, তাতে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ফিরতি পথে এভাবে আটকে পড়া— আমাদের মুখচোখের অবস্থা দেখে নিমদেন আশ্বস্ত করে:

—চিন্তার কিছু নেই, তেমন পরিস্থিতি হলে আর্মির ট্রাকে ফিরে যাওয়া যাবে দিরাং।

ওর কথায় সায় দেন শাঙ্গে দোরজিও। এই পথে কখনো-সখনো আর্মির টহলদারি ট্রাক আসে, ভারি তুষারপাতে গ্রামের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে সাহায্যও মেলে। তবে নীচের দিকে ঢালে বরফ গলে নেমে যেতে বেশি সময় লাগবে না, ভাঙা হিন্দিতে জানান শাঙ্গে।

ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরাও সম্মত হন। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলে ঢালের কোনদিকে বরফ কীভাবে গলবে, কোনদিকে চলার পথগুলো প্রথম খুলে যাবে, সে কথা সবিস্তারে আলোচনা করেন তাঁরা নিজেদের ভাষায়। গত দুদিনে নতুন করে আর তুষারপাত হয়নি এদিকটায়।

BanglaBook.org

বরফ পড়েনি, কিন্তু খোলা পাহাড়ের মাথায় হাওয়া চলেছে একটানা— ছুরির মতো তীক্ষ্ণ আর কনকনে।

আমাদের কথাগুলো শ্বাসবাষ্পের সঙ্গে উড়ে ছড়িয়ে যায়, কানের কাছে মুখ এনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে হয়। ফাঁকা ইস্কুল বাড়িটায় শোঁ শোঁ শব্দ হয়, ডানাভাঙা উইন্ডমিল থর থর করে কাঁপে, মনে হয় যেন মাটি থেকে উপড়ে উড়ে যাবে। আমাদের দলের লোকজন আর জনাকয় গ্রাম্য বয়স্ক ছাড়া বসতিতে প্রাণের চিহ্ন দেখা যায় না। চারদিক রিক্ত, নিথর।

মেষপালক

আর্মি ট্রাক আসেনি। চান্দের গ্রামে আমরা আটকে পড়েছিলাম তিনদিন। তুষারপাত হয়নি, কিন্তু হাওয়া চলেছে দিনরাত। কনকনে ক্ষুরধার হাওয়া, পোশাক আর তাঁবুর ফাঁক খুঁজে ঘাতকের ছুরির মতো মাংস কুরে খায়। বিরামহীন শোঁ শোঁ শব্দে সময়ের বোধটাই গুলিয়ে যায়। ডায়েরির পাতায় যে দিন-তারিখের খোপে হিমালয়ের ব্যাপ্ত পরিসর গিঁথে রাখছিলাম, যেভাবে গিঁথে রাখে অভিযাত্রীরা, তার থেকে পিছলে বেরিয়ে যাওয়া চান্দেরের দিনগুলো, রাতগুলো। চমরিপালকদের প্রত্যন্ত গ্রামে জীবন গুটিয়ে আসে, সেঁধিয়ে যায় বাঁশ-কাঠের পলকা খাঁচার মতো কুঁড়েয়, জীবন বয়ে চলে আশ্চর্য মন্থর ছন্দে, জীবন আঁটোসাঁটো হয়ে আসে আগুনের ধারে।

রাতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে তাঁবুর গায়ে হাওয়ার ফরফর ফরফর শব্দটা বেজে চলে, নিমদেনের মুখে শোনা বন্ধুর মৃতদেহ খণ্ড করার বর্ণনায় মিশে যায় শরতের দেখা বৃশ্চিক লেকের সেই দৃশ্য: নীল জলে লাঠি ঠেলছে দুই মুদ্দাফরাস, পেছনে ন্যাড়া পাথরের চাঙড়ে বসে শকুন।

মাথার পেছনে একটা অদ্ভুত ব্যথা নিয়ে জেগে উঠি ভোরবেলায়। বাইরে আবহাওয়া অপরিবর্তিত। পাথরে সরিষা-হলুদ লাইকেন স্বচ্ছ তুহিনে গিল্টি হয়ে আছে। ভোরের গ্রাম, কিন্তু পরিচিত মোরগের ডাক নেই, মানুষের নড়াচড়ার চিহ্ন নেই। ছাই উড়ছে।

একটি ম্যাস্টিফ ও তার তিনটি ছানা শুয়ে আছে গত সন্ধ্যার আগুনের ছাইগাদায়।

দূরের কোনো গ্রাম থেকে ম্যাস্টিফের একটি ছানা কিনতে এসেছে এক মেষপালক যুবক। খারাপ আবহাওয়ায় আটকে পড়েছে সেও। ওই জানাল, একেকটি ছানার দাম এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আট থেকে দশ হাজার টাকা। পূর্ণবয়স্ক দুটি কুকুর বিজন পাহাড়ী উপত্যকায় দুশো-তিনশো ভেড়ার পাল পাহারা দিতে পারে অক্লেশে, মানুষের নজরদারি ছাড়াই।

মেষপালক শুনলে মনশ্চক্ষে ছেলেবেলায় পাহাড়ি রূপকথার বইয়ে পড়া যে ছবিটি

BanglaBook.org

মনে ভেসে ওঠে, যুবকটি দেখতে মোটেই তেমন নয়। মোঙ্গোলয়েড চেহারা— চটপটে, ফিটফাট, পরনে জিন্স জ্যাকেট আর নকল নাইকির জুতো দিরাং বাজার থেকে কেনা। কোমরে সনাতন কাঠের খাপে ছুরিটি পোশাকের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গিয়েছে। যার কুকুরছানা কিনতে এসেছে, তার ঘরেই উঠেছে। বহিরাগত পেয়ে অনেক কথা বলতে শুনতে চায় সে, কিন্তু বাধ সাধে ভাষা। হিন্দি বোঝে না তেমন, কিন্তু সকাল বিকেল আমাদের তাঁবুতে আসে। এইসময় ওর বয়সী প্রায় কেউই থাকে না গ্রামে। সমর্থ নারীপুরুষের ছড়িয়ে আছে কাছে দূরে চৌরিখাঙে। শীত শুরুর আগে চিজ মাখন তৈরি হচ্ছে জংলি ডেরায়, এরপর চমরিগুলোকে নিয়ে যাওয়া হবে নীচের উপত্যকায়। চিজ, জঙ্গলের কাঠ কিংবা শিশু পিঠের ঝুড়িতে বেঁধে মেয়েরা কখনো আসে ঘরকন্নার কাজে, আবার চলে যায়। কখনো গ্রামের ভেতর দিয়ে, বাড়িঘর উঠোন ফাঁকা জায়গা দিয়ে বিশাল ভেড়ার পাল চলে যায় এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে।

ইস্কুলবাড়িটা থাকায় মেস টেন্ট টাঙানো হয়নি। পোর্টাররাও ওখানেই উঠেছে। বিকেলের পর কাঠের আগুন নয়তো কেরোসিন হিটার ঘিরে গল্পগাছা হয়, কফির কাপ ঘোরে হাতে হাতে। মাঝপথে সফর বাতিল হওয়ায় রসদের অভাব নেই আমাদের। উত্তাপ আর উষ্ণ পানীয়ের আকর্ষণে গ্রামের অগ্রজরা আসে, শাঙ্গে দোরজি তার মধ্যমণি। নীচের জঙ্গলে বরফ কতখানি সরল, চলার উপযোগী পথ বের হল কী না, এইসব নিয়ে বার্তা বিনিময় হয়।

হাওয়ার দাপটে বাইরে থাকা যায় না বেশিক্ষণ, শরীরের অনাবৃত অংশ অসাড় হয়ে আসে। মধ্য এশিয়া থেকে বিশুষ্ক বাতাস তিব্বতের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে হামলে পড়েছে। সারা রাত সেই বাতাসে ভেসে আসে কুকুরছানার কান্নার শব্দ। শাবকটিকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে এখন থেকেই। মা কুকুরী চোর্তেনের আশেপাশে পড়ে থাকে সারাদিন, ঝাঁকড়া লোমের ফাঁকে বিমর্ষ চোখদুটো দেখা যায়।

বাষট্টির চিন-ভারত যুদ্ধের সময়ের কথা জানতে চেয়েছিলাম শাঙ্গে দোরজির কাছে। পঞ্চাশ বছর আগে বালক কিংবা তরুণ ছিলেন যাঁরা, কিংবা ততটা প্রবীণ নন কিন্তু ছেলেবেলায় বয়স্কদের মুখে শুনেছেন, সকলেই একযোগে বলতে শুরু করলেন সেই দিনগুলোর কথা। অবিরাম গোলাবর্ষণের শব্দে কীভাবে পাহাড় থরথর করে কাঁপছিল ভয়ার্ত চমরির পিঠের মতো, কীভাবে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে নেমে গিয়ে লুকিয়েছিল গোটা গ্রামটা, সেই কাহিনি হাত পা নেড়ে সবিস্তারে বলতে গিয়ে শিশুর মতো হয়ে ওঠে কেউ কেউ, গোলাগুলির আওয়াজ করতে থাকে মুখে। পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে ব্র্যান্ডি মেশানো কফির বিক্রিয়ায় আখ্যান ঘনিয়ে ওঠে।

সেই সময় চারপাশে জঙ্গল আরও বিস্তৃত ছিল, এত চারণভূমি ছিল না। চিনা ফৌজ ঢুকে পড়ার পর দিনের পর দিন লুকিয়েছিল গ্রামের মানুষ। তখন শরতের শেষ, নীচের দিকে খেতগুলোয় ফসল পেকে উঠেছে। সেসব ছেড়ে, এমনকি পোষা গরু চমরি ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল গোটা অঞ্চলের মোনপারা। যুদ্ধ মিটলে ফিরে এসে দেখে এক

BanglaBook.org

বিচিত্র কাণ্ড। চিনা সৈন্যরা খেত থেকে ফসল কেটে আঁটি বেঁধে পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে গিয়েছে, গবাদি পশুর জন্য জংলি ঘাসপাতাও জড়ো করে গিয়েছে।

এই বিচিত্র তথ্য এর আগে কখনো শুনিনি, কোথাও পড়িনি। শাঙ্গে দোরজিকে জিজ্ঞেস করলে স্মিত হেসে মাথা নাড়েন। চিনা লাল ফৌজ সঙ্গে কৃষিশ্রমিক এনেছিল, জানালেন তিনি। গ্রামের মানুষ কিংবা সম্পত্তির কোনো ক্ষতি করেনি।

ডায়েরিতে সাল-তারিখের খোপে দিনযাপনের পটভূমি বেঁধে রাখার চেষ্টা করে সাক্ষর মানুষ। শিশু আর অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের থাকে এক ভিন্ন স্থানকালের বোধ। সারাদিন মেঘ-চোঁয়ানো আলোয় এনামেল করা নিসর্গ আর ক্ষান্তিহীন হাওয়ার ভেতর সেই ভিন্নতার একটা আভাস পাই যেন। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভেসে ওঠে ছেলেবেলার বিলিতি লজেন্সের বাক্সে বরফাবৃত অ্যালপাইন ছবি।

ভাঙা উইন্ডমিলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে মোবাইলে গান বাজায় মেষপালক যুবক, হাওয়ায় ওর মাথার চুল ওড়ে। সামনেই পুরোনো দোতলা বাড়িটির উঠোনে লাল টুপি পরা এক সুঠাম তরুণী কাপড় মেলে দেয়, কাঠ কাটে, আড়ে আড়ে তাকায় পরস্পরের দিকে। দূর থেকে মুখের অভিব্যক্তি বোঝা যায় না।

গ্রামের ভেতর কোনো জলের উৎস নেই। সারাদিন ধরে খুদে বাচ্চারা দেয় প্লাস্টিকের জেরিক্যানে করে জল টেনে আনে কিছুটা দূরে ঝর্ণা থেকে। জানা গেল, আগে গ্রামের ধারেই ছিল ঝোরা, সামনে ন্যাড়া উঁচু জমিটায় ছিল ঘন বন। সেই বন কেটে সাফ হয়ে যাবার পর সেটি শুকিয়ে গিয়েছে, কঠিন হয়ে পড়েছে নতুন প্রজন্মের জীবন।

কিন্তু শিশুরা সর্বত্রই শিশু। ক্লান্তিকর কাজের মধ্যেও ওরা ছুটোছুটি করে খেলা করে, খালি জেরিক্যান গড়িয়ে দেয়, পলিপ্যাকে সুতো বেঁধে ঘুড়ি বানিয়ে ওড়ায়, কুকুরের পিঠে চেপে বসে কখনো। ওদের কলহাস্যে ঝিমিয়ে থাকা গ্রামটা সজীব হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য।

স্কুলটিকে ফের চালু করার একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন শাঙ্গে দোরজি। ছোটো ছেলেমেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখানো জরুরি। এব্যাপারে জেলার স্কুল পরিদর্শকের কাছে লেখা একটি আবেদনপত্র আমাদের দিয়ে ঘষামাজা করিয়ে নিলেন। মাসের শুরুতে ওঁর ছেলে আসবে দিরাং থেকে, তার হাত দিয়ে পাঠাবেন।

শাঙ্গে দোরজি বিপত্নীক। পরিবারের অন্যান্যরা, অর্থাৎ তিন পুত্র ও তাদের সন্ততিরা, থাকে দিরাং আর বমডিলায়, সরকারি চাকরি ও ব্যবসা করে। এক কন্যা থাকে পাশিঘাটে। প্রতি মাসে ছেলেরা এসে পেনশনের টাকা দিয়ে যায়। গ্রামের এক প্রান্তে কাঠ আর পাথরে তৈরি ওঁর বাসায় আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে মাখন চা বানিয়ে খাওয়ালেন একদিন।

দুই কামরার ছোট্ট বাসা, পেছনদিকে ছাউনিতে খোঁটায় বাঁধা একটি কালো মিথুন রয়েছে— গরু আর চমরির মিশ্র প্রাণী। ঘরে কেরোসিন হিটার, সোলার ল্যাম্প, মিউজিক সিস্টেম থেকে শুরু করে নানান আধুনিক গৃহসামগ্রী রয়েছে, কিন্তু প্রায় কিছুই

BanglaBook.org

ব্যবহার করেন না শাঙ্গে। এক অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। গ্রামের এক মহিলা ঘরকন্নার কাজ করে দেয়, মিথুনটির দেখাশোনা করে। ছেলেরা এসে দিয়ে যায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ, ওরা চায় ওদের কাছে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকুন। কিন্তু বমডিলায় দুদিন কাটালে হাঁফ ধরে যায় শাঙ্গের।

এই চান্দেরে তাঁর জন্ম, ছেলেবেলা কেটেছে এখানে, এখানেই মরতে চান। বসার ঘরে তাকের ওপর স্ত্রীর ছবি রয়েছে— মুখে গলায় ভারি গয়নায় সজ্জিত এক জড়োসড়ো নারী, পেছনে পাহাড় ঝর্ণা আঁকা স্টুডিয়োর ব্যাকড্রপ। আর রয়েছে তাঁর নিজের পুরোনো ছবি— ফৌজি উর্দি-পরা যুবক, চোখে দীপ্ত আত্মবিশ্বাস। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো আঁকড়ে বাঁচেন শাঙ্গে, সামনে ধরার মতো কিছু নেই। জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে ঝোরা, ন্যাড়া উষর হয়ে পড়ছে চারণভূমি। আগামী দিনে হয়তো গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে সবাইকে। আশপাশের পাহাড়ে এমন অসংখ্য পরিত্যক্ত বসতি রয়েছে।

সেনাবাহিনীতে কর্মসূত্রে অনেক জায়গায় কাটিয়েছেন তিনি। বয়স আর অভিজ্ঞতার ভার শাঙ্গে দোরজির ব্যক্তিত্বে এক মেদুরতা এনেছে, এক পরিশীলিত ভঙ্গি, যা তাঁকে গ্রামের সতীর্থদের থেকে একনজরেই স্বতন্ত্র করে তোলে। ওঁদের কাছ থেকে নিমদেনের মারফৎ একটি চমকপ্রদ তথ্য পেলাম: শাঙ্গে দোরজি এক ব্রোকপা নারীর সন্তান।

ব্রোকপা, অর্থাৎ ক্রীতদাস। মোনপা জনজাতির মধ্যে ক্রীতদাস রাখার চল ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। দেশ স্বাধীন হবার পরেও সেটা চলেছে কিছুকাল। একেকটি পরিবারের অধীনে বংশপরম্পরায় পশুপালনের কাজ করত ব্রোকপারা। পরিবারের সদস্যের মতোই থাকত, কিন্তু বাস করত গোয়ালে অথবা চৌরিখাঙের মাঝে ছাউনি ঘরে। কখনো মালিকের ঔরসে ব্রোকপা নারীর গর্ভে সন্তানও হতো। নেফা অঞ্চলে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব বাড়ার পর কালে কালে এই রীতির অবলোপ হয়েছে। চান্দের গ্রামে শাঙ্গে দোরজি সম্ভবত ব্রোকপাদের শেষ প্রজন্ম।

চারণভূমির মাঝে চমরিপালকের ছাউনিতে জন্ম হয়েছিল কি শাঙ্গের? কে জানে। একটা চমরির গলার ঘণ্টা দেখেছিলাম ওঁর ঘরে, তাকের ওপর দলাই লামার ছবির পাশে রাখা হয়েছিল সেটি। এই ধরনের ঘণ্টা কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? জানতে চেয়েছিলাম।

তাওয়াং কিংবা বমডিলার বাজারে পাওয়া যাবে, শাঙ্গে জানালেন, কিন্তু আজকাল প্রায় সবই হয় নিকৃষ্ট লোহার। এই পুরোনো ঘণ্টাগুলো শঙ্করধাতুর, আগেকার দিনে তিব্বত থেকে ব্যাপারীরা আনতো। বাষট্টির যুদ্ধের পর তাদের আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শাঙ্গের বসার ঘরের তাকে ঘণ্টাটি বাজে না আর, হয়তো তাঁর স্মৃতির ভেতরে বেজে চলে। সেই নিস্বন আমরা শুনতে পাই না। সারারাত তীব্র হাওয়ায় তাঁবুর কাঁপন, জ্বালানি কাঠের স্তূপের ভেতর দিয়ে হাওয়ার বিচিত্র ধ্বনি ঘুমের ভেতর মনে হয় যেন কুচকাওয়াজ করে চলেছে সৈন্যদল। একটা ছমছমে ঘোর লাগা দশার ভেতর ক্রমশ জেগে

BanglaBook.org

উঠতে উঠতে মনে পড়ে যায় অনেককাল আগে দার্জিলিঙে একবার প্রফেসর নোরবু বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন পুনর্জন্মের চক্রে জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি এক স্তরের কথা। সেই অনুভূতিটা কেমন ঠিক কল্পনা করতে পারিনি সেদিন, কিন্তু ভোরের আগে মনে হল যেন এইরকম। মাথার ভেতরে এক ফাঁপা অনুভূতি। ঘুম থেকে জেগে উঠলাম একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে।

এখানে আসার পর তিনদিন ধরে অবিরাম হাওয়ার শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, সেই হাওয়াটা যে থেমে গিয়েছে সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। তাঁবুর গায়ে চোর্তেনের ছায়া এসে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি মেঘের চাদরে নীচের দিকে ফাঁক হয়ে সূর্যের তেরছা সোনালি আলো এসে পড়েছে, দূর চক্রবালে সরু একফালি বেগনি কমলা আকাশে, তার গায়ে ফুটে আছে তুষারাবৃত পাহাড়শ্রেণি। সামনে চোর্তেনের নীচে বিছিয়ে রয়েছে, ঠিক যেন ছেঁড়া ছেঁড়া তুষারের মতো, ঘুমন্ত স্থবির ভেড়ার পাল। চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকতে গিয়েও থমকে যাই। চোর্তেনে পাথরের খাঁজে বসে আছে একটি ছোট্ট পাখি, পলকা বিষণ্ণ স্বরে ডাকছে: লাফিং থ্রাশ। তার কালচে সবুজ দেহটা প্রায় মিশে গিয়েছে পাথরে ছত্রাকে।

সেদিন দুপুরের পর নেমে এলাম সাংতি ভ্যালিতে। পরদিন জিপযোগে দিরাং।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চমরিঘণ্টার ধ্বনি

সারাদিন আমার বাসায় একটি অন্তহীন পর্দার মতো ঝুলে থাকে শহরের কোলাহল—গাড়ির হর্ন, টিভির শব্দ, কুকুরের ডাক, মোবাইলের রিংটোন, দূরাগত লাউডস্পিকার। আর এসবের মাঝে কখনো-সখনো একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে। সেই ঘণ্টার ধ্বনিতে জড়িয়ে থাকে দুর্গম পাহাড়ের গা, পাইনবনের নীচে নীলাভ তৃণভূমি, আকাশের গায়ে বরফে ঢাকা পাহাড়চুড়ো, গহীন উপত্যকার বুক চিরে বহতা নদী, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠা গ্রাম: টুকরো টুকরো ছবি, এক শাশ্বত দৃশ্যপট থেকে খুলে এসে অপেক্ষা করে আমার দরজার বাইরে, ভেতরে আসতে চায়। আমি গিয়ে দরজা খুলে দিই। দেখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিকে কাজের মাসি, আবর্জনা নিতে এসেছে সাফাইঅলা, সেলস্‌ম্যান কিংবা সামনের ফ্ল্যাটের এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ। সকালে এই ঘণ্টা বাজিয়ে হাজির হয় দুধের প্যাকেট, দরজার নীচে ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে খবরের কাগজ। প্রতিটি ধ্বনির চেহারাচরিত্র আলাদা, আমি ঠিক চিনে নিতে পারি।

যখন ইলেকট্রিক বেল ছিল, এত স্পষ্টভাবে তফাৎ করা যেত না। সেই বেল খুলে দরজার ফ্রেমে ঘণ্টাটি ঝুলিয়েছি আমি। প্রথমদিকে বাড়ির অন্য সদস্যদের আপত্তি ছিল ; চিমনি চালু থাকলে রান্নাঘর থেকে, কিংবা বাথরুমে জল পড়ার শব্দের ভেতর ঘণ্টাধ্বনি টের পেতে অসুবিধা হতো। এখন সকলেরই কান রপ্ত হয়ে গিয়েছে। এমনকি অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছগুলোও ঘণ্টার শব্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে দেখেছি।

চমরির গলার ঘণ্টা, তামা পিতল লোহা ও অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে তৈরি। ভেতরে একটি শক্ত কাঠের টুকরো, সম্ভবত রডোডেনড্রন কিংবা জুনিপার। ঘণ্টাটি পুরোনো, ব্যবহৃত, গায়ে অসংখ্য টোল পড়েছে, তার ওপর সবুজ পাতিনা জমে মাছের আঁশের মতো নকশা ফুটেছে। চান্দের থেকে নেমে আসার দিন এটি আমায় উপহার দিয়েছেন শাঙ্গে দোরজি। ওঁর ঘরে ঠিক এইরকম একটি ঘণ্টা দেখে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলাম, সেটা ভোলেননি।

সিমলার ম্যাল রোডে মারিয়া ব্রাদার্স বুকশপের দরজা খুললে একটি ঘণ্টা টুং করে বেজে উঠত একবার। সেই তীক্ষ্ণ নিস্বন ঘরের ভেতর পুরোনো বইয়ের গন্ধে ভারি বাতাস আর মথ-ওড়া আলোছায়ায় মিশে এক বিচিত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করত, একটা রহস্যের খিদে চারিয়ে যেত ভেতরে। এই তিব্বতি চমরিঘণ্টার শব্দ অন্যরকম। অনুচ্চ

BanglaBook.org

ভরাট ধ্বনির প্রবাহে একধরনের অলস মগ্নতা তৈরি হয়, যেন কোন অসীমের দরজা সামান্য ফাঁক হয়, সময়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে।

অনেক বছর আগে দার্জিলিঙে চাকরি করতে গিয়ে সেখানকার কুখ্যাত অবসাদের শিকার হয়েছিলাম আমি। তখন বর্ষাকাল। সারাদিন ছিপছিপ করে নাছোড় বৃষ্টি আর কুয়াশা চুঁইয়ে আসা মনমরা আলো। রাতে ঘরের ভেতর আলোর টানে শার্সির বাইরে সেঁটে আসত বিচিত্র বর্ণের মথেরা। এক রাতে সেই মথের ডানার ভিড়ে দেখেছিলাম এক যুবকের মুখ। উনিশ শতকের এক বাঙালি গুপ্তচরের কাহিনির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম শহরের একপ্রান্তে একটি পোড়ো ভিলায়। একদিন বিকেলে দীর্ঘ ভ্যালিয়াম-আবিষ্ট ঘুম থেকে জেগে উঠে চা-বাগানের পায়ে-চলা পথ ধরে আনমনে খাদের কিনারে এসে দেখেছিলাম ব্রকেন স্পেক্টার: কুয়াশা গলে-আসা তেরছা সূর্যের রশ্মিতে মেঘের গায়ে প্রতিফলিত বৃত্তাকার রামধনু, তার ভেতর আমার অতিকায় ছায়া, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে আমারই দিকে। খাদের ধারে একটি ভাঙা চোর্তেন ছিল, তার গায়ে বটের শিকড় জড়ানো, অনেকটা যেন শিরাউপশিরাময় হৃৎপিণ্ডের মতো দেখাচ্ছিল। নীচে কামিনবস্তিতে কুকুর ডাকছিল। ঝোপেঝাড়ে ঝিঁঝির তানের ভেতর শুনতে পেয়েছিলাম সেলাইমেশিনের যান্ত্রিক শব্দ। সেই শব্দ আমায় টেনে নিল এক দর্জির গল্পে, এক রহস্যনদের পথের সন্ধানে বেরিয়েছিল যে। তারপরে, তার আগেও, সেই পথ ধরে গিয়েছে অনেক মানুষ— গুপ্তচর যোদ্ধা প্রেমিক প্রকৃতিবিদ। পাহাড় পথের মতো, নদীর মতো আখ্যানের জাল ছেয়ে এসেছে হিমালয়ের মানচিত্রে। সেই জালে আটকা পড়ে গিয়েছি আমি। সিমলার ম্যাল রোড থেকে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থান, শিংলিলার অভয়ারণ্য থেকে অরুণাচলের দুর্গম ট্রেকপথে আড়াইশো বছর ধরে বোনা হতে থাকা এক কাহিনির বিসর্পিল জাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে আমায়, কোন অতল আবছায়া থেকে ঝিনুক প্রবাল ভাঙা জাহাজের মাস্তুলের মতো উঠে এসেছে কিছু ছবি। সেই ছবিগুলো মাথার ভেতরে বয়ে নিয়ে চলেছি আমি: দূর পাহাড়ের কোলে বিজন নিঝুম গ্রাম, শীতঘুমে সেঁধিয়ে এসেছে, বিকেলবেলায় মেয়েরা কাঠের বালতি হাতে বেরিয়ে এসে শিস দিয়ে ডাকছে; চমরিঘণ্টার শব্দ, কুয়াশা, বরফ— তার ভেতর দিয়ে নিশি-পাওয়ার মতো পদক্ষেপ গুনে চলেছে এক বাঙালি যুবক; সবুজ গুপ্ত উপত্যকায় ভোর ফুটছে, স্ফটিক পাহাড়ের মাথায় সূর্যের প্রথম আলো, নীচে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ছোটো গ্রাম, নিস্তব্ধ; ক্রমশ আলোর রশ্মি নেমে আসছে তুষাররেখার নীচে, ঘন জুনিপারের জঙ্গলে আলো ঢুকছে, স্থির স্বচ্ছ বাতাসে ভেসে আসছে রিনরিন ঘণ্টাধ্বনি। জঙ্গল বুঝি জাগছে মৌচাকের মতো। চমরির গলার ঘণ্টা, বনের ফাঁকে চৌরিখাঙে স্থির হয়েছিল সারারাত, সূর্যের তাপে নড়েচড়ে বেজে উঠছে।

ঘণ্টা বেজেই চলে। দরজা খুলে দেখি ডাকপিওন। প্যাকেটের গায়ে বিদেশি ডাকটিকিট, ফ্রাঁসোয়া পাঠিয়েছে। কলকাতা নিয়ে লেখা আর ছবি সম্বলিত চটি পুস্তিকা।

BanglaBook.org

ফ্রাঁসোয়া লেখক নয়, ও নিজেই বলেছে সে কথা। ওর ভ্রমণের খরচ কিছুটা স্পনসর করেছে দেশের একটি সংস্থা, তাদের সঙ্গে শর্তের দায়ে লেখা।

মনে পড়ে যায়, অনেককাল আগে দার্জিলিঙে কিছুদিন দরজায় ডাকপিওন এসে দাঁড়ালে উত্তেজনা হতো আমার। খামের গায়ে থাকত নানান দেশের টিকিট, আমার নির্জন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে ফুটে উঠত ম্যানিলার সূর্যধোয়া আকাশরেখা, পোখারার হ্রদে প্রতিফলিত অন্নপূর্ণা, ফুকেতের বালুবেলায় ডলফিনের লাফ, তাইওয়ানের আদিবাসী দম্পতি, কুয়ালালামপুরের টিউলিপ বাগান... জুলিয়া গ্রিফিথের পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ড। স্বদেশে ফেরার পথে টাকা ফুরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিল সে। সেইসব দেশের থেকে ছবিগুলো এসেছিল দিগন্তে অপস্রিয়মাণ রেলগাড়ির ধোঁয়ার মতো।

দার্জিলিঙে আমার বাসায় শোবার ঘরের একটি দেওয়াল ছিল পাহাড়ের গা, বর্ষাকালে তার গায়ে বাদামি রোমের মতো একধরনের ফাঙ্গাস ছেয়ে আসত। সেই দেয়ালটা ঢেকে দিয়েছিলাম জুলিয়ার পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ডে। কয়েক বছর পরে চাকরিতে বদলি হয়ে ফিরে আসার সময় সেগুলো খুলে নিতে গিয়ে দেখি পাহাড়ি আর্দ্রতা ঢুকে পড়েছে ফোটোগ্রাফের ভেতর, আঙুল ছোঁয়াতেই কাগজের ওপর থেকে ছবির পরত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল মৃত মথের ডানার মতো।

নিঃশব্দে ঝরে পড়া ছবির পরত জমে স্মৃতির ভেতর। ইশারা চলে অবিরত। মুমূর্ষু মহানগরীর এঁদো গলির ভেতর একটি প্রাচীন দরজায় কাঠের কার্টলে দেখি ফুটে আছে বলিরেখাময় মুখের আদল, কোনো বিস্মৃত পাহাড়ি গ্রামে একঝলক দেখা, ভিজে শ্যাওলার গন্ধে ঝাপটা দিয়ে ওঠে চমরি মাখনের টোকো বাস, হাইড্র্যান্টে কলকল করে বয়ে যাওয়া জলে হিমপ্রপাতের ধ্বনি, ফুটপাথে পুরোনো বইয়ের হলুদ পাতায় ব্যাসাল্ট পাথরের গায়ে দিনশেষের আলো, রাতের অন্ধকারে হোর্ডিং-এর এলইডি আলোয় ঘুমন্ত ম্যাস্টিফের কালো চামড়ায় ঝিকিমিকি জ্যোৎস্নারেখা... ব্যস্ত শহরের ভিড় আর কোলাহলের মাঝে এক-একটি আচম্বিত মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওঠে ইমেজেরা।

এ এক বিচিত্র ঘোর লাগা দশা, ফ্রাঁসোয়া যেমন বলেছিল, অনেকটা জেট ল্যাগের মতো— সময়ের জেট ল্যাগ নয়, আ জেট ল্যাগ ইন স্পেস। কিংবা দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার পর পায়ের নীচে ভূমি যেমন দোলে। সারাদিন আমার বাসায় পর্দার মতো শহরের অবিরাম ধ্বনির ভেতর একটি চমরিঘণ্টা বেজে ওঠে থেকে থেকে। সেই ধ্বনিতে জড়িয়ে থাকা উপত্যকা, পাইনবন, গিরিখাত, নদী, শীতঘুমে গ্রাম আর বরফের পাহাড় আমার সদর দরজায় এসে দাঁড়ায়। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলি। দেখি কেউ কোথাও নেই— বাইরে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, খর ব্যস্ত শহর ছেঁড়া ভিনাইল হোর্ডিং-এর মতো হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

এক অদ্ভুত দোলাচলের ভেতর ঘরে ফিরে আসি। টেবিলে খোলা পাণ্ডুলিপি, পেন, অ্যাকোয়ারিয়ামে অচঞ্চল মাছ কাচে প্রতিবিম্বে চুমু খায়। একপাশে স্তূপাকার পুরোনো

BanglaBook.org

বই— Himalayan Journals, Lost Horizon, Journey to Central Tibet and Lhasa, Exploration of Yarlung Tsangpo... মেরুদণ্ডে সোনার জলে এমবস করা অক্ষরগুলো কালচে হয়ে এসেছে, এককালের চেরি-লাল আর জলপাই-সবুজ চামড়ার বাঁধাই ফিকে জীর্ণ হয়ে এসেছে, বেরিয়ে পড়েছে বাদামি ছাল। পাতা খুললে বিশুষ্ক একটা গন্ধ ঝাপটা দিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাসের মতো।

তিনশো বছর ধরে হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে অভিযাত্রীদের ভ্রমণকাহিনি সব— পাহাড়ি পথের মতো, নদীর মতো পরস্পরে জুড়ে এসেছে, খুলে এসেছে, নিবিড় জাল বিছিয়েছে কল্পনার মানচিত্রে। এক গুপ্তচরের গল্প, এক অনুসন্ধানকারী, এক প্রকৃতিবিদ, প্রেমিক অধ্যাত্মপিয়াসী আর যোদ্ধার গল্প দিনরাত তাড়া করে ফিরেছে আমায়, কবজি খামচে ধরেছে কোলরিজের বুড়ো নাবিকের মতো। সেই কাহিনিগুলো খুঁড়ে ছেনে একটা কথামালা বুনে তোলার চেষ্টা করছি। আমার মাথার ভেতরে গিজগিজ করছে ছাপা অক্ষরের রাশি, স্থির, অপরিবর্তনীয়, সনতারিখে ডায়েরির পাতায় বাঁধা। বিস্মৃত ইতিহাসের কুশীলব ও তাদের কীর্তিকাহিনি— তিল তিল করে জড়ো করতে গিয়ে মনের ভেতর নখ আঁচড়ায় একটা দ্বিধা। কেমন যেন মনে হয়, একটা সময়ের প্রবাহকে ধরতে চেষ্টা করছি যা আসলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালির মতো ঝরে যাচ্ছে, ছাপা অক্ষরের জাল গলে পিছলে হারিয়ে যাচ্ছে কোনো নিশ্চেতন গিরিখাতে। সেখানে প্রবেশের বিদ্যা জানা নেই আমার। আমি কেবল মুদ্রিত অক্ষর পড়তে পারি— জার্নাল ক্রনিকল রিপোর্ট টেক্সট। তার বাইরে থেকে যায় এক জটিল গভীর জীবনধারা, যা হয়তো প্রবাহিত হয় একটি আড়বাঁশির সুরে, যে সুরের স্বরলিপি লেখা নেই কোথাও, কিংবা ধরা আছে তিরতিরে জলধারায়, ফার্নের পাতায় শিশিরের শব্দে, অচেনা পাখির ডাকে। ধ্বনি আর কথা, যা সঞ্চিত থাকে একটি জনগোষ্ঠীর স্মৃতিতে, রিঞ্চেন তেনোয়ার গানের মতো, যুগ যুগ ধরে যা গাওয়া হয় উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে, আগুনের ধারে, গায়ক শ্রোতার অন্তরঙ্গ রক্তের ভেতরে অনুরণন হয়ে চলে।

রিঞ্চেন তেনোয়ার গান শুনেছিলাম জঙ্গলের ভেতর তাঁবুতে একটি শুকনো লেকের বিছানায় শুয়ে। কয়েক হাত দূরে মেস টেন্ট থেকে ভেসে আসছিল সেই অন্ধ গায়কের গুনগুন স্বরে গান, তাতে গলা মেলাচ্ছিল কয়েকজন পোর্টার। তখন রাত হয়েছে। খাওয়াদাওয়া সারা হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। অভিযাত্রীরা সকলেই ঢুকে গিয়েছে যে যার তাঁবুতে। বাসনপত্র ধোয়াধুয়ির শব্দ থেমে গিয়েছে। বাইরে ব্যাপ্ত নিশুতি রাতের অরণ্য ক্রমশ চঞ্চল বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার আগে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, সেটি প্রায় নিভু নিভু। সেই নিভে আসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেস টেন্টের ভেতর অনুচ্চ কোরাসে যোগ দিচ্ছে নতুন নতুন কণ্ঠস্বর। তারপর একসময় সেই কণ্ঠস্বরগুলো নিভে যেতে লাগল, হারিয়ে যেতে লাগল লেকের ধারে ছেড়ে-রাখা মালবাহী চমরিগুলোর ক্বচিৎ ঘণ্টাধ্বনিতে।

এভাবেই কোনো পাহাড়ি গ্রামে মেষপালকের কুঁড়েয় রাতের আশ্রয়ে তক্তার ফাঁক

BanglaBook.org

চুঁইয়ে আসে পাশের ঘরে একটি পরিবারের কথোপকথন— অন্ধকারের ভেতর, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, অনুচ্চ, অর্দ্ধস্ফুট। প্রথমে বাচ্চাদের কণ্ঠস্বরগুলো থেমে যায় একে একে, তারপরেও চলে এক পুরুষ ও নারীকণ্ঠ, অন্তরঙ্গ শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো— চাষের কথা, পশুর কথা, জঙ্গলে পেকে আসা ফল কন্দ ছত্রাকের কথা, দৈনন্দিনের খুঁটিনাটি উৎকণ্ঠা আর পরিকল্পনার কথা। ক্রমশ তেল ফুরিয়ে আসা বাতির মতো কথাগুলো নিভে যেতে থাকে হাই তোলার ভেতর, মিঠে অবসাদের ভেতর, হারিয়ে যায় ঝিঁঝির তান আর জলধারার ধ্বনির গর্ভে।

আমার টেবিলে জীর্ণ বইগুলোয় এইসব কথা লেখা নেই। পাতা খুললে মুদ্রিত অক্ষরের ফাঁক দিয়ে বয়ে আসে শুকনো ছত্রাকের শ্বাস, বিশুষ্ক কাগজের থেকে আলো মরে গিয়েছে কবেই।

অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতর মাছেরা বুড়বুড়ি কাটে, সহসা চঞ্চল হয়।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে শরৎচন্দ্র দাসের সেই প্রথম তাশিলুম্ফো দর্শন, যেন ফিনফিনে রেশমে ঢাকা রহস্যময় নারীদেহ, গবাক্ষের পার্চমেন্ট চোঁয়ানো চাঁদের আলোয় দেখা, সেটাই কি প্রকৃত সত্য? নাকি তিরিশ বছর পরে অন্ধকূপ ভেঙে বের করে আনা ফ্যাকাশে সরীসৃপের মতো মনুষ্যপ্রাণী— শ্যাওলা আর পাথরের ঘাম চেটে বেঁচেছিল যে, দিনের আলোয় আনতেই ছটফট করে মারা গেল? তিব্বতের নিঃসীম প্রান্তরে রত্নস্ফটিক গলে আসা বিচ্ছুরণের মতো সূর্যাস্তের বর্ণনা সত্য, নাকি হিমালয়পারের এক স্থির নিষ্কম্প সভ্যতাকে বারুদের শক্তিতে ঝিনুকের মতো খুলে দেওয়া?

এইসব দোলাচলের ভেতর কিছু একটা আঁকড়ে ধরার আর্তিতে একদিন হাওড়া পেরিয়ে চলে যাই ঘুসুড়িতে। আঠের শতকে তাশিলুম্ফোর পাঞ্চেন লামার আর্জি মেনে জর্জ বোগলের মধ্যস্থতায় ওয়ারেন হেস্টিংস গঙ্গার ধারে প্রশস্ত বাগানের মাঝে তৈরি করে দিয়েছিলেন তিব্বতি মঠ আর মন্দির। স্থানীয় নাম ভোটবাগান মঠ, রিক্সাওয়ালা বলে ভূতবাগান। ঘিঞ্জি শিল্পাঞ্চল আর বস্তির সরু অলিগলির ভেতর দিয়ে হর্ন দিতে দিতে রিক্সা ছোটে।

—ওখানে এককালে এক পীরবাবা পুজোআচ্চা করে ভূত নামাতো, তরুণ রিক্সাওয়ালা বলে, তাই ভূতবাগান। তবে এখন আর কিছু নেই।

গঙ্গার কাছে ন্যাড়া ঘাসজমির ওপর ভূতের মতোই দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নপ্রায় দোতলা মঠ— সমতল ছাত, ছাতের আলশেয় বটগাছ গজিয়েছে। বাইরের জমিতে প্রাচীন মোহান্তদের কবরের ওপর আটচালা মন্দিরের আকারে ছোটো ছোটো সৌধ। ছাগল চরছে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে বস্তির বালক। কোথায় হিমালয়ের ওপারে এক রহস্যের দেশ, কোথায় সোয়া দুশো বছর আগে এক তরুণ ইংরেজের দুর্গম পথে যাত্রা, প্রাচ্যের এক ধর্মীয় রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে ইউরোপের এক বাণিজ্য কোম্পানির মৈত্রীচুক্তি, আর কোথায় এই পোড়ো মাঠ। ইতিহাস স্বয়ং মরে গিয়েছে ভোটবাগানে। দূরে দেখা যায় বন্ধ

BanglaBook.org

কারখানার মরচেধরা ছাউনি, চিমনির মাথায় আঁকড়ে উঠেছে বটগাছ। দুই ভিন্ন সময়ের পরিত্যক্ত দুটি ইমারত, পরস্পরে এক আশ্চর্য সংগতি তৈরি করে নিয়েছে।

দূরে কোথাও একটা মিছিল চলেছে। অবরোধ। রাজপথ থেকে গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে গলির ভেতর। একটানা হর্নের ধ্বনি। যানজট খান খান করে ছুটে গেল একটি মোটরবাইক। একটি অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়েছে, সাইরেন বেজেই চলেছে। কোথাও বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, কংক্রিটে হাতুড়ির শব্দ। এসবের মাঝে চমরিঘণ্টা বাজে। মনে হয় যেন পাহাড়ের কোলে শুয়ে আছি, তাঁবুর দেয়ালে চোর্তেনের ছায়া। তন্দ্রা টুটে যায়, দেখি আলো ফুটে গিয়েছে। অনেককাল আগে দার্জিলিঙে এক সকালে কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে দেখেছিলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর নোরবু।

উঠে গিয়ে দরজা খুলি। সকাল নয়, বিকেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সামনের ফ্ল্যাটের বৃদ্ধ, খবরের কাগজ নিতে এসেছেন শব্দছকের জন্য। কিন্তু সেটা আসল উদ্দেশ্য নয় ; সারাদিন কথা বলার লোক পান না, সপ্তাহের মাঝখানে আমার ছুটির দিনটা উনি জানেন। পাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন উদগ্রীব, হাতে চশমার খাপ। পড়ন্ত আলোয় আমি ওঁর মুখচ্ছবি দেখি: অস্বচ্ছ, হলদেটে চোখ, কানের ফুটোয় পাকা চুলের গুছি, মুখের অভিব্যক্তি অনেকটা যেন ফুটপাথে চায়ের দোকানে বিস্কুটলোভী কুকুরের মতো।

—যাই বলুন, আপনার এই ডোরবেলটি কিন্তু ভারি ইউনিক।

নকল দাঁত, ঠিকমতো সেটিং হয়নি। কথা বলার সময় তাই ঠোঁট আর মাড়ি একটু অস্বাভাবিকভাবে নড়ে, দাঁতের পাটি আগলে রাখে যেন। তবু কণ্ঠস্বরে বনেদি ব্যারিটোন, বার্ধক্যের শ্লেষ্মায় ধার মরেছে। শখের ভিন্টেজ গাড়ি কিংবা বন্দুক বের করে ঝাড়ামোছা করার মতো আয়েশ করে জিভ নাড়েন, নিজের কণ্ঠস্বর শোনেন। খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে শুরু হয় এক রিচুয়াল। একটিমাত্র পাতাই ওঁর অভীষ্ট, কিন্তু গোটা কাগজটি আদ্যপান্ত উলটে যান অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ভোগ্যপণ্য, জীবনবিমা, জাপানি তেল, করাচিতে বোমা বিস্ফোরণ, স্বল্পবাস নারী, আরব দেশে গণঅভ্যুত্থান, আঞ্চলিক নাট্যোৎসব... পাতাঝরা জংলি পথে খসখস পদশব্দের মতো সরে যেতে থাকে নিস্পৃহ আঙুলে।

ঐ সময়ের

দার্জিলিঙে সেই পড়ন্ত বিকেলে হ্যাপি ভ্যালির খাদে ব্রকেন স্পেক্টার দেখে শিহরিত হয়েছিলাম। চান্দেরে শেষ ভোরবেলায় তাঁবুর গায়ে চোর্তেনের ছায়া দেখে ফিরে এল সেই অনুভূতি। একটানা হাওয়ার শব্দ থেমে গিয়েছিল, শোনা যাচ্ছিল সেই একলা পাখির ডাক। বাইরে বেরিয়ে দেখি মেঘের পর্দা ফাঁক হয়ে দেখা যাচ্ছে তুষারশৃঙ্গের সারি।

BanglaBook.org

তার আগে নিশ্চল তিনটে দিন চমরিপালকদের সেই একরত্তি গ্রামে অবসাদে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম আমরা। তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল কারোর কারোর মধ্যে— মাত্রাছাড়া মদ্যপান, অহেতুক শ্লেষ কিংবা তুচ্ছ কারণে মেজাজ হারিয়ে ফেলার মধ্যে দিয়ে। তাঁবুর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের অভাবগুলো প্রকট হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীটাই বুঝি ঢেকে গিয়েছে একটি মলিন ধূসর তাঁবুতে। তার ভেতর একটি মিনিয়েচার গ্রাম, চুঁইয়ে আসা ঘোলাটে আলোয় ধোয়া। সেই আলোও মরে আসে ঘড়ির সময়ে দুপুর শেষ হবার আগেই।

শুনশান স্থবির গ্রাম, জনমনিষ্যি দেখা যায় না প্রায়। ক্বচিৎ কাঠ কাটার শব্দ কিংবা চালের ফাঁকে ধোঁয়ার রেখা জানান দেয় কুঁড়েগুলোয় মানুষ রয়েছে। দুপুরের দিকটায় কিছুক্ষণ ঝর্ণা থেকে জল টেনে আনা কচিকাঁচাদের কলকাকলিতে ভরে ওঠে। কখনো বসতির ভেতর দিয়ে ভেড়ার পাল চলে যায়, পাথরে খুরের আঘাতে চড়বড় চড়বড় শব্দ হয় বৃষ্টিফোঁটার মতো। নীচের গ্রাম থেকে আসা সেই মেষপালক যুবককে আর দেখা যায় না। উইন্ডমিলের বেদিটা শূন্য পড়ে থাকে। সেই মেয়েটিও আর উঠোনে আসে না কাজের অছিলায়। মনের মধ্যে অলস কল্পনার জাল বোনা হয়।

ফিরে আসার আগের দিন দুপুরে একা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম গ্রামের প্রান্তে শাঙ্গে দোরজির ঘরে। নির্জন পথ, হাওয়াটা কেমন এলোমেলোভাবে বইছে। ছাই আর পলিপ্যাক উড়ছে। ম্যাস্টিফের তিনটি ছানা ছুটোছুটি করছে তার ভেতর। মা কুকুরী শুয়ে আছে ছাইয়ের গাদায়। আলাদা করে রাখা ছানাটির কান্না শোনা যায় না। (পরে জেনেছিলাম, আগের দিন কুকুরছানাটিকে নিয়ে চলে গিয়েছে সেই মেষপালক ছেলেটি।)

গোখাদ্য আনতে নীচের বনে গিয়েছিলেন শাঙ্গে। তাঁর মাথা থেকে পিঠ চটে ঢাকা মালবাহী কুলিদের মতো, পায়ে প্লাস্টিকের গামবুট, গায়ে বুনো লতাপাতার গন্ধ। আমাকে সাদরে ঘরে ডেকে এনে বসিয়ে পোশাক বদলে এসে জানালেন, নীচের চৌরিখাঙে বরফ সরছে, শীঘ্রই চলার উপযোগী হয়ে উঠবে।

শাঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর থেকে মানুষটি সম্পর্কে একটা রহস্যময় টান অনুভব করছিলাম। আসাম রাইফেলস-এ থাকাকালীন বাষট্টির যুদ্ধে লড়েছেন, সে কথা নিমদেন আমাদের বলেছিল। এই ব্যাপারে ওঁকে জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সেদিন নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন।

কেরোসিন হিটারে উষ্ণ হয়ে ছিল ওঁর পরিপাটি বসার ঘরটা। ছাং গরম করে এনে ঢাললেন দুটি পোর্সেলিনের বাটিতে। আমার হিপ ফ্লাস্কে খানিকটা ব্র্যান্ডি ছিল। ঘরের চালে বাঁশের বাতায় থেকে থেকে হাওয়ার শব্দে মনে হচ্ছিল যেন অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ডানা ঝাপটে ওড়ার চেষ্টা করছে।

বাষট্টির যুদ্ধে আমি লড়িনি— শাঙ্গে বললেন। সেসময়ে আমি তেজপুরে কম্যান্ড হেডকোয়ার্টারে। আমাদের কাজ ছিল ফরোয়ার্ড লাইনে সাপ্লাই পাঠানো, রেশন জ্বালানি ও অন্যান্য জিনিসপত্র মজুত করা।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আসাম রাইফেলস-এ চাকরি হয়ে গিয়েছে দশ বছরেরও বেশি। বালক বয়স থেকে চমরিপালনের কাজ করে হাতে পায়ের আড় ভেঙেছে। ব্রোকপার জীবন চিরকালই ছিল কষ্টের। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে প্রাণীগুলোর দেখভাল করা, দুধ দোয়া, ঘি-ছুরপি তৈরি— অনেক কাজ। তবু চৌরিখাঙে বনের ফলকন্দ পাওয়া যেত। গ্রামে এলে আরও কঠিন পরিশ্রম। গোয়ালের এক কোণে থাকা আর মোনপাগৃহের উচ্ছিষ্ট খাবার। এই জীবন থেকে মুক্তির কোনো আশা ছিল না। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই খবর চান্দেরে এসে পৌঁছতেও বছর ঘুরে গিয়েছে। এখনকার মতো রাস্তা তো ছিল না। গ্রামের জীবন কতটা বিচ্ছিন্ন ছিল সেটা এখন বোঝানো যাবে না। কেউ দিরাং থেকে ফিরে এলে গাঁয়ের লোক কাজ ফেলে ভিড় করে আসত।

অনেকগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক বড়ো একটা শহর রয়েছে, সেই কাহিনি মায়ের মুখে শুনে এসেছে বালক শাঙ্গে। একদিন ভোট ব্যাপারীদের সঙ্গে পালিয়ে গেল, আটদিন ধরে হেঁটে গিয়ে পৌঁছল সমতলের এক শহরে। এর আগে কখনো শহর দেখেনি সে। মনে হল একদল জিনদানো এসে তছনছ করে চলে গিয়েছে: চারদিকে ইটকাঠের স্তূপ, বড়ো বড়ো বাড়িঘরগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়েছে, মাটির গভীর ফাটল থেকে ধোঁয়া উঠছে। দুঃস্বপ্নের শহর।

১৯৫০ সালের ভয়াবহ আসাম ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে তার কিছুকাল আগেই। আসাম রাইফেলস-এ তখন প্রচুর লোক নেওয়া হচ্ছে পুনর্নির্মাণের কাজে। সওয়ারের পদে কাজ পেয়ে গেল শাঙ্গে। বয়স তখন সতেরো। সেই শুরু। বাষট্টির যুদ্ধের সময় ল্যান্স নায়েক হয়েছে সে।

২০ অক্টোবর চিনেরা প্রথম হামলা করল, শাঙ্গে ছুটলেন। তবে নেফার এদিকটায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি। ১৮ তারিখে ওরা বমডিলা দখল করল। পরদিন খবর এল সমতলে নেমে এসেছে লিবারেশন আর্মি, তেজপুরের দিকে আসছে। হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম এল পোস্ট ছাড়ার। এদিকে মিলিটারি কনভয় ফিরে যাচ্ছে দেখে শহরের লোকের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ল। তখন বাতাসে নানান গুজব ভাসছে, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, চিনেরা টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছে, রেডিয়োই একমাত্র ভরসা। নুনমাটি রিফাইনারিতে আগুন লাগানোর খবর এল ভোররাতে। সেদিনই দুপুরে রেডিয়োয় পণ্ডিতজী ভাষণ দিলেন— মাই হার্ট গোজ আউট টু দ্য পিপল অব আসাম।

তারপরেই শুরু হয়ে গেল আতঙ্ক। তেজপুর ছাড়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবার আগে পালাল প্লান্টাররা। আমাদের ব্যারাকের লাগোয়া চাবাগানের ম্যানেজার ছিল এক সাহেব, পাঁচটা বুলডগ ছিল। একাই জিপ চালিয়ে পরিবার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল গৌহাটি, সেখান থেকে চার্টার্ড প্লেনে কলকাতা। যাবার আগে সাধের কুকুরগুলোকে নিজে হাতে গুলি করে মেরেছিল। পরদিন কালেক্টার সাহেবও চলে গেল। যাবার আগে হুকুম জারি হল ব্যাঙ্ক আর ট্রেজারি খুলে সব নোট জ্বালিয়ে দেবার। তারপর শুরু হল শহর

BanglaBook.org

খালি করা। যে যেমন পারল, ট্রাক বাস সাইকেল এমনকি পায়ে হেঁটে তেজপুর ছাড়ল অন্ধকার নামার আগে। ইস্টবেঙ্গলি লস্করেরা স্টিমার কোম্পানির বোট নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে ট্রিপ খাটল দিনভর। টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি এমনকি মেয়েমানুষের বিনিময়ে দক্ষিণ পাড়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। সন্ধ্যা নামার পর আর ফিরে এল না। ঘাটে অপেক্ষা করে করে অসহায় মানুষগুলো অন্ধকারে গিয়ে লুকোলো চা-বাগানের ভেতর। আমার ইউনিটের তিনজন কেবল রয়ে গেলাম। বাকিরা পালিয়েছিল।

শুনশান রাতের শহর। রাস্তায় শুধু তিনজোড়া বুটজুতোর মচমচ শব্দ। কুকুর ডাকছে। বিদ্যুৎ নেই গোটা শহরে কোথাও।

কসাই বাজারে দেখি হেঁটে যাচ্ছে একটা ভালো জাতের ঘোড়া, কেউ ছেড়ে রেখে চলে গিয়েছে। হাওয়ায় উড়ছে পোড়া নোট। একদল পাগল বেরিয়ে এসেছিল পাগলাগারদ থেকে।

মাঝরাতে চাঁদ উঠল। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পা ভারি হয়ে আসছে। আমরা প্লান্টার্স ক্লাবে গিয়ে ঢুকলাম। ভেতরে কেউ নেই, ভাঁড়ারে ভর্তি টিনের খাবার আর বিয়ারের পেটি। হলঘরে স্কাইলাইট দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে দেয়ালে বাইসন আর হরিণের মুণ্ডুগুলোর বিকট ছায়া পড়েছে। সুবেদার থাপা রেডিয়ো পিকিং ঘোরালো। জানা গেল, চৌএন লাই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

তারপরেও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলেছে। নেফার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খবর পৌঁছতে সময় লেগেছিল বেশ কিছুদিন। আসাম রাইফেলস-এর একটি বিশাল দল পাঠানো হল ওপরের দিকে। সেই দলে বেছে নেওয়া হয়েছিল শাঙ্গে দোরজিকে। পোশিং-লা পাসের কাছে যেখানে ভারি যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে পাঠানো হল দলটা। ওই অঞ্চল শাঙ্গে চিনত, ছেলেবেলায় চমরি চরিয়েছে পাহাড়ের কোলে, গাছে ছাওয়া উপত্যকায়।

পালিয়ে আসার অনেক বছর পরে আবার সেই চেনা পাহাড়, ঝর্ণা, চেনা গাছপালা, গ্রাম। বদলায়নি কিছুই। কেবল যুদ্ধের জন্য গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ মানুষ। তখন ডিসেম্বর মাস, ওপরের দিকে ভারি বরফ পড়েছে। উপযুক্ত পোশাক আর সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল ক্যান্টিন থেকে, আর প্রচুর সাদা কাপড়— কী জন্য সেটা বলা হয়নি। শাঙ্গে ভেবেছিল, যুদ্ধ থামানোর কাজে পাঠানো হচ্ছে, সাদা কাপড়গুলো পতাকার জন্য। পোশিং-লায় পৌঁছে জানা গেল, মৃতদেহ উদ্ধারের কাজে আনা হয়েছে দলটাকে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় একমাস আগে, দেহগুলো সব বরফের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

—শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জওয়ান সব, শাঙ্গে বলেন। লড়াইয়ে যত না মরেছিল, আহত হয়ে ঠান্ডায় জমে মরেছিল তার থেকে বেশি। গায়ে সুতির ইউনিফর্ম আর পায়ে ক্যানভাসের জুতো ছাড়া আর কিছু বিশেষ ছিল না ওদের। এতদিন পরেও বরফে আশ্চর্য সতেজ ছিল দেহগুলো, মনে হচ্ছিল যেন কিছুক্ষণ আগে মারা গিয়েছে। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান তরুণ সব, কতই বা বয়স। তখন আমার মতোই, কিন্তু এখন

BanglaBook.org

বোধহয় আমার নাতির বয়সী হবে। উত্তর ভারতে কোথায় কোন নদীর ধারে গ্রাম। সেখানে জন্মেছে, বড়ো হয়েছে। কত দূরে কোন পাহাড়ে এসে মারা পড়ল।

দশদিন ধরে চলছিল বরফের দেশ থেকে মৃতদেহ খুঁজে সৎকারের কাজ। রাইফেলগুলো মাচার মতো করে পাহাড়ের খাঁজ থেকে দেহগুলোকে নামিয়ে আনতে হয়েছে। কোথাও কোথাও এতই খাড়া যে পিঠে বেঁধেও নামাতে হয়েছে। তারপর ঋতুচক্রে একদিন বরফ গলেছে, নীল পপি আর চমরিঘণ্টার শব্দে ভরে গিয়েছে পাহাড়ের গা। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর শাঙ্গে ফিরে এসেছেন জন্মভূমিতে। এসব অনেককাল আগের কথা। তবু আজও নীচের বন থেকে লতাপাতার বোঝা নিয়ে ফিরে আসার সময় আচমকা কখনো পিঠে ফিরে আসে সেই ভার, দূর পাহাড়ে চিকচিক করে ওঠে সেই স্মৃতি, স্বচ্ছ তুষারের নীচে থেকে চেয়ে থাকে খোলা চোখগুলো, আশ্চর্য অবিকৃত, বরফে জমাট ছোপ ছোপ রক্ত যেন রডোডেনড্রনের পাপড়ি বিছিয়ে রয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূত্রনির্দেশ

১. Ekai Kawaguchi, Three Years in Tibet, Book-Faith India Delhi, 1995

২. Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa, ed. By Clements R Markham, Trubner & Co. London, 1876

৩. Joseph Dalton Hooker, Himalayan Journals Or Notes of a Naturalist in Bengal, The Sikkim and Nepal Himalayas, The Khasia Mountains, etc., Vol.1, Cambridge University Press, 2004

৪. Alexandra David- Neel, Magic and Mystery in Tibet, Dover Publications Inc, New York, 1998

৫. Ekai Kawaguchi, পূর্বোক্ত

৬. Frank Younghusband, The Geographical Results of the Tibet Mission, The Geographical Journal, Vol. 25, No. 5 (May, 1905), The Royal Geographical Society London

৭. Sarat Chandra Das vs. Secretary of State for India, Calcutta High Court, 16 December 1910 (www.indiakanoon.org/doc/1399710)

৮. তারকোভস্কির ঘরবাড়ি, অনুবাদ/গ্রন্থনা পরিমল ভট্টাচার্য, অবভাস, কলকাতা, ২০০৮

৯. Barbara Foster & Michael Foster, The Secret Lives of Alexandra David-Neel, Overlook New York, 2002

১০. Sir Francis Younghusband, The Heart of Nature or the Quest for Natural Beauty, John Murray London, 1921

১১. F. M. Bailey, Note on the Exploration of the Tsang– The Geographical Journal, Vol. 43, No. 2 (Feb., 1914), The Royal Geographical Society, London

১২. Frank Kingdon Ward, The Riddle of the Tsangpo Gorges, Antique Collector's Club Ltd NY, 2008

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG